ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ

ডক্টর শ্রী বিজয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"Some of his writings which I read indicate extensive reading in philosophy and deep understanding of the ultimate issues."

Dr. Radhakrishnan.

ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ

"Thesis approved for the Degree of Doctor of Philosophy
in the University of Calcutta in 1952."

ডক্টর্ শ্রীবিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ (দর্শন ও সংস্কৃত), ডি, ফিল্,
সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক,
আসানসোল কলেজ্; দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান
অধ্যাপক, স্যার্ আশুতোষ কলেজ্, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক—
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১।৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী,
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

প্রথম সংস্করণ ১৩৬১

প্রাপ্তিস্থান :—
১। প্রকাশক
২। 'সাধনসমর কার্য্যালয়'
২০১, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
৩। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
পুস্তক বিক্রেতা
৫৪।৩, কলেজ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

মূল্য—সাড়ে সাত টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীযুক্ত অত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
"পরিবেষক প্রেস"
২৩, ডিক্‌সন্ লেন্, কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

আমার পরমপূজনীয় গুরুদেব, 'সাধনসমর আশ্রমের' আচার্য্য দ্বিতীয় সত্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারি-মহারাজের শ্রীহস্তে এই গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

পরিচিতি

আমার স্নেহভাজন ছাত্র কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ বিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারতীয়-দর্শনে মুক্তিবাদ" গ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Doctor of Philosophy উপাধি লাভ করিয়াছে। সকল পরীক্ষকই একবাক্যে এবং উচ্চকণ্ঠে এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতীয়-দর্শনশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থরত্ন সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় যে বিপুল পরিশ্রম, অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও সশ্রদ্ধ অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দর্শনশাস্ত্রানুরাগিমাত্রই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। নানা অসুবিধাসত্ত্বেও এবং বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও গ্রন্থকার স্বীয় অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়প্রভাবে এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা আমি বিশেষ করিয়া অবগত আছি। কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। ভারতীয়দর্শনের রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে যে ধীশক্তি ও প্রতিভার আবশ্যক তাহা গ্রন্থকারের মধ্যে উজ্জ্বল ও ভাস্বররূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও পরিতৃপ্তির বিষয় গ্রন্থকারের স্বভাবজাত আস্তিক্য বুদ্ধি ও প্রজ্ঞালোক-প্রোদ্ভাসিত শ্রদ্ধা। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেবল দর্শনের বিদ্যার্থিগণই উপকৃত হইবেন তাহা নহে, কিন্তু কল্যাণমার্গে সঞ্চরণকামী বিশুদ্ধসত্ত্ব সদ্জনগণ তাঁহাদের ইষ্টলাভে বিশেষভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিবেন। এই গ্রন্থের ভূয়ান্ প্রচার ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা আমি কামনা করি। আশা করি. ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের দুই একটি খণ্ড বিদ্যার্থীদের উপকারার্থে সংগৃহীত হইবে। ইতি—

১লা আগষ্ট, ১৯৫৪
কলিকাতা

ডক্টর্ *শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়,*
অধ্যক্ষ এবং আশুতোষ অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

শ্রীমান্ বিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি ডক্টর্ উপাধি লাভ করিয়াছেন। এই উপাধিলাভের জন্য যে প্রবন্ধ শ্রীমান্‌কে দিতে হইয়াছিল তাহার নাম "ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ"। ভারতীয়দর্শনের পরম প্রতিপাদ্যবিষয় মুক্তি। ভারতীয়দর্শনে বহু বিষয় আলোচিত হইলেও সমস্ত আলোচনা মোক্ষেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত জীবজগতের চিন্তাধারা ও কার্য্যপ্রণালী সমস্তই ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে মোক্ষেই বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে। এইজন্য মোক্ষ ভারতীয়দর্শনের আলোচ্য-বিষয়ের মধ্যে প্রাসঙ্গিক নহে; কিন্তু আলোচ্য-বিষয়ের মধ্যে মোক্ষই প্রধান ও চরম প্রতিপাদ্য। যদিও পাশ্চাত্যদর্শনে মোক্ষের আলোচনা না থাকায় ভারতীয়দর্শনে মোক্ষের আলোচনায় অনেকে অগৌরব মনে করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শ্রীমান্ ভারতীয়দর্শনেই মোক্ষের আলোচনা দেখাইয়াছেন; কিন্তু পাশ্চাত্যদর্শনসম্বন্ধে মোক্ষ-সমর্থনের জন্য কোন কথা বলেন নাই। যাহা পাশ্চাত্যদর্শনে নাই, তাহা ভারতীয়দর্শনেও থাকিতে পারিবে না বা থাকা উচিত নহে, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভারতবর্ষকে ইউরোপেরই অন্তর্গত করিতে প্রয়াসী এবং ভারতীয়-দার্শনিকগণের ও ভারতীয়-জনসাধারণের চিন্তাধারার সহিত তাঁহারা কিছুমাত্র পরিচিত নহেন। এই জন্যই তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রে মোক্ষের আলোচনায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতীয় বৈদিক এবং অবৈদিক সমস্ত দর্শনই মোক্ষকে চরম ও পরম বলিয়া এককণ্ঠে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় দৃষ্টি অনুসারে শ্রীমানের এই প্রবন্ধ অতি উচ্চস্তরের হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণের পরিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দৃঢ়তার সহিত সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকগণের পরম ও চরম সিদ্ধান্ত যাহা সমস্ত ভারতীয়দর্শন মন্থন করিয়া শ্রীমান্ এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার জন্য শ্রীমান্ সমস্ত ভারতবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না, তাহা শ্রীমান্ এই অল্পপ্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভারতীয়-সভ্যতার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছেন। কি জাতীয় অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকমাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং পাঠকের চিত্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইবে। এই জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রবন্ধের বহুল প্রচার এবং প্রবন্ধ-সঙ্কলয়িতা শ্রীমানের নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে চরম উন্নতি ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

ইতি—

২৬শে জুন্, ১৯৫৪
২৯, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায়,
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

মুখবন্ধ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় "ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ" নিয়া চর্চ্চা করিতে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দুঃখ-বিমুক্তিই জীবের কাম্য। দুঃখবিমুক্তিরূপ অবস্থার প্রাপ্তিই সাধনার উদ্দেশ্য। তাই ভারতীয়-দর্শনের মুক্তির স্বরূপ অবগত হও, শান্তি পাইবে ও সাধনপথ সুগম হইবে"।

আমি কবিরাজমহাশয়ের উপদেশমতে ইং ১৯৪১ সাল হইতে ঐ গবেষণাকার্য্যে রত হইলাম। তাঁহার কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েক খানা গ্রন্থ দুই বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করি এবং বিভিন্নশাস্ত্রের রহস্য কিছু কিছু করিয়া অবগত হইতে থাকি। একদিন কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তুমি কলিকাতায় গিয়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের সাহায্যে গবেষণা-কার্য্যে অগ্রসর হও। তিনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার দ্বারা তোমার উপকার হইবে।"

আমি তাই ইং ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে কলিকাতায় আসিয়া পরমশ্রদ্ধেয় ডক্টর্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সকল কথাগুলি অতিযত্নের সহিত শ্রবণ করেন এবং ডক্টর্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ ও প্রচুর সাহায্য পাইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকি। এইরূপভাবে দুইবৎসরকাল গবেষণাকার্য্যে অতিবাহিত হইবার পর আমাকে ইং ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রামের 'স্যার্ আশুতোষ' কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যাইতে হয়।

চট্টগ্রামে গিয়া কিছুদিন গবেষণা করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে সেখানে শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্যস্বামীজীর (ডক্টর্ বিভূতিভূষণ দত্তের) সহিত পরিচয় ঘটে। স্বামীজী আমার গবেষণার বিষয়বস্তুর কথা শুনিয়া বিশেষ সুখী হন ও এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামীজী তাঁহার কথানুরূপ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি চিরদিনই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ সোহংতীর্থ স্বামীজীও পুত্রবৎ স্নেহ ও যত্নসহকারে আমাকে গবেষণাকার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর্ বিনোদবিহারী দত্ত মহাশয়ও আমাকে এই গ্রন্থরচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয়ও শাস্ত্রের যথার্থ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আমার অনেক সন্দেহভঞ্জন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই উৎসাহ ও স্নেহের দ্বারা আমার ভিতরে কার্য্যে অগ্রসর হইবার শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। এখানে আমার পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য পণ্ডিত ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য-বোধ করিতেছি। তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে তাঁহার 'ন্যায়পরিচয়' গ্রন্থ উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বইখানা পড়, ইহা হইতে ন্যায়মতের মুক্তিসম্বন্ধে অবগত হইয়া

আমার লিখিত 'ন্যায়দর্শন' পড়িলেই ন্যায়মতের মুক্তির যথার্থ রহস্য অবগত হইতে পারিবে"। আমি তর্কবাগীশ মহাশয়ের সেই উপদেশ যথাযথরূপেই পালন করিয়াছি এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজমহাশয়ের 'বৈষ্ণবদর্শনে'র ও 'তন্ত্রদর্শনে'র উপরে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং ঐ সকল প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া খুবই উপকৃত হইয়াছি। কবিরাজ মহাশয় যে আমাকে কত সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। তাঁহার কাছে চিরদিনই যেন বিনীত থাকিতে পারি ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা। সর্ব্বোপরি আমার পরম-শ্রদ্ধেয় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নকল্পে আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার কাছ হইতে উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমি এই কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতাম না। বিদ্বদ্‌গণ্য-মহামহোপাধ্যায়, শ্রীনীলমণি শাস্ত্রসাগর মহাশয় এই গ্রন্থের ভুল-ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিয়া আমার বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছেন। আমার সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, মহাশয় আমাকে এই কার্য্যে সর্ব্বদাই উৎসাহ দান করিয়া আমার পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা যুথিকা বসুমল্লিক, বি, এ, শ্রীযুক্তা রেণুকা বসুমল্লিক এম্, এ, এবং শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত, এম্, এ, আমাকে এই গ্রন্থপ্রণয়নে বহু সাহায্য করিয়াছেন। 'পরিবেষক' প্রেসের শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে উপকার ও সাহায্য পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর্ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় ও তাঁহার সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ডক্টর্ রায়ের সরকার যদি এই গ্রন্থটিকে এক-সহস্র মুদ্রা দিয়া পুরস্কৃত না করিতেন, তবে এই গ্রন্থখানি আর কতদিনে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত, বলিতে পারি না।

আশাকরি শ্রীভগবানের করুণায় আমরা সকলেই একদিন বন্ধনমুক্ত হইয়া মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব। এই প্রবন্ধ শেষ করিয়া মনে হইতেছে যে, মুক্তিসম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে চলিবে না। মুক্তিলাভ করিতে হইবে, অমর হইতে হইবে, আমিই যে অমৃতস্বরূপ তাহাই উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে হইবে।

এই গ্রন্থের যাহা কিছু ভুল বা ত্রুটী হইয়াছে তাহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সকলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি কলিকাতার বাহিরে থাকি বলিয়া গ্রন্থটির প্রতি ইচ্ছা থাকিলেও যথাযথ যত্ন লইতে পারি নাই। গ্রন্থটি তথাপি যখন দোষগুণযুক্ত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, তখন ইহাকে বাধা দিতেও চাহিলাম না। ইতি—

জন্মাষ্টমী, ১৩৬১
আসানসোল কলেজ,
পোঃ আসানসোল,
পশ্চিমবঙ্গ।

বিনীত—
শ্রীবিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায় ১-১৭ পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদ ও উপনিষদের মতে মুক্তি ১৮-২৭ পৃঃ,

তৃতীয় অধ্যায়

বেদান্তদর্শনমতে মুক্তি ২৮-৬৫ পৃঃ,

চতুর্থ অধ্যায়

মীমাংসামতে মুক্তি ৬৬-৭০ পৃঃ,

পঞ্চম অধ্যায়

সাংখ্য ও যোগমতে মুক্তি ৭১-৮৯ পৃঃ,

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়-বৈশেষিকমতে মুক্তি ৯০-৯৮ পৃঃ,

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি ১৭১-১৮৪ পৃঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুক্তজীবের ঐশ্বর্য্য ১৮৫-১৯৬ পৃঃ,

ষোড়শ অধ্যায়

মুক্তের প্রারব্ধভোগ ১৯৭-২০৬ পৃঃ,

সপ্তদশ অধ্যায়

মুক্তের ব্যবহার বা কর্ম্ম ২০৭-২১৬ পৃঃ,

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভক্তি ও মুক্তি ২১৭-২৪১ পৃঃ,

ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারিটিই হইল পুরুষার্থ। জীবনের পরিপুষ্টির জন্য এই চারিটিরই অত্যাবশ্যক। তবে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া অর্থ ও কামের সেবা করিলে পরিশেষে মোক্ষলাভ অসম্ভব। ধর্ম্মের (যাহা দ্বারা কল্যাণ ও অভ্যুদয় হয়) সহিত যুক্ত হইয়া যদি অর্থ এবং কামের সঙ্গও করা হয় তাহাতে চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মোক্ষলাভ অসম্ভব হয় না। মোক্ষশব্দের অর্থ হইল যাহা কিছু দুঃখ বা বেদনাদায়ক তাহা হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি। ঐ অবস্থার প্রাপ্তিতেই জীবন হয় পরিপূর্ণ বা শান্তির। তাই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে মোক্ষলাভের জন্য স্বচেষ্ট হইতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা প্রথমে মুক্তি (মোক্ষ) শব্দের শাস্ত্রমতে অর্থ কি তাহা অবগত হইয়া পরে যথাস্থানে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে মুক্তি শব্দের রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করিব।

মুক্তি কি?

কাহারও মতে ইচ্ছামাত্রই অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যার নাশই মোক্ষ[১]। বাসনার তনুভাবকেও মোক্ষ কহে[২]। এখানে তনুভাব অর্থে নাশকে বুঝায়। নিঃশেষরূপে বাসনার যে পরিত্যাগ তাহাকে সাধুগণ উত্তম মোক্ষের বিমলক্রম বলিয়াছেন[৩]। অনিত্য সাংসারিক সুখদুঃখ এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি মমতারূপ বন্ধনের ক্ষয়ই মোক্ষ[৪]। বন্ধন ক্ষয়ই মোক্ষ[৫]। বাসনার নিবৃত্তিই 'মহাভারতে' মোক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে[৬]। 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে'

১। ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেয়ং তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে। মহোপনিষদ্, ৪।১১৬

২। বাসনাতানবং ব্রহ্মন্ মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে। ঐ, ২।৪২

৩। অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনায়া য উত্তমঃ। মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স এব বিমলক্রমঃ॥ ঐ, ২।৩৯, মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ। মুক্তিক, উ, ৬৮

৪। অনিত্যসংসার-সুখদুঃখ-বিষয়-সমস্তক্ষেত্র-মমতাবন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ। নিরালম্বোপনিষৎ।

৫। বন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ। ঐ,

৬। মূলমেতৎ ত্রিবর্গস্য নিবৃত্তির্মোক্ষ উচ্যতে। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫

ভোগবাসনা ত্যাগকেই মুক্তি বলা হইয়াছে[১]। 'পদ্মপুরাণে' সুখদুঃখদায়ক কর্ম্মের লয়কেই মোক্ষ বলা হইয়াছে[২]। 'গরুড়পুরাণে' ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকেই মুক্তি বলা হইয়াছে[৩]। 'চরকসংহিতায়' নিঃশেষরূপে বেদনার নিবৃত্তিরূপ অবস্থাকেই মোক্ষ বলা হইয়াছে[৪]। শেষনাগ অজ্ঞানময় গ্রন্থিভেদকেই মোক্ষ বলিয়াছেন[৫]। অভিনবগুপ্ত মুক্তিকে অজ্ঞান-গ্রন্থি-ভেদ-পূর্ব্বক স্বশক্তির অভিব্যক্ততা বলিয়াছেন[৬]। 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে' উক্ত হইয়াছে যে মুক্তি অন্তরায় (অবিবেক) বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে[৭]। সমগ্র কর্ম্মের ক্ষয়কে মোক্ষ বলা হয়[৮]। প্রধান দশ 'উপনিষদে' সাক্ষাদ্‌ভাবে মুক্তির সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও মুক্তি প্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়[৯]। ঐসকল বাক্যে ইহা সিদ্ধ হয় যে, মুক্তি পদার্থ একটি সুচির প্রসিদ্ধ তত্ত্ব। 'বেদের মন্ত্রভাগে'ও পরম পুরুষার্থ (মুক্তি) সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঋগ্‌বেদসংহিতায়' ও 'যজুর্ব্বেদসংহিতায়' "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রের শেষে "মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ"[১০] এই বাক্যের দ্বারা মুক্তি যে জীবের কাম্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ উক্ত বাক্যের দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্তির প্রার্থনা বুঝা যাইতেছে।

১। যোগবাশিষ্ঠ, ২।৩৫।৩. ২। কর্ম্মণাং চ লয়ো মোক্ষঃ সুখদুঃখপ্রদায়িনাম্। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২০৪ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক।

৩। সা মুক্তি র্ব্রহ্মণা চৈক্যম্। গরুড়পুরাণ।

৪। যোগে মোক্ষে চ সর্ব্বাসাং বেদনানামবর্ত্তণম্। মোক্ষো নিবৃত্তিনিঃশেষো-যোগো মোক্ষ-প্রবর্তকঃ॥ চরকসংহিতা, ৪।১।১১৬

৫। অজ্ঞানময়-গ্রন্থের্ভেদো যস্তং বিদুর্মোক্ষম্। পরমার্থসার, ৭২

৬। অজ্ঞানগ্রন্থিভিদা স্বশক্ত্যভিব্যক্ততা মোক্ষঃ। পরমার্থসার, ৬০

৭। মুক্তিরন্তরায়-ধ্বস্তের্ন পরঃ। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৬।২০

৮। কৃৎস্নকর্ম্মক্ষয়ো মোক্ষঃ। উমাস্বাতি, তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, ১০।৩

৯। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ। মুণ্ডক, উ, ৩।১।৩ ও ২।২।৮. নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। কঠ; উ, ৩।১৫ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি। শ্বেতাশ্বতর, উ, ৪।১৫. তরতি শোকমাত্মবিৎ। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। ছান্দোগ্য, উ, ৭।১।৩ ও ৮।১২।১. তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি। শ্বেতাশ্বতর, উ, ৩।৮ এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। বৃহ, উ, ৪।৪।১৪ দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি।

১০। ঋগ্‌বেদসংহিতা, ৭ মণ্ডল, ৫ অষ্টক, ৪র্থ অধ্যায়, ৫৯ সূক্ত, ১২শ মন্ত্র; শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৩।৬০।১.

মুক্তি শব্দের অর্থের স্তরে স্তরে বিকাশ।

জীব কোথা হইতে সম্ভূত হইয়াছে এবং কোথায় যাইয়া বা কাহাকে বা কি লাভ করিয়া জাগতিক শোক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে এই প্রশ্নগুলি মানব ইতিহাসের প্রথম হইতেই মানবগণকে চিন্তাকুল করিয়াছিল এবং এই কঠিন প্রশ্নগুলির সমাধানকল্পে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন উত্তর ও প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হয়তো অনেক অভিনব উত্তর প্রদত্ত হইবে। আমরা উপরে যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়াছি ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর ঋগ্‌বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়। দেবতাদিগের ইচ্ছায়ই জীবজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। মৃত্যুর পর পুনরায় আর দুঃখশোক পাইতে না হয় সেই জন্য দেবতাদের সহিত (অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র ও আদিত্য প্রভৃতির সহিত) সাযুজ্য, সালোক্য বা সারূপ্য লাভ করাই মুক্তি বলিয়া বৈদিক ঋষিগণ প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। ডসনের গ্রন্থেও ঐরূপ মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায়[১]। তাই প্রথমে দেবতাদিগের সহিত সাযুজ্য বা সলোকতা লাভই মুক্তি বলিয়া বুঝাইত। কিছুকাল পরে ব্রহ্মকে জগৎ সৃষ্টির আদি এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। দেবতারা সন্তুষ্ট হইলে ব্রহ্মলাভ সম্ভবপর হইবে বলিয়া দেবতা উপাসনার প্রথা প্রচলিতই রহিল। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার দ্বার হইল অগ্নি। এই দ্বার দিয়া যে উপাসক ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করে, সে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হয়[২]। এখানে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য বা সলোকতা লাভই মুক্তি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। পরিশেষে আত্মাই জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল এবং আত্মাকে লাভ করাই মুক্তি ইচ্ছুক জীবের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইল[৩]। তাই বলা হইল যিনি আত্মাকে জানেন, তাঁহার আর

১। "In olden times this was the gods, and thus union with the gods after death was the supreme wish of the ancient vedic rishis, in order to attain fellowship (sāyujyam), companionship (salokatā), community of being (sarūpatā) with Agni, Varuna, Indra, Āditya, etc." Deussen. The Philosophy of the Upanishads (Eng. Tr. Pub. in 1908), p. 342.

২। শতপথব্রাহ্মণ, ১১/৪/১.

৩। Deussen : The Philosophy of the Upanishads, p. 342.

মৃত্যুভয় থাকেনা[১]। তিনি কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না[২]। এখানে আত্মলাভকেই মুক্তি বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান ভিন্ন অপর জগৎ (মুক্তি) লাভ, যাগযজ্ঞ বা তিতিক্ষা দ্বারা হয় না। আত্মজ্ঞানীই সেই জগৎ (মুক্তি) প্রাপ্ত হন[৩]। এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে আত্মাকে লাভ করিয়াই জীব মুক্ত হয়। এই মুক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত মুক্তির (স্বর্গারোহণরূপ মুক্তি ও দেবতা সাযুজ্য লাভ ইত্যাদি রূপ মুক্তির) কোনই পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ ঐসকল মুক্তিতে যেরূপ নিজের বাহিরে অন্যত্র কিছু লাভ বুঝায়, আত্মলাভরূপ মুক্তিতেও সেইরূপ আত্মাকে নিজের বাহিরেই প্রাপ্ত হওয়া বুঝাইত[৪]। 'শতপথব্রাহ্মণে' পরে আরও বলা হইয়াছে, "সেই পুরুষই আমার আত্মা; মৃত্যুর পর আমি উহাতে প্রবেশ করিব"[৫]। এখানে এই প্রশ্ন উঠে যে, আত্মা যদি আমারই আত্মা হন তবে তাহাতে আবার প্রবেশ করার কথা উঠে কি করিয়া? প্রবেশ করিবার কথা মানিতে হইলে মুক্তিতে নিজের বাহিরে অন্য কিছু প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে আত্মাকে আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আমিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, এই পরব্রহ্মকে জানিয়া জীব ব্রহ্মই হয়[৬]। এইরূপে ক্রমশঃ সাধনপথে অগ্রসর হইয়া বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মৈকাত্মানুভূতির চরম স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন আত্মা নিত্য প্রাপ্ত বস্তু, তাই আমরাও নিত্যই মুক্ত। কিন্তু অজ্ঞানবশে সেই জ্ঞান তিরোহিত থাকে, অজ্ঞান দূর হইলেই নিত্যই যে আমি স্বরূপে (আত্মরূপে) অবস্থিত তাহা প্রতীয়মান হয়[৭]। শতপথব্রাহ্মণে "সেই পুরুষই আমার আত্মা, মৃত্যুর পরে আমি উহাতে প্রবেশ করিব" এই যে কথা আছে উহাকেও আমরা ব্রহ্মৈকাত্মানুভূতির চরম স্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভাষাদৃষ্টে যদিও মনে হয় যে এক বস্তু অন্য পৃথক্ বস্তুতে প্রবেশ করিতেছে কিন্তু প্রবেশের পর প্রবিষ্ট বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্বের কথা উল্লেখ নাই। অতএব মনে হয় বলিবার ভাষার পারিভাষিকতা তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই ঐভাবে ব্রহ্মৈকাত্মানুভূতির কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১। অথর্ব্ববেদ, ১০/৮/৪৪ ২। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, ৩/১২/৯/৮

৩। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০/৫/৪/১৫

৪। "But this union is still represented in harmony with traditional ideas as an ascent to heavenly regions,—as though the átman were to be sought elsewhere than in our-selves." Deussen : The Philosophy of the Upanishads. p. 343

৫। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৬।৩ ৬। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৯

৭। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৩।২ ও ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ দ্রষ্টব্য।

মুক্তি শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ।

'মুক্তি' শব্দটী মুচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৈয়াকরণ পাণিনি বলেন 'মুচ্' ধাতুর অর্থ 'মোক্ষণ'[১]। বেদে আছে, মুক্তির অর্থ মৃত্যুরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি, অমৃত হইতে নহে[২]। উপনিষদে মৃত্যু হইতে মুক্তি,[৩] কামনা হইতে মুক্তি,[৪] বন্ধন হইতে মুক্তি,[৫] পাশ হইতে মুক্তি,[৬] দেহ হইতে মুক্তি,[৭] সংসার হইতে মুক্তি,[৮] ও গর্ভবাস হইতে মুক্তি,[৯] প্রভৃতির কথা আছে। গীতায় সঙ্গ হইতে মুক্তি,[১০] পাপ হইতে মুক্তি,[১১] কর্ম্ম হইতে মুক্তি,[১২] কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি,[১৩] অশুভ হইতে মুক্তি,[১৪] দ্বন্দ্বমোহ হইতে মুক্তি,[১৫] জরামরণ হইতে মুক্তি,[১৬] সুখদুঃখ হইতে বিমুক্তি,[১৭] হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ হইতে মুক্তি,[১৮] জন্মমৃত্যুজরাদুঃখ হইতে বিমুক্তি,[১৯] কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে বিমুক্তি,[২০] প্রকৃতিজ গুণত্রয় হইতে মুক্তি,[২১] ও জন্মবন্ধন হইতে মুক্তির[২২] উল্লেখ আছে।

দুর্গাদাস তর্কবাগীশ কৃত 'ধাতুদীপিকায়' মুক্তির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে। "বন্ধনরহিতীভাবে অকর্ম্মকোঽয়ম্। আলানান্মুক্তো গজঃ কর্ত্তরি ক্তঃ। এবং পাপান্মুক্ত ইত্যাদৌ পাপবন্ধনান্মুক্ত ইত্যর্থঃ"।[২৩] এখানে তর্কবাগীশ

১। 'মুচ্ লৃ মোক্ষণে'। অষ্টাধ্যায়ী, ৭।৩।৫২

২। শুক্লযজুর্ব্বেদ, ৩।৬০।১ ; ঋগ্বেদসংহিতা, ৭।৫।৪।৪৯ সূক্ত, ১২ শ মন্ত্র।

৩। 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'। কঠ, উ, ১।৩।১৫

৪। 'যদা সর্ব্বেপ্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। বৃহ, উ, ৪।৪।৭

৫। 'সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে'। কৈবল্য, উ, ১।১৭ ; মুচ্যতে বন্ধনাৎ। মৈত্রা, উ, ৪।৫ ; মৈত্রেয়ী, উ, ১।৭

৬। 'মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ'। শ্বেতা, উ, ১।৮ ; ২।২৫ ; ৪।১৬ ; ৫।১৩ ; ৬।১৩

৭। 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য' কঠ, উ

৮। শ্বেতা, উ, ৬।১৬

৯। 'গর্ভবাসাৎ বিমুক্তা বিমুচ্যতে'। অথর্বশিখোপনিষৎ, ৩

১০। গীতা, ৩।৯ ; ১৮।২৬. ১১। ঐ, ৩।১৩ ; ১০।৩ ; ১৮।৬৬. ১২। ঐ, ৩।৩১. ১৩। ঐ, ৯।১৮ ১৪। ঐ, ৪।১৬ ; ৯।১. ১৫। ঐ, ৭।২৮. ১৬। ঐ, ৭।২৯. ১৭। ঐ, ১৫।৫. ১৮। ঐ, ১২।১৫. ১৯। ঐ, ১৪।২০. ২০। ঐ, ১৬।২১—২২. ২১। ঐ, ১৮।৪০. ২২। ঐ, ২।৫১

২৩। 'ধাতুদীপিকা'র এই (মুক্তির) ব্যাখ্যা 'শব্দকল্পদ্রুম' হইতে উদ্ধৃত করা হইল। শব্দকল্পদ্রুমে মুচ্ ধাতুর ব্যাখ্যায় উহা আছে। পৃঃ ১০৪৩ (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সংস্করণ)

মহাশয় বন্ধনযুক্ত অবস্থা হইতে বন্ধনরহিতাবস্থার প্রাপ্তিকেই মুক্তাবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "আলানান্মুক্তো গজঃ,আলান (অর্থাৎ গজবন্ধনস্তম্ভ) হইতে মুক্ত গজ। "পাপান্মুক্তঃ ইত্যাদৌ পাপবন্ধনান্মুক্তঃ ইত্যর্থঃ" "পাপ হইতে মুক্তি" প্রভৃতির স্থানে পাপরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। অতএব দুর্গাদাসের মতে বন্ধন হইতে মুক্তিই মুক্তি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। উপরের উল্লিখিত মৃত্যু, কামনা ইত্যাদি সমস্তই বন্ধন স্বরূপ বলিয়া ঐ সকল হইতে মুক্তির কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে শুধু বন্ধন-নাশকেই মুক্তি বলা হইয়াছে[১]।

বন্ধন কি ?

মোক্ষ অর্থ বন্ধন হইতে মোক্ষ। মোক্ষ হইলেই বন্ধন ছিল ধরিয়া লইতে হইবে। বন্ধন না থাকিলে মুক্তির কোন অর্থই নাই। জন্ম যদি থাকে তবে মরণও আছে; জন্মই যদি না থাকিল তবে আবার মরণ কি করিয়া হইবে[২]। বন্ধন আছে বলিয়াই মুক্তি আছে এবং এই বন্ধন নিষ্কৃতির নামই মুক্তি বলিয়া এই বন্ধন শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

শ্রুতিতে আছে মনের বিষয়াসক্তিই বন্ধন[৩]। বাসনার দ্বারা বন্ধনই বন্ধন[৪]। দৃঢ়পদার্থভাবনাকে বন্ধন বলে[৫]। পদার্থভাবনাকে পদার্থবাসনাও বলা যাইতে পারে[৬]। দ্রষ্টার নিকট দৃশ্যের সত্তার যে বোধ তাহাই বন্ধন[৭]। অর্থাৎ দ্রষ্টার দৃশ্যভাবই বন্ধন[৮]। আত্মাকে দেহ মনে করাই বন্ধন[৯]। অনাত্মা

১। 'তৎকৃত-বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে'। বেদান্তকারিকা।

২। বন্ধত্বমপিচেন্ মোক্ষো বন্ধাভাবে ক্ব মোক্ষতা। মরণং যদি চেজ্‌জন্ম জন্মাভাবে মৃতির্ন চ॥ তেজোবিন্দু, উ, ৫।২৪.

৩। মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ ব্রহ্মবিন্দু, উ, ২.

৪। বদ্ধোহি বাসনাবদ্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ। মুক্তিক, উ, ২।৬।৮

৫। পদার্থভাবনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে। মহা, উ, ২।৪১

৬। পদার্থবাসনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে। যোগবাশিষ্ঠ, ২।৩৫।৩

৭। দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য সত্তান্তর্বন্ধ ইত্যভিধীয়তে। মহা, উ, ৪।৪৭

৮। দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য সত্তাঽঙ্গবন্ধ ইত্যভিধীয়তে। যোগবাশিষ্ঠ, ৩।১।২২,

৯। দেহোহমিতি সংকল্পস্তদ্বন্ধমিতি চোচ্যতে। তেজোবিন্দু, উ, ৫।৯০

দেহাদিতে আত্মাভিমানই আত্মার বন্ধন[১]। সেই হেতু তৎতৎস্থলে বিষয়াসক্তিনাশ, বাসনাক্ষয়প্রভৃতিকে মুক্তি বলা হইয়াছে। 'পদ্মপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে কর্ম্মের উৎপত্তিই বন্ধন, আর সুখদুঃখ দায়ক কর্ম্মের নাশই মোক্ষ[২]। 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে' বিষয়ব্যসনযুক্ত তৃষ্ণাকেই বন্ধন ও সর্ব্ববিষয়ব্যসননির্মুক্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে[৩]। তৃষ্ণা বলিতে বিষয়ব্যসনবাসনাকেই বুঝায়। এইজন্য গ্রন্থে শুধু তৃষ্ণাকেও বন্ধন বলা হইয়াছে। জীবগণ যে সংসারে সত্য বোধে বহিঃ পদার্থে (রূপ, রস, বিষয় ইত্যাদি) বদ্ধমনোরথ হইয়া অবস্থান করে তাহাই তাহাদের বন্ধন। এই বন্ধনই সুদৃঢ় সংসার শৃঙ্খল[৪]। ভোগের ইচ্ছাকেও বন্ধন বলে। এখানে বিষয় বা জগদ্‌-ভোগের কথাই বলা হইয়াছে। এই জগদ্‌ভোগের ত্যাগকেই (নাশকেই) মুক্তি বলে[৫]। উমাস্বাতি বলিয়াছেন যে, "রাগদ্বেষাদিকষায়যুক্ত হইয়া জীব কর্ম্ম যোগ্য পুদ্‌গল গ্রহণ করে"। পুদ্‌গল শব্দের অর্থ জীবভাবজনক মল। "এই পুদ্‌গল গ্রহণই বন্ধন"[৬]। আর ঐ পুদ্‌গল ত্যাগই মুক্তি। "প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ"[৭]। অর্থাৎ প্রকারান্তর অসম্ভব বিধায় প্রকারান্তর-জ্ঞান অর্থাৎ সুখদুঃখাদি গুণধর্ম্মকে নির্গুণ আত্মার ধর্ম্মরূপে জ্ঞানই বন্ধন। এই বন্ধনই জীবের দুঃখের কারণ। তাই প্রশ্ন উঠে দুঃখ কি ?

দুঃখ কি ?

আত্মা দেহ এই সঙ্কল্পই দুঃখ[৮]। বিষয়সঙ্কল্পই দুঃখ[৯]। পূর্ব্বে আমরা এই সকলকেই বন্ধন বলিয়াছি। সুতরাং বন্ধনই দুঃখ। 'গীতা'য় জন্ম, মৃত্যু

১। আনাত্মানাং দেহাদীনামাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমান আত্মনো বন্ধঃ। তন্নিবৃত্তির্মোক্ষঃ। সর্ব্বসারোপনিষৎ, ১

২। কর্মণাং চ লয়ো মোক্ষঃ সুখদুঃখপ্রদায়িনাম্। তদুৎপত্তিস্তু বন্ধঃ স্যাদিত্যসৌ শাস্ত্রনির্ণয়ঃ। পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২০৪।২৩.

৩। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, ৫।১৭।৫

৪। তং বন্ধমাহুরাচার্য্যাঃ সংসারনিগড়ং দৃঢ়ম্। ঐ, ৫।১৭।৩.

৫। ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে। ঐ, ৪।৩৫।৩

৬। স কষায়ত্বাৎ জীবঃ কর্ম্মণো যোগ্যান্ পুদ্‌গলানাদত্তে। স বন্ধঃ। তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, ৮। ২-৩

৭। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৬।১৬

৮। "দেহোঽহমিতি সংকল্পস্তদ্দুঃখমিতি চোচ্যতে"। তেজোবিন্দু, উ, ৫।৯১

৯। "বিষয়সংকল্প এব দুঃখম্। নিরালম্ব, উ।

ও জরাকে দুঃখ বলা হইয়াছে[১]। এই জন্মমৃত্যুই জীবের যথার্থ বন্ধন। উহাদের নাশই মুক্তি। বাধনা যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ তাহাই দুঃখ[২]। বাধনা শব্দের অর্থ পীড়া, তাপ ইত্যাদি। দুঃখের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই জীব দুঃখ নাশের চেষ্টা করে[৩]। এই দুঃখের আত্যন্তিক নাশই মুক্তি। দুঃখের আরও বহু ব্যাখ্যা শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। তবে সর্ব্বত্রই বন্ধনের ফলস্বরূপ দুঃখকে মানা হইয়াছে এবং এই দুঃখনাশকেই মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে[৪]।

মুক্ত জীবের পুনর্জ্জন্ম আছে কি?

আত্যন্তিক দুঃখনাশকে মুক্তি বলা হয়। জন্মই দুঃখ। তাই আত্যন্তিক-ভাবে জন্মের নাশই মুক্তি। ইহাতে বুঝা যায় যে মুক্তজীব আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না[৫]। স্বামী দয়ানন্দ এইমত স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, 'মুক্তি একটি কল্পকালস্থায়ী সুখভোগের অবস্থা। উহা চিরস্থায়িনী অবস্থা নহে। জন্মমৃত্যু চিরদিনের জন্য রহিত হয় না, কারণ মুক্ত জীবকে আবার কল্পান্তে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে[৬]। দয়ানন্দের এইমত হিন্দু, বৌদ্ধ, বা জৈন দার্শনিকগণ কেহই গ্রহণ করেন নাই, কারণ মুক্তপুরুষকে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ দুঃখ পাইতে হইলে তাহাকে মুক্ত বলা যায় না। "ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপি অনাবৃত্তিশ্রুতেঃ"—সাংখ্য ৬।১৭। "অপুরুষার্থত্বমন্যথা" ঐ ৬।১৮। "অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ" ঐ ৬।১৯ অর্থাৎ মুক্তের পুনর্ব্বার এমন কি অন্য কল্পেও বন্ধন স্বীকার করিলে বদ্ধ ও মুক্তের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না। তাই দয়ানন্দের মুক্তিকল্পনাকে অসমীচীন বলিতে হইবে।

১। "জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে"। গীতা, ১৪।২০.

২। বাধনালক্ষণং দুঃখম্। ন্যায়দর্শন, ১।১।২১.

৩। সাংখ্যকারিকা, ১. ৪। ন্যায়দর্শন, ১।১।২২.

৫। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গীতা, ১৫।৬
"তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।" বৃহ, উ, ৬।২।১৫
"ন চ পুনরাবর্ত্ততে।" ছান্দো, উ, ৮।১৫।১

৬। দ্রষ্টব্য সত্যার্থপ্রকাশ (হিন্দিসংস্করণ), পৃঃ ৩০১—৬

মুক্তির পর্য্যায় শব্দ।

মুক্তির বহুবিধ পর্য্যায়শব্দ আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়শব্দের আমরা উল্লেখ করিতেছি এবং ঐ শব্দগুলির অর্থ অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। 'অমরকোষে' মুক্তির নিম্নলিখিত পর্য্যায়শব্দ পাওয়া যায়। কৈবল্য, নির্ব্বাণ, শ্রেয়, নিঃশ্রেয়স্, অমৃত, মোক্ষ ও অপবর্গ।[১] এতদ্ব্যতীত অন্যত্র অপর পর্য্যায়শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। যেমন, স্বরূপপ্রাপ্তি, অপুনরাবৃত্তি, ব্রহ্মভবন, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ব্রহ্মালয়, সংজ্ঞানাশ ও প্রলয় ইত্যাদি। এখন এই পর্য্যায়শব্দগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

কৈবল্য।

কৈবল্যম্—কেবল + য (ষ্ণ্য) ভাবে। কেবলের ভাবকে কৈবল্য কহে। 'কেবল', শব্দে নিঃসঙ্গ বুঝায়। জীব যখন সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন, তখন তাঁহাকে কেবলী কহে।[২] "প্রকৃতি ও পুরুষকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে সমস্ত কল্পনাজাল নিরস্ত হইয়া যায়, তখন জীব আত্মারাম হইয়া আত্মায় লীন হন ও কেবলীভাব ধারণ করেন"।[৩] সাংখ্যযোগমতে দেহ এবং ইন্দ্রিয় ত্যাগকরণ পূর্ব্বক আত্মার কেবলত্বই (নিঃসঙ্গতাই) কৈবল্য শব্দের তাৎপর্য্য। পুরুষ যখন প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হন তখন সেই অবস্থাকে কৈবল্য কহে।[৪]

নির্ব্বাণ।

নির্ব্বাণম্—নির্ + বা অনট্, ভাবে। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণকে দীপ-নির্ব্বাণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। দীপ যেরূপ নির্ব্বাপিত হইলে আর কদাচ উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ জীবত্বের অবসান হইলে আর উহাকে (জীবকে) খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৌদ্ধনির্ব্বাণে জীবের কোনও অবশেষ থাকে মনে হয় না। বৈদিক দার্শনিকগণের মতে সংসারভাব নির্ব্বাপিত হইলেও জীব নিঃশেষরূপে নিভিয়া যান না। তাই তাঁহাদের মতে

১। অমরকোষ, ১।৫।৬-৭

২। "তদ্বিমুক্তস্তু কেবলী।" শিবসূত্র, ৩।৩৪

৩। শেষনাগ, পরমার্থসার, ৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪। পাতঞ্জলদর্শন, ৪।৩৪ দ্রষ্টব্য।

'নির্ব্বাণ'শব্দে নিঃশেষনির্ব্বাণকে না বুঝাইয়া সশেষনির্ব্বাণকেই বুঝাইয়াছে। অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণকে বুঝাইতে যাইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয়ের কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রহ্মভাবেই অবস্থান করেন। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। অবিদ্যানাশে জীবের যে স্বরূপস্থিতি লাভ হয়, তাহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলা হয়। ভেদাভেদবাদীদের মতেও নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মলয় হওয়াকেই বুঝায়, কিন্তু তাঁহাদের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ছিল না, মুক্তিতে ব্রহ্ম হইল বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্ব্বাণকে অদ্বৈতবাদীদের মত সশেষনির্ব্বাণ বলিলেও ব্রহ্মলয় হওয়াকে নির্ব্বাণ বলেন নাই। তাঁহাদের মতে মুক্তিতেও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকেন, তাঁহারা নির্ব্বাণশব্দে জড়দেহের নির্ব্বাণ বা প্রাকৃতদেহের অভাবকেই বুঝাইয়াছেন।[১] এই বিষয়ে সকল বৈষ্ণবগণই একমত। তাঁহাদের মতে মুক্তজীব বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে গমন করেন। মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রাপ্তিকেই নির্ব্বাণ বলিয়াছেন।

নিঃশ্রেয়স্।

নিঃশ্রেয়সং, নির্ (নিশ্চয়), শ্রেয়স্ (মঙ্গল)। 'নিঃশ্রেয়স্'শব্দে তাই নিশ্চিত পরম-মঙ্গলকে বুঝায়। জীবের জন্মমৃত্যুই পরম অমঙ্গল। কারণ উহাই সকল দুঃখের মূল। এই জন্মমৃত্যুর চিরতরে নাশই পরম মঙ্গল। জন্মমৃত্যুর নাশই মুক্তি। তাই নিঃশ্রেয়স্ অর্থে মুক্তিকেই বুঝায়। 'নিঃশ্রেয়ঃ'কে শাস্ত্রে কোথাও কোথাও শুধু 'শ্রেয়ঃ'ও বলা হইয়াছে।

অমৃত।

অমৃতম্, (ন-মৃতং, মরণ নয়)। মৃত্যুরহিত অবস্থাকেই অমৃত কহে। এখানে মৃত্যু জন্মের উপলক্ষণাত্মক শব্দ, উহাতে জন্মমৃত্যু উভয়কেই বুঝায়। কেন না জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মও অবশ্যম্ভাবী। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—গীতা, ২।২৭। তাই অমৃত-শব্দে জন্মমৃত্যুরহিতাবস্থাকেই বুঝায়। জন্মমৃত্যুরহিতাবস্থাই মুক্তি। অতএব অমৃতশব্দে মুক্তিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[২]

১। অভাবাজ্জড়দেহস্য বিষ্ণুনির্ব্বাণ উচ্যতে। মধ্বাচার্য্য, 'গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়,' ২।৭২ ; (গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৬৯৪.১)।

২। "স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।" প্রশ্ন, উ, ৬।৫

অপবর্গ।

অপবর্গঃ, [অপ-বৃজ্‌=ত্যাগকরা, অ (ঘঞ্‌) ভা। জ=গ]। জীব অনাত্মবর্গকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই অনাত্মবর্গের আত্যন্তিকরূপে বর্জ্জনই অপবর্গ। আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু তাহাই অনাত্মা বা অনাত্মবর্গ। ন্যায়দর্শনে অনাত্মবর্গ বলিতে মিথ্যাজ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম এবং দুঃখকেই বুঝাইয়াছে। তাই উহাদের আত্যন্তিক ত্যাগকেই অপবর্গ বা মুক্তি কহে।[১]

অপুনরাবৃত্তি।

অপুনরাবৃত্তি অর্থ পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন না করা। শাস্ত্রকারদের মতে বারবার দেহধারণ করাই পুনরাবৃত্তি। পুনঃ দেহসম্বন্ধগ্রহণ না করাই অপুনরাবৃত্তি।[২] অপুনর্ভবশব্দেও অপুনরাবৃত্তিকেই বুঝায়। দেহসম্বন্ধই বন্ধন, আর আত্যন্তিক দেহসম্বন্ধ ত্যাগই মুক্তি বা অপুনরাবৃত্তি।

স্বরূপপ্রাপ্তি।

যে অবস্থা হইতে জীব চ্যুত হইয়াছে সেই অবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়া পাওয়াই স্বরূপপ্রাপ্তি। যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। স্বরূপের বিপর্য্যয় হইলে বস্তুর ধ্বংস হয়। জীবের স্বরূপ জীবে নিত্য বর্ত্তমান। সংসার দশায় অজ্ঞানহেতু স্বরূপের জ্ঞান তিরোহিত বলিয়া অনুভব হয় মাত্র, কিন্তু পরমার্থতঃ স্বরূপচ্যুতি হয় না। মোক্ষে ঐ অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হওয়াতে উহা আবির্ভূত হয় বলিয়া অনুভব হয়। পূর্ব্বোক্ত স্বরূপপ্রাপ্তির অর্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানের নিবৃত্তি মাত্র। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"।[৩] "ঠিক এইপ্রকার এই সম্প্রসাদ (মুক্তজীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে আবির্ভূত হন।" এখানে শ্রুতিবাক্যে 'স্বেন' শব্দের দ্বারা স্বরূপপ্রাপ্তিতে কোন আগন্তুক রূপের অভিব্যক্তির কথা নিষেধ করিয়া নিজের স্বাভাবিক রূপটির অভিব্যক্তির কথাই বুঝাইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বন্ধনের নিবৃত্তিমাত্র

১। ন্যায়দর্শন, ১।১।২

২। "অপুনরাবৃত্তিম্ অপুনর্দেহ সম্বন্ধং।" গীতা, ৫।১৭র শঙ্কর ভাষ্য।

৩। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১২।৩

হইলেই স্বরূপপ্রাপ্তি হয়। তাহাতে অপূর্ব্ব কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই। বন্ধন কাটিয়া গেলেই স্বরূপ আবির্ভূত হয় অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান তিরোহিত হয় মাত্র। এই শ্রুতির আধারে আচার্য্য বাদরায়ণও বলিয়াছেন যে, "মুক্তিতে জীব নিজের স্বরূপে স্থিত হন"।[১] অর্থাৎ স্বরূপস্থিতিই বা স্বরূপ-প্রাপ্তিই মুক্তি। 'মহাভারতে' ভিষ্মের উক্তিতে দেখা যায় যে মহর্ষিগণ জন্মদোষ রহিত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ("স্বভাবে পর্য্যবসিতাঃ")।[২] কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ, তাই স্বরূপপ্রাপ্তিতে জীব ব্রহ্ম হন। আবার কাহারও কাহারও মতে স্বরূপপ্রাপ্তিতে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও থাকেন। অপ্রাকৃতভাবই জীবের স্বরূপ। এই ভাবকে লাভ করাই স্বরূপপ্রাপ্তি। এই স্বরূপপ্রাপ্তিকে আত্মস্থিতি, স্বরূপস্থিতি, স্বভাবপ্রাপ্তি এবং পূর্ব্বরূপপ্রাপ্তি শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মভবন।

ব্রহ্মভবনশব্দের অর্থ ব্রহ্ম হওয়া। শ্রুতি বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হন, "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈবভবতি"— মুণ্ডক, উ, ৩।২।৯.। "তস্যৈবাত্মা পদবিৎ"— তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৮.। 'ব্রহ্মের স্বরূপের জ্ঞাতা ব্রহ্ম হন'। মুক্তিতে যে জীব ব্রহ্ম হন তাহার বহু উদাহরণই শ্রুতিতে পাওয়া যায়। 'মহাভারতে' মহর্ষি অসিত নারদকে বলেন, "পুণ্যপাপময়ং দেহং ক্ষপয়ন্ সর্ব্বসংক্ষয়াৎ। ক্ষীণদেহঃ পুনর্দেহী ব্রহ্মত্বমুপগচ্ছতি"— মহাভারত, ১২।২৭৫।৩৭.। অর্থাৎ দেহী পুণ্যপাপময়দেহ ক্ষয় করিতে করিতে সমস্ত কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে ক্ষয় করিয়া দেহবিহীন হইয়া পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মত্বলাভই ব্রহ্মভবন। তাই ব্রহ্মভবনশব্দে মুক্তিকেই নির্দ্দেশ করে।

প্রলয়।

মুক্তিকেই প্রলয় বলা হয়। জনমেজয় উহাকে "আত্মার পরিনির্ম্মিত প্রলয় (অর্থাৎ স্বচেষ্টায় অর্জ্জিত আত্মপ্রলয়) বলিয়াছেন।" নিত্য, নৈমিত্তিক ও মহাপ্রলয় এই ত্রিবিধ প্রলয় হইতে পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য মুক্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়। এই প্রলয়ে প্রলীন জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না,

---

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১

২। মহাভারত, ১২।১৯৫।২—৩

৩। যোগদর্শন, ১।৩

তাই উহাকে আত্যন্তিক বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাতেও জানা যায় যে মুক্তিতে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। জ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। সেই কারণে বলা হয় যে মুক্তিলাভ হইলে জীবভাব থাকে না। এই জীবভাবের লয়কেও প্রলয় শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যাইতে পারে।

সংজ্ঞানাশ।

যেহেতু মোক্ষে জীবভাবের বা ব্যক্তিত্বের নাশ, নির্ব্বাণ বা প্রলয় হয়, সেইহেতু তখন সংজ্ঞাও থাকে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে অতি স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলেন, "নপ্রেত্যসংজ্ঞাহস্তি অরে"।[১] 'অরে (মৈত্রেয়ি)! মোক্ষে সংজ্ঞা[২] থাকে না।' তাহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী চকিত ও মোহগ্রস্ত হইয়া যান। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে উহা তত্ত্বতঃ বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার ঐ মোহ অপনীত করেন।

মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে কি থাকে না?

বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বলেন, "প্রত্যগাত্মা (জীব) দহরাকাশের (ব্রহ্মের) অনুকরণে অপহতপাপত্বাদি গুণসম্পন্ন হন এবং বন্ধবিমুক্ত হন, কিন্তু দহরাকাশ হন না"।[৩] এখানে 'দহরাকাশ' শব্দে শ্রুতি ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছেন। সুতরাং রামানুজের মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হন না, কারণ অনুকরণকারী কখনই অনুকৃতের সহিত এক হইতে পারেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মুক্তজীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন হইয়া যান না।[৪] তাই তিনি মনে করেন মুক্তিতে জীব জীবই থাকেন, কখনই ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান না। ভোগেই জীব ব্রহ্মসাম্য লভে করেন মাত্র। মুক্তিতে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সেখানে গিয়া দাসরূপে অবস্থিত থাকিয়া ভগবানের লীলার সহচর হইয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। দেহাত্মাভিমানই মুক্তির পরিপন্থী, কিন্তু জীবের ব্যক্তিত্ব নহে। মুক্ত জীবের যে ব্যক্তিত্ব ও অপ্রাকৃত দেহমনাদি আছে এই সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণও রামানুজের সহিত একমত।

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।১২

২। সংজ্ঞা = বিশেষজ্ঞান।

৩। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।২১র শ্রীভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪। "ব্রহ্মণোভাবঃ ন তু স্বরূপৈক্যম্", ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১র শ্রীভাষ্য।

সাংখ্যবাদীরাও মুক্তপুরুষের ব্যক্তিত্ব থাকে স্বীকার করেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের মত মুক্তপুরুষের দেহমনাদি আছে তাহা স্বীকার করেন না। জৈন-দার্শনিকগণও মনে করেন যে মুক্তজীব মুক্তিতে সিদ্ধধামে বা সিদ্ধশীলায় গমন করেন, এবং সেখানে ব্যক্তিত্ব ও দেহমনাদি যুক্ত হইয়া বাস করেন।

মুক্তজীবের স্বরূপ কি? তাঁহার ব্যক্তিত্ব থাকে কি থাকে না? এই সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা পূর্ব্বে যাঁহারা মুক্ত-জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে মনে করেন তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এখন যাঁহারা বলেন যে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকেনা তাঁহাদের কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম, কিন্তু বর্ত্তমানে সংসারদশায় আত্মবিস্মৃত, জীবের আত্মবিস্মৃতির হেতু অবিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় তখন জীব ব্রহ্ম হন।[১] অদ্বৈতবাদীদের মতে পরমার্থতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন কোন দ্বিতীয় সদ্‌বস্তু নাই। নির্ম্মলজল অপর নির্ম্মলজলে নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মার একত্বদর্শী মুনির আত্মাও ব্রহ্মই হইয়া যান।[২] সুতরাং অদ্বৈতবাদীদের মতে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব বা দেহমনাদি থাকিতে পারে না।

প্রত্যভিজ্ঞাবাদীরাও বলেন যে মুক্তিতে জীব পরমশিবের সহিত এক হইয়া যান। তাই তাঁহাদের মতেও মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। বীরশৈববাদীদের মতে মুক্তিতে জীব নবরূপ প্রাপ্ত হন, কারণ তাঁহারা বলেন যে জীব বন্ধনদশায় ব্রহ্ম নহে, কিন্তু মুক্তিতে ব্রহ্ম হন। তাই এই মতেও মুক্ত-জীবের ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভেদাভেদবাদী আচার্য্য ভাস্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ ঔপাধিক। জীবের ব্রহ্মাভিন্নতা স্বাভাবিক, ব্রহ্মাংশত্ব ঔপাধিক। মুক্তিতে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির নিবৃত্তি হয়। সুতরাং তখন জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হয়। শুদ্ধজলবিন্দু যেমন শুদ্ধজলে মিশিয়া যায়, ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশ হয়, মুক্তজীব তদ্বৎ ব্রহ্মে অবিভাগ প্রাপ্ত হন।[৩] তাই তাঁহার মতে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকেনা। বৌদ্ধেরা মুক্তিকে নিঃশেষ-নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। দীপ নিভিয়া গেলে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না,

১। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৯ র শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।
২। কঠ, উ, ২।১।১৫ র " "।
৩। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৩ র ভাস্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ঠিক সেইরূপই মুক্তজীবেরও আর কোন সন্ধান মিলে না। তাই বৌদ্ধমতেও মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে মানা হয় নাই।

মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব যে যে সম্প্রদায়ের মতে থাকে ও যে যে সম্প্রদায়ের মতে থাকে না তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে একটি সরল নক্সার অবতারণা করা যাইতেছে।
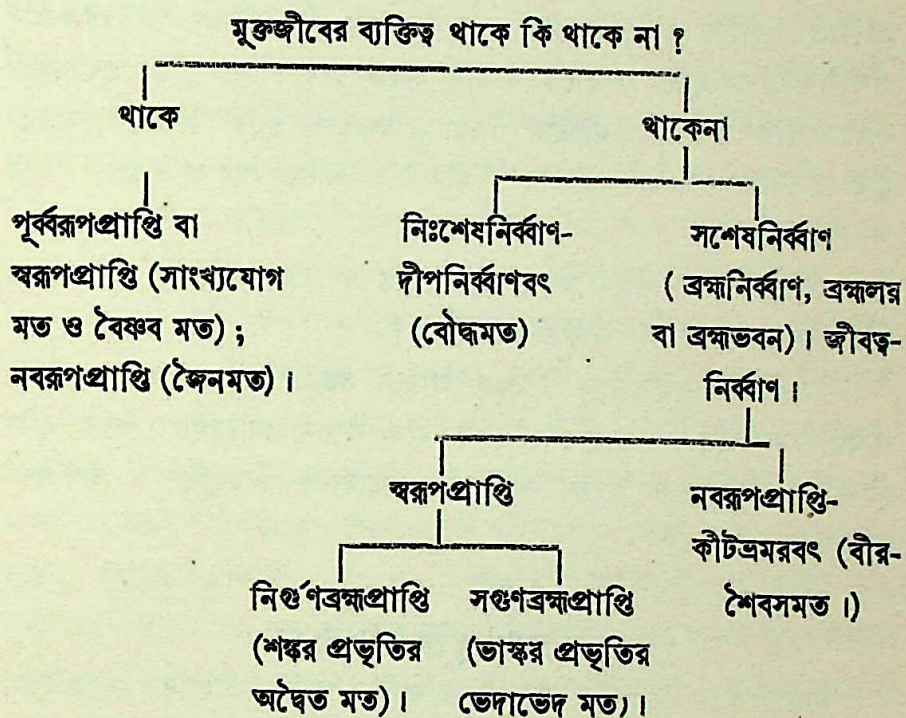
জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি।

পূর্ব্বে দেহ হইতে মুক্তিকে মুক্তি বলা হইয়াছে। আবার অজ্ঞান নাশকেও মুক্তি বলা হইয়াছে। তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান নাশ হয়, দেহ থাকিতে অজ্ঞাননাশ হইতে পারে না। কিন্তু এই বিষয় সন্দেহ করিবার হেতু আছে। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান নাশ হয়।[১] সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়।[২] এখন প্রশ্ন এই যে ব্রহ্মজ্ঞান কি শরীর থাকাকালে বা শরীরপাতে উৎপন্ন হয়? আচার্য্য শঙ্কর বলেন, তত্ত্বজ্ঞান

১। 'জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানি :"। শ্বেতাশ্বতর, উ, ১।১১

২। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি," ছান্দোগ্য, উ, ২।২৩।১

প্রবৃত্তফল কর্ম্মসংস্কারকে অবলম্বন না করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না।[১] তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও কিঞ্চিদ্‌ভুক্তফল আরব্ধকর্ম্মের পূর্ণ ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর পাত হয় না। অজ্ঞানের নাশ হইলেও উহার (অজ্ঞানের) লেশ বা সংস্কার শীঘ্র অপগত হয় না, পরন্তু কিছুক্ষণ তাহার অনুবর্ত্তন থাকিয়া যায়, ইহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বধিতানুবৃত্তি বলে। তাই জ্ঞান হইলেও কিছুক্ষণ শরীরধারণ সংঘটন হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন জ্ঞান হইলেও যে শরীর থাকিতে পারে তাহা ব্রহ্মজ্ঞের অনুভব সিদ্ধ।[২] এই শরীর থাকাকালীন যে মুক্তি তাহাকে আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি জীবন্মুক্তি এবং দেহ-পাতের পরে যে ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হওয়া তাহাকে বিদেহ-মুক্তি বলিয়াছেন। এই দুইপ্রকার মুক্তি যে শ্রুতি প্রসিদ্ধ তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।[৩]

ন্যায়বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ, তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম মতেও জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

অবিদ্যার নাশই মোক্ষ। দেহ অবিদ্যা সঞ্জাত বলিয়া দেহ থাকিতে অবিদ্যার নাশ হয় না, তাই কেহ কেহ মনে করেন যে দেহ থাকিতে মুক্তি হয় না। উপরোক্ত যুক্তি বলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবন্মুক্তিবাদ অস্বীকার করিয়াছেন।

মুক্তজীবের মুক্তি কয়প্রকার।

যাঁহারা মনে করেন যে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব আছে তাঁহাদের মতে মুক্ত-জীবের উৎকর্ষের তারতম্য হেতু মুক্তিতে প্রকারভেদ আছে। আর যাঁহারা মনে করেন মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না তাঁহাদের মতে মুক্তিতে প্রকার ভেদ নাই।

'ছান্দোগ্য'উপনিষদে দেবতার উপাসনার দ্বারা তত্তৎ দেবতার সালোক্য (একই লোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য লাভ), ও সাযুজ্য (এক বৃত্তিতা প্রাপ্তি) লাভের কথা আছে।[৪] শিবপুরাণে ছান্দোগ্যের তিনটির সহিত

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫র শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫র শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩। "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে," কঠ, উ, ৫।১, "অত্রব্রহ্ম সমশ্নুতে" বৃহ, উ, ৪।৪।৭

৪। ছান্দোগ্য, উ, ২।২০।২, বৃহ, উ, ৫।১২।১—২ তে সাযুজ্য ও সালোক্যের উল্লেখ আছে।

সামীপ্যের (উপাস্যের সমীপে বাস) যোগ করিয়া মুক্তি চারিপ্রকার বলা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য শিবপুরাণ, ১।১৬।১৮-২০)। 'ভবিষ্যপুরাণে' 'শিবপুরাণে'র চারিটি হইতে 'সার্ষ্টি' বাদ দিয়া 'সারূপ্য' (উপাস্যের সমানরূপতা লাভ) যোগ করিয়া মুক্তি চারিপ্রকার বলা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য ভবিষ্যপুরাণ, ৩।৪।৭।২৭-২৯)। (আরও দ্রষ্টব্য সূতসংহিতা ৩।২।২৮-২৯)। 'মুক্তিকোপনিষদে' উপাসনালব্ধামুক্তি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ বলা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য ঐ, ১।১৬,২৩)। আর জ্ঞানলব্ধা মুক্তি একপ্রকার, উহাকে কৈবল্য বলা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য ঐ, ১।১৭)। কৈবল্যরূপিণী মুক্তিতে জীব ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন! কৈবল্যমুক্তিই এই উপনিষদের মতে যথার্থ মুক্তি, কারণ এই মুক্তি প্রাপ্তির পর আর পুনরায় জীবের জন্মাদি দুঃখ পাইতে হয় না। (দ্রষ্টব্য ঐ, ১।২৫)। অপর চারিপ্রকার মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি বলা হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে উপাসনালব্ধা মুক্তিকে ছয় প্রকারও বলা হইরাছে।[১] 'সূতসংহিতায়' মুক্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, পরমামুক্তি ও অবরা (নিকৃষ্ট) মুক্তি। জ্ঞানলব্ধা মুক্তিই পরমামুক্তি। এই মুক্তিতে কোন প্রকারভেদ নাই। এই মুক্তি "সুখদুঃখ-বিবর্জ্জিতা, ষড়ভাববিক্রিয়াহীনা, শুভাশুভবিবর্জ্জিতা, সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তা, সত্যবিজ্ঞানরূপিণী, কেবলব্রহ্মরূপিণী, সর্ব্বদাসুখলক্ষণা, হেয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, সর্ব্ববন্ধবিবর্জ্জিতা, দৃষ্ট নয়, শ্রুত নয়, আস্বাদ্য নয়, তর্কিত নয়, সর্ব্বাবরণনির্ম্মুক্তা, জ্ঞেয় নয়, আশ্রিত নয়, বাচ্যবাচকনির্ম্মুক্তা, লক্ষ্যলক্ষণবর্জ্জিতা, সকল প্রাণীর সাক্ষাৎ আত্মভূতা স্বয়ংপ্রভা, প্রতিবন্ধবিনির্ম্মুক্তা এবং নিত্যস্থায়ী পরমার্থ"।[২] উপাসনালব্ধা বা কর্ম্মলব্ধা অবরামুক্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। এই চারিপ্রকার মুক্তিকে পরমামুক্তি হইতে নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে।[৩] সূতসংহিতার মতে তাই পরমামুক্তিই যথার্থ মুক্তি।

১। ষড়বিধা মুক্তি :—সার্ষ্টি সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সাম্যলীনতাম্।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-ব্রহ্মখণ্ড, ১।৬।১৭

২। সূতসংহিতা, ৩।২।২৯—৩৫

৩। সূতসংহিতা, ৩।২।৩৫.২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদ ও উপনিষদের মতে মুক্তি।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে সাধারণভাবে মুক্তি শব্দের তাৎপর্য্য অবগত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে বিশদভাবে বেদ ও উপনিষদাদি শাস্ত্রের মতে মুক্তির স্বরূপ অনুধাবন করিবার প্রয়াস করিব। বেদ ও তৎপরে উপনিষদই হইল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের বা হিন্দু দর্শনের প্রধান বা মূল ভিত্তি। উহাকে অবলম্বন করিয়াই পরে বিভিন্ন দার্শনিক শাখাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা যথাস্থানে সেই সকল বিভিন্ন দার্শনিক শাখার মতে মুক্তির স্বরূপ চর্চ্চা করিব। এখন দেখা যাউক বেদ ও উপনিষদের মতে মুক্তির স্বরূপ কি ?

বেদ ও উপনিষদে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, ব্রহ্মভবন, সর্ব্বভবন, সর্ব্বাতীতভবন, ব্যক্তিত্বলোপ, স্বরূপপ্রাপ্তি প্রভৃতিকেই মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐসকল অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নে চর্চ্চা করা যাইতেছে।

বেদ ও উপনিষদের মতে মুক্তি।

অমৃতত্বপ্রাপ্তিই মুক্তি।

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন, "য ইত্তদ্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ" ।[১] 'যাঁহারা তাহা (বেদোক্ত তত্ত্ববস্তু) জানেন, তাঁহারই অমৃতত্বলাভ করেন'। "য ইত্তদ্বিদু স্ত ইমে সমাসতে।"[২] 'যিনি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি তাঁহাতে সম্যক্ স্থিত হন (আর পুনরাবর্ত্তন করেন না)'। দীর্ঘতমা ঋষির মতে, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই জীব ব্রহ্মে সম্যক্ স্থিতি লাভ করেন। ব্রহ্মে একবার সম্যক্ স্থিতিলাভ হইলে জীব ইহসংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। সুতরাং উহা অমৃতত্ব বা মোক্ষ। "তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ" ।[৩] 'তাঁহাকে জানিয়াই (ঋষিগণ) মৃত্যু হইতে ভয়প্রাপ্ত হন না (অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করেন)'। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ।[৪] 'ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব লাভ করেন' ইত্যাদি।[৫] মহর্ষি পিপ্পলাদ

১। ঋক্‌সং, ১৬।২৩ ; অথসং, ৯।১০।১২ ; ঐত ব্রা, ৩।১২।৬ ; কৌষী ব্রা, ১৪।৩

২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩৯ ; অথসং, ৯।১০।১৮ ; তৈত্তি ব্রা, ৩।১০।৯।১৪ ; তৈত্তি আ, ২।১১ ; শ্বেত, উ, ৪।৮

৩। অথসং, ১০।৮।৪৪

৪। ছান্দোগ্য, উ, ২।২৩।১

৫। শ্বেতা, উ, ১।১১ ; ৩।১, ১০, ১৩ ; ৪।১৭, ২০ ; কঠ, উ, ১।৩।৮, ১৫ ; মুণ্ডক, উ, ২।১।১০ ; ২।২।৭, ৮ ; ৩।২।৯ ; তৈত্তি, উ, ২।১, ৪

বলিয়াছেন, 'হে শিষ্যগণ !' "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি"।[১] 'বেদনীয় সেই পুরুষকে জান যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত না করিতে পারে'। অর্থাৎ সেই পুরুষকে জানিলেই তোমাদিগকে আর মৃত্যুতে ব্যথিত হইতে হইবে না, তোমরা অমৃতত্ব লাভ করিবে। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্"।[২] 'যাহাতে পঞ্চ পঞ্চজন (চারিবর্ণ ও নিষাদ অর্থাৎ সমস্তজীব) ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি অমৃতব্রহ্ম বলিয়া মনে করি, এবং তাঁহাকে জানিয়াই আমি অমৃত হইয়াছি'। এই অমৃতত্ব প্রাপ্তিই যে মুক্তি তাহা বেদে বহুধা স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মভবনই মুক্তি।

ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্মই হন। যথা, স্বয়ম্ভূব্রহ্মা বলিয়াছেন, "পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবিবেশ"।[৩] 'প্রথমোৎপন্নের সম্যক্ সেবা করিয়া সর্ব্বভূতকে, লোকসমূহকে এবং সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌কে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মরূপে জানিয়া (অর্থাৎ সার্ব্বাত্ম্যলাভ করিয়া) নিজে ঋতাত্মাতে (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে) সম্যক্ প্রবেশ করেন'। "পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য ইত্বা পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরি স্বঃ। ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য তদপশ্যত্তদভবত্তদাসীৎ"।[৪] 'দ্যাবাপৃথিবী, লোকসমূহ, দিক্‌সমূহ এবং স্বর্গকে ঋতের (ব্রহ্মের) বিস্তার বলিয়া বুঝিয়া, উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মরূপে জানিয়া সদ্য তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হন এবং বস্তুতঃ তাহাই থাকেন'। স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন যে, "তদপশ্যত্তদাসীত্তদভবৎ" অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হন এবং তাহাই থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেই যে জীব ব্রহ্ম হন, তাহা নহে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও সে বস্তুতঃ ব্রহ্মই ছিলেন। এই প্রকার শ্রুতিবাক্য আরও বহু আছে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ"।[৫] 'যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি

১। প্রশ্ন, উ, ৬।৬

২। শত ব্রা (মাধ্যন্দিন শাখা), ১৪।৭।২।১৯; বৃহ, উ, ৪।৪।১৭

৩। বাজসং (মাধ্যন্দিন শাখা), ৩২।১১; কাণ্বসং, ৪।৫।৩।৮; তৈত্তি আ, ১০।১।১৬ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)

৪। বাজসং (মাধ্যন্দিন শাখা), ৩২।১২; কাণ্বসং, ৪।৫।৩।৯; তৈত্তি আ, ১০।১।১৭

৫। তৈত্তি আ, ২।২, আর দ্রষ্টব্য বৃহ, উ, ৪।৪।৬

ব্রহ্মকে পাইয়া ব্রহ্মই হন'। শুধু ব্রহ্মভবনের উল্লেখও আছে। যথা "তদিতি বা এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতি যোঽস্যৈতদেব নাম বেদ ব্রহ্মভবতি ব্রহ্মভবতি"।[১] 'এই মহৎ ভূতের নাম 'তৎ'।[২] যিনি ইহার সেই নাম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন, ব্রহ্ম হন'। "অভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ"।[৩] 'ব্রহ্ম নিশ্চয় অভয়। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি নিশ্চয়ই অভয় ব্রহ্ম হন'। "তস্যৈবাত্মা পদবিৎ"।[৪] 'ব্রহ্মের স্বরূপের জ্ঞাতা ব্রহ্মের আত্মা হন,' অর্থাৎ ব্রহ্ম হন'। "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"।[৫] 'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন'। ব্রহ্মই আত্মা। তাই কোথাও কোথাও আছে যে জ্ঞানী সর্ব্বভূতের আত্মা হন। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি রাজা জনককে বলেন, "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং এনং পশ্যতি সর্ব্বোঽস্যাত্মা ভবতি সর্ব্বস্যাত্মা ভবতি"।[৬] 'সুতরাং এবংবিৎ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই আত্মাকে (আপন) আত্মাতে দর্শন করেন, সমস্তই তাঁহার আত্মা হন, তিনি সকলের আত্মা হন'।

'শাংখ্যায়নারণ্যকে' বর্ণিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মজ্ঞানী সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করতঃ দেবযান পথে ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হন"।[৭] তখন "ব্রহ্মগন্ধ", "ব্রহ্মরস" "ব্রহ্মতেজ" প্রভৃতি তাঁহাতে প্রবেশ করে ("প্রবিশতি")। অর্থাৎ তিনি সম্যক্ ব্রহ্মময় হন। তখন ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? তিনি উত্তর করেন, "আমি ঋতু। আমি আর্ত্তব। আমি আকাশরূপ যোনি হইতে ভার্য্যাতে সম্ভূত হইয়াছি! আমি সংবৎসরের বীজ। আমি প্রকাশমান সর্ব্বভূতের আত্মা"। "যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি," (তুমি যাহা, আমিও তাহাই) ইত্যাদি।[৮] ইহা হইতে অনায়াসে জানা যায় যে শাংখ্যায়নারণ্যকে'র মতেও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হন। তিনি সর্ব্বাত্মক হন। জৈমিনীয়ব্রাহ্মণেও ঐ প্রকার এক আখ্যায়িকা আছে। যখন ব্রহ্মলোকগত পুরুষ প্রজাপতিকে

১। ঐত আ, ৫।৩।৩

২। ভগবদ্ গীতায়ও আছে যে ব্রহ্মের একনাম 'তৎ'

৩। শত ব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৮ ; শাংখ্যায়ন আ, ১৩।২

৪। তৈত্তি ব্রা, ৩।১২।৯।৮

৫। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৯

৬। শত ব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।২৮

৭। স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রেতি।"—শাংখ্যায়ন আ, ৩।৪=কৌষী, উ, ১।৪

৮। শাংখ্যায়ন আ, ৩।৬=কৌষী, উ, ১।৬

বলেন, "যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি যোঽহমস্মি স ত্বমসি"।[১] 'তুমি যাহা, আমিও তাহাই'। 'যাহা আমি, তুমিও তাহাই।' তখন প্রজাপতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাহাতে তিনি সুকৃতের এই সার ফল "সুকৃতরসং" প্রাপ্ত হন। তাহাতে জানা যায় যে পুণ্যকর্ম্মের পরম ফল প্রজাপতির সহিত ঐকাত্ম্যবোধ।

সর্ব্বভবনই মুক্তি

ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ জীবও যে সর্ব্বাত্মতা লাভ করিতে পারেন[২] তাহার কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা, বামদেব ঋষি সর্ব্বাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট ও উপলব্ধ তত্ত্ব 'ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৬তম সূক্তে বিবৃত আছে। ঐ সূক্ত সাধারণতঃ তাঁহার নামানুসারে 'বামদেবসূক্ত' বলিয়া অভিহিত হয়। উহা হইতে দেখা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞ সর্ব্বাত্মক হন। 'আমি মনু হইয়াছিলাম। আমিই সূর্য্য। আমিই (দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র) মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি। আমি আর্জ্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে প্রসন্ন করিয়াছি। আমি উশনা কবি। হে জনগণ! (সর্ব্বাত্মক) আমাকে দেখ'।[৩] বামদেব ঋষির সর্ব্বভবনের উল্লেখ 'শতপথ-ব্রাহ্মণে'ও আছে।[৪] তথায় আছে যে বামদেব "অহং ব্রহ্মাস্মি" ('আমি ব্রহ্মই') ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ("প্রত্যবুধ্যত"), তাহাতেই তিনি 'সর্ব্ব হইয়াছিলেন' ("সর্ব্বমভবৎ")। তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে, "তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি"।* 'এখনও পর্য্যন্ত যে এই প্রকার জানেন যে 'আমি ব্রহ্মই', সে এই সমস্তই হন'। বামদেবের একটি ঋক্ 'ঐতরেয়ারণ্যকে'ও অনূদিত হইয়াছে।[৫] পুরুকুৎসের পুত্র রাজর্ষি ত্রসদস্যু সর্ব্বাত্মকতা উপলব্ধি করেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার স্বমহিমাখ্যাপন ঋগ্‌বেদের ৪র্থ মণ্ডলে ৪২তম সূক্তে নিবদ্ধ আছে। যথা, 'আমি সমস্ত বিশ্বের অধিপতি ক্ষত্রিয় (বা বলবান)। আমার রাষ্ট্র দ্বিবিধ। আমিই রূপবান ও অন্তিকস্থ বরুণ। সমস্ত অমর দেবগণ আমারই। তাঁহারা আমার ক্রতু করে। আমি মনুষ্যগণেরও রাজা। আমি সর্ব্বেশ্বর'।[৬] "অহং

১। জৈমিনীয়, উ, ব্রা, ১।১৪।৫ ; জৈমি, ব্রা, ১।১৮।৫

২। "ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে' বৃহ, উ, ১।৪।৯

৩। ঋগ্‌বেদ, ৪।২৬।১

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।২২ , বৃহ, উ, ১।৪।১০ * বৃহ, উ, ১।৪।১০

৫। ঋকৃসং, ৪।২৭।১=ঐত আ, ২।৫।১

৬। ঋগ্‌বেদ, ৪।৪২।১

রাজা বরুণো মহ্যং তান্যসূর্য্যানি প্রথমা ধারয়ন্ত। ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজাস্মি কৃষ্টেরূপমস্য বব্রেঃ"[১]। 'আমিই রাজা বরুণ। আমার জন্যই (দেবগণ) সেই সেই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যসমূহ ধারণ করেন। আমিই রূপবান ও অন্তিকস্থ বরুণ' ইত্যাদি। মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্‌ও সর্ব্বাত্মকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুভূতি 'ঋগ্‌বেদের' ১০ম মণ্ডলের ১২৫ তম সূক্তে এবং 'অথর্ব্ববেদের' ৪র্থ কণ্ডিকার ৩০ তম সূক্তে লিপিবদ্ধ আছে। "অহং রুদ্রেভিঃ বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা"।[২] 'আমিই রুদ্রগণ এবং বসুগণরূপে বিচরণ করি। আমিই আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। ইন্দ্র, অগ্নি, এবং অশ্বিনীদ্বয়কেও আমি ধারণ করি', ইত্যাদি। এই সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রেও এইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল দৃষ্টান্ত ব্যতীত সর্ব্বভবনের অনেক মহিমাও শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। যথা, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি"।[৩] 'যিনি সর্ব্বভূতকে আপনাতে এবং আপনাকে সর্ব্বভূতে দেখেন, তিনি আর সংশয় করেন না'। "কাণ্বসংহিতায়' এই মন্ত্রের 'বিচিকিৎসতি'র স্থলে বিজিগুপ্সতে' পাঠ আছে।[৪] তাহাতে জানা যায় যে সর্ব্বাত্মদর্শী কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র আত্মাকে দেখেন, এবং আত্মা ভিন্ন কোন বস্তু দেখেন না, সেই হেতু তাঁহার কোন বিষয়ে সংশয় থাকে না। যেহেতু আত্মারূপে সমস্ত তাঁহার আপন, সেই হেতু তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন, "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্। সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ"॥ ইতি; "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ; শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রানি চ বিংশতিঃ"।[৫] 'সর্ব্বদর্শী (যিনি সর্ব্ববস্তুকে ব্রহ্ম, অহং বা আত্মা বলিয়া দর্শন করেন) মৃত্যুকে, রোগকে ও দুঃখকে দেখেন না। ঐ বিদ্বান্ সমস্তকে (ব্রহ্মরূপে) দেখেন এবং (সেই হেতু) সমস্তকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হন। তিনি (ব্রহ্মরূপে) একরূপ হন, আবার (সৃষ্টিকালে দৃষ্টিভেদে) তিন, পাঁচ, সাত,

১। ঋগ্‌বেদ, ৪।৪২।২
২। ঋগ্‌বেদ, ১০।১২৫।১ = অথর্ব্ববেদ, ৪।৩০।১
৩। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৬
৪। কাণ্বসং, ৫।১০।১।৬ = ঈশো, উ, ৬
৫। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৬।২

নয় প্রকার হন; পুনঃ তিনি একাদশ, একশত এগার ও একসহস্র বিশও হন'। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'অনেক অনর্থসঙ্কুল এবং বহুবিধ সন্দেহাস্পদ এই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট আত্মা যাঁহার অনুভূত এবং প্রত্যক্ষীকৃত, তিনি বিশ্বকৃৎ; কেননা, তিনি সকলের কর্ত্তা। সমস্ত লোক তাঁহারই এবং তিনিই সমস্ত লোক'।[১]

সর্ব্বাতীত ভবনই মুক্তি।

ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জীব ব্রহ্ম হন। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। সুতরাং সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই জীব সর্ব্ব হন। যেহেতু ঐভাবে ব্রহ্ম দ্বৈতাত্মক (অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত হইয়াও স্বগতভেদ যুক্ত), সেই হেতু আচার্য্য শঙ্কর ঐ ব্রহ্মৈকাত্মদর্শনকে "দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শন" বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ম্মসহিত দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শন সম্পন্ন বিদ্বান্ দেহত্যাগের পর জগদাত্মত্ব বা হিরণ্যগর্ভত্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন।[২] তিনি বলেন, পুণ্যসঞ্চয়ের পরমোৎকর্ষ দ্বৈতৈকত্বাত্মপ্রাপ্তিই।[৩] শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি"।[৪] 'মৃত্যু তাঁহার আত্মা হন, তিনি ঐ দেবতাদিগের একজন হন'। অশনায়া লক্ষণ মৃত্যু প্রথমোৎপন্নপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিই।[৫] সুতরাং তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্যলাভ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভভবন বা প্রজাপতিভবন, শঙ্করের ভাষায় দ্বৈতৈকত্বাত্মলাভই।[৬] উহাকে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মভবনও বলা যায়। সর্ব্বাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্যবোধও হইতে পারে। নারায়ণ ঋষি এবং বিশ্বকর্ম্মা ঋষি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে "অত্যতিষ্ঠৎ সর্ব্বাণি ভূতানীদং সর্ব্বমভবৎ।[৭] 'সর্ব্বভূতকে অতিক্রম করতঃ অবস্থিত ছিলেন এবং এই সমস্তই হইয়াছিলেন।' আচার্য্য যাস্ক বলিয়াছেন,[৮] 'ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা (ঋষি) সর্ব্বমেধে সমস্ত ভূতবর্গকে হবন করিয়াছিলেন, পরিশেষে তিনি আপনাকেও হবন করিয়াছিলেন'। এইরূপে

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১৭; বৃহ, উ, ৪।৪।১৩

২। বৃহ, উ, ৩।২।১৩ উপর শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য

৩। বৃহ, উ, ৩।৪ ব্রাহ্মণের শঙ্কর ভাষ্যের আভাস

৪। বৃহ, উ, ১।২।৭

৫। বৃহ, উ, ১।২।১

৬। বৃহ, উ, ৩।৩।১ উপর শঙ্কর ভাষ্য

৭। শত ব্রা (মাধ্য), ১০।৭।১।১৪; ১৩।৬।১।১

৮। নিরুক্ত, ১০।২৬

সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করতঃ তিনি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চ অবস্থাই। উহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা (ঋষি) ঋগ্‌বেদের ১০ মণ্ডলে ৮১ তম এবং ৮২ তম সূক্তের মন্ত্র দ্রষ্টা। ঐ মন্ত্রগুলি অপরাপর সংহিতায়ও পাওয়া যায়।[১] যাস্ক বলেন, ঐসকল মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মা ঋষি সর্ব্বমেধ বর্ণনা করিয়াছেন। 'বাজসনেয়-সংহিতায়' সর্ব্বভবন ও তাহার মহিমা খ্যাপনের পর বলা হইয়াছে, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"[২] 'যে সময় (তাঁহার) অবগতি হয় যে সমস্ত ভূতবর্গ আত্মাই, সেইসময় ঐ একত্বদর্শীর শোক কি ? আর মোহই বা কি' ? ইহাতে সর্ব্বাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চ অবস্থার মহিমা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'একত্ব' শব্দের বিশেষ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে তখন কোনপ্রকারে দ্বৈতবোধ নাই। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সর্ব্বভবন বিষয়ক মন্ত্রে আছে, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্ম-ন্যেবানুপশ্যতি অর্থাৎ" 'যিনি সর্ব্বভূতবর্গকে আপনাতে' ইত্যাদি ! তথায় 'যস্তু' প্রয়োগের বিশেষ রহস্য এই মনে হয় যে বহু সাধকের মধ্যে যে সাধকের ঐ প্রকার সার্ব্বাত্ম্য অবগতি হয়। আর বর্ত্তমান মন্ত্রে "যস্মিন্" প্রয়োগের গূঢ়রহস্য এই মনে হয় যে, যে সময় ঐ সাধকেরই অবগতি হয় যে ইত্যাদি। এইরূপে মনে হয়, সর্ব্বাতীত অবস্থাকে সর্ব্বাত্মক অবস্থার পরভবী বলাই যেন শ্রুতির উদ্দেশ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি"[৩] 'মুক্তিতে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না', (দ্বৈতবোধ থাকে না)। এইরূপ শ্রুতিবাক্য আরও আছে।[৪]

ব্রহ্মসাম্যভবনই মুক্তি।

কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ॥[৫] 'যখন দ্রষ্টা

১। তৈত্তসং, ৪।৬।২।১ ; বাজসং (মাধ্য), ১৭।১৭ ; মৈত্রাসং, ২।১০।২, কাঠসং, ১৮।১ ইত্যাদি।

২। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৭ ; কাণ্বসং, ৪।১০।১।৭=(ঈশ, উ, ৭)

৩। বৃহ, উ, ২।৪।১২ ; ৪।৫।১৩

৪। বৃহ, উ, ৪।৩।৩২

৫। মুণ্ডক, উ, ৩।১।৩।

সুবর্ণবর্ণ (জগৎ) কর্ত্তা এবং (জগতের) যোনি ঈশ্বরপুরুষ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন ঐ বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপকে পরিত্যাগ করতঃ নিরঞ্জন হইয়া পরমসাম্য প্রাপ্ত হন'। ঐ মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রে 'সমান' শব্দ 'এক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'এক' অর্থে 'সমান' শব্দের ব্যবহার ঋগ্‌বেদেও বহু পাওয়া যায়।[১] সুতরাং 'সাম্য' অর্থ 'একীভাব' বা 'একত্ব'। ঐ মুণ্ডকোপনিষদেই পরে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে মুক্তজীব ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন ("একীভবন্তি")।[২] ঐ সাম্য 'পরম' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়াতে বুঝা যায় উহা নিরতিশয় সাম্য অর্থাৎ সেই অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে জীবের কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ থাকে না।[৩] শ্রুতি পরে সমুদ্রে পতিত নদীর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন যে তখন ব্রহ্ম হইতে জীবের কোনও পার্থক্য থাকেনা, জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।[৪] ঋগ্‌বেদে আছে, "মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।" ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি মনে করেন যে এই মন্ত্রোক্ত 'মহান্‌দেব' শব্দ-দ্বয় দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায়। এবং সেইহেতু উপরোক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে মানুষ তাঁহার (ব্রহ্মের) সহিত "সাম্য"লাভ করেন।[৫] সুতরাং পতঞ্জলির মতে ঋগ্‌বেদে ব্রহ্মসাম্য লাভের কথা আছে।

ব্যক্তিত্বলোপই মুক্তি।

উপনিষদে কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে মুক্তপুরুষের ব্যক্তিত্ব থাকেনা। যথা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, পঞ্চভূতাত্মক উপাধির সম্পর্কে জীবের ব্যক্তিত্ব (খিল্যভাব) উৎপন্ন হইয়াছে। এবং জ্ঞানোদয়ে উপাধির সঙ্গে সঙ্গে উহাও বিনষ্ট হয়।[৬] অন্য দৃষ্টান্তদ্বারাও উহা অতি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যম নচিকেতাকে বলেন, "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম"।[৭] 'শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত শুদ্ধ জল যে প্রকার তেমনই হয় (অর্থাৎ উভয়ে একই হয়),

---

১। ঋক্ সং, ১।১৬৪।২০=(মুণ্ডক, উ, ৩।১।১) ; ১।১৬৪।৫১ ; ৭।১০৩।৬ ইত্যাদি।

২। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৭।

৩। শঙ্কর বলিয়াছেন, "পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং…।"

৪। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৮।

৫। দ্রষ্টব্য ঋগ্‌বেদ ভাষ্যভূমিকা।

৬। বৃহ, উ, ২।৪।১২ ; ৪।৫।১৩

৭। কঠ, উ, ২।১।১৫

হে গৌতম! মননশীল বিজ্ঞানী পুরুষের আত্মাও তেমনি (অর্থাৎ ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত) হন'। অন্যত্র নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত আছে। "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মানি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বে একী ভবন্তি"।[১] '(দেহারম্ভক প্রাণাদি) পঞ্চদশ কলা আপন আপন করণে গত হয়। (চক্ষুরাদি) সমস্ত ইন্দ্রিয় (আদিত্যাদি) স্ব স্ব প্রতিদেবতায় লীন হয়। কর্ম্মসমূহ এবং বিজ্ঞানাত্মা সমস্তই অব্যয় পরব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়।' "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"।[২] 'যেমন প্রবহমান নদীসমূহ সমুদ্রে পড়িয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ করতঃ সমুদ্রে বিলীন হয়, সেই প্রকার বিদ্বান্ (জীব) নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন'। শ্রুতি আরও বলেন, যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত নদীসমূহ সমুদ্রকে পাইয়া অস্তমিত হয়, তাহাদের স্ব স্ব নামরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সমুদ্র বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; ঠিক সেইরূপ পরমপুরুষনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীরও ষোড়শ কলা পরমপুরুষে গিয়া বিলুপ্ত হয়, তাহাদের নামরূপ বিনষ্ট হয়, তখন তিনি পরমপুরুষ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। তিনি অকল (অর্থাৎ পূর্ণ) এবং অংশজ্ঞানশূন্য ও অমৃত হন।[৩]

স্বরূপপ্রাপ্তিই মুক্তি।

এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বেদ ও উপনিষদের মতে মুক্তিতে জীবের সংজ্ঞা বা ইন্দ্রিয়জ বিশেষজ্ঞান থাকে না এবং ব্যক্তিত্বও থাকে না। তাই পরবর্ত্তী বৈদিক দার্শনিকগণ মুক্তিকে নির্ব্বাণও বলিয়াছেন। পরন্তু, তাই বলিয়া, তখন জীবের অভাব হয় না, জীব শূন্যে পর্য্যবসিত হয় না। অর্থাৎ কোন কোন নৈরাত্ম্যবাদী বা শূন্যবাদী দার্শনিকগণ মুক্তিকে বা নির্ব্বাণকে যাহা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, বৈদিক দার্শনিকগণ তাহা মনে করেন না।[৪] উপনিষদের মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হন। ব্রহ্মভবন হেতুই জীবভাবের (ব্যক্তিত্বের) এবং ইন্দ্রিয়জ বিশেষজ্ঞানের বিনাশ বা নির্ব্বাণ হয়। সেইহেতু পরবর্ত্তী বৈদিক দার্শনিকগণ মুক্তিকে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ

১। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৭

২। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৮।

৩। প্রশ্ন, উ, ৬।৫।

৪। তৈত্তি, উ, ৩।৬ দ্রষ্টব্য।

বলেন। উহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহারা কখনও কখনও নির্ব্বাণ সংজ্ঞা দ্বারাও বুঝাইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপে সিদ্ধ হয় যে শ্রুতির মতে মুক্তিতে জীবের বিনাশ হয় না, বরং উহার বৃদ্ধি বা বৃংহণই হইয়া থাকে, অণুমাত্র হইতে উহা বৃহত্তম ব্রহ্ম হইয়া থাকে। 'শাণ্ডিল্যোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে "চিদানন্দৈকরসসন্মাত্র" পরমতত্ত্বই জীবের, অথবা আরও প্রকৃত বলিতে, সর্ব্বজগতের, এই বৃংহণ করিয়া থাকেন এবং সেইহেতু উহা 'পরব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।[১] আবার মুক্তিতেই জীব ব্রহ্ম হন, কিন্তু ইহার আগে ব্রহ্ম ছিলেন না, তাহাও নহে। শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্তির পূর্ব্বে বন্ধনদশায়ও জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মই। কেননা, ব্রহ্মই জীব সাজিয়া বন্ধনগ্রস্ত হন। সুতরাং মুক্তিতে জীব আপন স্বরূপকে পুনঃ প্রাপ্ত হন, উহা ব্রহ্ম হন, উত্তম পুরুষ হন। যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন, "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি"।[২] 'আর এই যে সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরঃ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন। ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয়; এবং ইনিই ব্রহ্ম'। (আচার্য্য) এই কথা বলেন, "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমপুরুষঃ"।[৩] 'সেই প্রকার এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরঃ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন। (তখন) তিনি উত্তম পুরুষ'। এই শ্রুতিবচনদ্বয়ের আধারে আচার্য্য বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন যে মুক্তিতে জীবের আপন স্বরূপ আবির্ভূত হয়, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।[৪] তাই মুক্তিতে জীবের স্বরূপপ্রাপ্তি হয় বলিলে বুঝিতে হইবে যে মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বা জীব ব্রহ্মই হন।

১। শাণ্ডিল্যোপনিষদ্, ৩।২

২। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৩।৪

৩। ঐ, ৮।১২।৩

৪। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১৯ ; "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ" ঐ, ৪।৪।১

তৃতীয় অধ্যায়

বেদান্তদর্শনে মুক্তি।

বেদ ও উপনিষদের পরেই মোক্ষধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তদর্শন (বাদরায়ণ-ব্যাস কৃত বেদান্তসূত্র ও উহার উপর বিভিন্ন আচার্য্যদের ভাষ্য) সমধিক শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের মতে মুক্তির স্বরূপ অবগত হইতে যাইয়া আমরা ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রাচীন আচার্য্যদের মতে মুক্তির স্বরূপ ও পরমর্ষি বাদরায়ণের নিজমতে মুক্তির স্বরূপ প্রথমে জ্ঞাত হইয়া পরে ঐ দর্শনের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণের মতে মুক্তির স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মসূত্রোক্ত জৈমিনিমতে ও বাদরিমতে মুক্তজীবের স্বরূপ।

"ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ"।[১] 'জৈমিনি (আচার্য্য বলেন), উপন্যাসাদি হইতে (জানা যায়, মুক্তজীব) ব্রাহ্মরূপে* (অভিনিষ্পন্ন হন)।' 'উপন্যাস' অর্থে বাক্যের মুখ বা উপক্রম, উদ্দেশ্য।[২] মুক্তজীবের স্বস্বরূপাভিনিষ্পত্তির উপদেশ সনৎকুমার নারদকে এবং প্রজাপতি ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতি-ইন্দ্রসংবাদের প্রারম্ভে একটা কথা আছে, "যে আত্মা নিষ্পাপ, অজর, অমর, অশোক, অবুভুক্ষু, অপিপাসু, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প সেই আত্মাই অন্বেষণের বিষয় এবং জিজ্ঞাসার বিষয়। যিনি সেই আত্মাকে (শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ অনুসারে পরোক্ষভাবে) জানিয়া (অপরোক্ষভাবে) অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম প্রাপ্ত হন, একথা প্রজাপতি বলিয়াছেন।[৩] সনৎকুমারও দহরবিদ্যায় এরূপ কথা বলিয়াছিলেন।[৪] মুক্তাত্মা কিরূপ কামভোগাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহার বর্ণনাও তাঁহারা উপসংহারে করিয়াছিলেন।[৫] প্রজাপতি বলিয়াছেন, "সে সম্প্রসাদ তথায় (স্বরূপাভিনিষ্পন্ন অবস্থায়) স্ত্রীদিগের সহিত,

---

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৫। * ব্রাহ্ম=ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। তাহা নিষ্পাপ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি।

২। "স্যাদুপন্যাসস্তু বাঙ্‌মুখম্"; "প্রক্রমঃ স্যাদুপক্রমঃ" —অমরকোষ।

৩। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৭।১

৪। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১।৫

৫। ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩; ৮।১।৬

অথবা যানবাহনাদি আরোহনে, অথবা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত হাস্য করতঃ, ক্রীড়া করতঃ, আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, উপজন (আত্মসন্নিহিত) এই শরীরকে স্মরণ করেন না"—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩। সনৎকুমার বলিয়াছেন, "সমস্ত লোকে তাঁহাদের কামচার (স্বাধীনতা) হইয়া থাকে" ইত্যাদি—ছান্দোগ্য, ৮।১।৬। মুক্তাত্মা নিষ্পাপত্বাদি ব্রাহ্মগুণবিশিষ্ট এবং কামচারত্বাদি ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যযুক্ত স্বরূপসম্পন্ন হন। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মগুণও তিনি লাভ করেন। আচার্য্য জৈমিনি আরও বলেন যে, মোক্ষে মনের ন্যায় শরীর এবং ইন্দ্রিয়ও বর্ত্তমান থাকে।[১] জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন, মুক্তজীবের শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির ভাব আছে। কারণ, শ্রুতিতে বিকল্পের নির্দ্দেশ আছে'। ভূমাবিদ্যার উপদেশকালে সনৎকুমার নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন, জৈমিনি মুনি তাহার নিম্ন রূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বিকল্পের নির্দ্দেশ সমর্থন করেন। যথা, তিনি (মুক্তপুরুষ) এক প্রকার হন, তিন প্রকার হন, পাঁচ প্রকার হন, সাত প্রকার ও নয় প্রকার হন। পুনশ্চ তিনি একাদশ, একশত একাদশ ও বিংশত্যাধিক সহস্র প্রকার বলিয়াও কথিত হন"।[২] শরীরভেদ ব্যতীত অনেকবিধ হওয়া সম্ভব নহে। "অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্"।[৩] "বাদরি (আচার্য্য) মনে করেন, মুক্তজীবের শরীরেন্দ্রিয়াদির অভাব হয় (অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়াদি থাকে না)। কারণ শ্রুতি ঐরূপই বলিয়াছেন। প্রজাপতি স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে মোক্ষে জীব শরীরভাব ত্যাগ করেন, "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদি। তদনন্তর তিনি উপদেশ করিয়াছেন, "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে"।[৪] 'মন তাঁহার দৈব চক্ষু। সেই আত্মা এই মনরূপ চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত কাম্য বিষয়সমূহ আছে সে সমুদয় দর্শন করতঃ আনন্দোপভোগ করেন'। যদি মুক্ত আত্মা মনের ন্যায় শরীর এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাও বিহার করিতেন, তবে শ্রুতি অতি স্পষ্টাক্ষরে 'মনের দ্বারা' (মনসা) একথা বলিতেন না। এই শ্রুতিবলে আচার্য্য বাদরি সিদ্ধান্ত করেন যে মুক্ত আত্মার মন থাকে, কিন্তু শরীর এবং অপর ইন্দ্রিয় থাকে না। জৈমিনি ও বাদরি উভয় মুনির স্বস্বমতে মুক্তের যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে সেই

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১১

২। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৬।২

৩। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০

৪। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১২।৫

স্বরূপস্থিতিই তাঁহাদের স্বস্বমতে মুক্তি। সশরীর ও অশরীর উভয় বোধিকা শ্রুতি থাকাতে আচার্য্য বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন যে, মুক্ত আত্মা যখন সশরীরতার সঙ্কল্প করেন তখন সশরীর হন এবং যখন অশরীরতার সঙ্কল্প করেন তখন অশরীর হন। তাই তাঁহার মতে মুক্তাত্মা উভয়বিধ বলিয়াই মীমাংসা করা সমীচীন।[১]

ব্রহ্মসূত্রোক্ত ঔড়ুলোমি মতে মুক্তজীবের স্বরূপ।

"উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।[২] 'ঔড়ুলোমি (বলেন), সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত জীবের ঈদৃশ ভাব (ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা) হয় বলিয়া (শ্রুতি ঐপ্রকার বলিয়াছেন)'। সংসারাবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও মুক্তাবস্থায় অভেদ প্রাপ্ত হন, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হন। আচার্য্য ঔড়ুলোমি বলেন, এই ভাবী অভেদ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাচক 'আত্মা' শব্দ সংসারাবস্থাস্থিত জীবের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। মুক্তির পূর্ব্বে জীবের ব্রহ্মভিন্নতা স্বাভাবিকও হইতে পারে, ঔপাধিকও হইতে পারে। জীব ও ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদ বুঝাইতে শঙ্কর এবং ভাস্কর অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যাহা হউক, ভেদ ঔপাধিক কিম্বা স্বাভাবিক হউক, মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন হন। উভয় পক্ষেই শ্রুতির দৃষ্টান্ত আছে। যথা, ঔপাধিক ভেদপক্ষে, "ঠিক এইপ্রকার, এই সম্প্রসাদ (মুক্তজীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (অর্থাৎ দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করিয়া) পরজ্যোতি সম্পন্ন হইয়া স্বস্বরূপেই অভিনিষ্পন্ন হন।[৩] স্বাভাবিকভেদপক্ষে, "যেমন প্রবহমান নদী স্বীয় নামরূপ ত্যাগ করতঃ সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানী-জীবও নিজ নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে উপগত হন—মুণ্ডক, উ, ৩।২।৮। মনে হয় যে শঙ্কর ও বাচস্পতি মিশ্রের মতে ঔড়ুলোমি মুক্তির পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদপক্ষ এবং মুক্তিতে উভয়ের অভেদ স্বীকার করিতেন, "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমি ঃ"।[৪] 'এই সূত্রে বাদরায়ণ মুক্তের স্বরূপ সম্বন্ধে ঔড়ুলোমির মত উল্লেখ করিয়াছেন। 'ঔড়ুলোমি (আচার্য্য বলেন, মুক্তজীব) শুদ্ধচৈতন্য মাত্র স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। যেহেতু তাহাই

১। "দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ"—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১২

২। ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২১

৩। ছান্দোগ্য. উ, ৮।১২।৩

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৬

জীবের স্বরূপ'। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিম্ন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, 'সৈন্ধবলবণখণ্ড যেমন সর্ব্বত্রই লবণরসময়, তাহার ভিতর ও বাহিরে কোন ভেদ নাই, অরে মৈত্রেয়ি! ঠিক তেমনই এই আত্মা পূর্ণ প্রজ্ঞানঘনই (চৈতন্যস্বরূপই), তাঁহার অন্তরে বাহিরে কোন প্রকার ভেদ নাই।[১] প্রসিদ্ধ ভূতবর্গের (সহিত সংযোগ নাশের) সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিনাশ পায়'। (কার্য্যকারণসংঘাতাত্মক) দেহত্যাগের পর (অর্থাৎ মোক্ষে) আত্মার আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান) থাকে না।[২] ইহা হইতে আচার্য্য ঔড়ুলোমি মনে করেন, শুদ্ধচৈতন্যমাত্রই মুক্তজীবের স্বরূপ। কোন প্রকার গুণ বা ঐশ্বর্য্যসম্পর্ক তাহাতে থাকে না। আমরা অব্যবহিত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্রোক্ত "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫) সূত্রে দৃষ্ট হয় যে, জৈমিনি মুনি মুক্তজীবের উপন্যাসাদি শাস্ত্রাবগত ব্রাহ্ম-ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয়না মনে করেন। আচার্য্য বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন, মুক্ত আত্মা পরমার্থতঃ নির্দ্ধর্ম্মক, শুদ্ধ এবং অখণ্ড চৈতন্যমাত্র স্বরূপ হইলেও তাহাতে ব্যবহারতঃ ব্রাহ্মগুণৈশ্বর্য্য সদ্‌ভাবের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। সুতরাং উক্ত মতদ্বয়ের বিরোধ নাই।[৩] তাহাই আচার্য্য বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য শঙ্করের মতে মুক্তি।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, মোক্ষে জীব আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন।[৪] স্বরূপ প্রাপ্তি হয় বলাতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে মোক্ষে অপূর্ব্ব বা আগন্তুক কোন ধর্ম্মান্তর লাভ হয়।[৫] যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। স্বরূপের বিপর্য্যয় হইলে বস্তুর ধ্বংস হয়। একথা অবিসংবাদী সত্য। জীবের স্বরূপ জীবে নিত্য বর্ত্তমান। সংসারদশায় তাহা অজ্ঞানহেতু তিরোহিত বলিয়া অনুভব হয় মাত্র। মোক্ষে ঐ অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হওয়াতে উহা আবির্ভূত হয় বলিয়া মনে হয়।[৬] কিন্তু পরমার্থতঃ এই

১। বৃহদারণ্যক্, উ, ৪।৫।১৩ ২। বৃহ, উ, ৪।৫।১৩ ও ২।৪।১২

৩। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪.৮

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ ও ৪।৪।২য় শঙ্করভাষ্য।

৫। "Emancipation is not to be regarded as a becoming something which previously had no existence", Deussen : The Philosophy of the Upanishads, p. 344. See also Gaudapāda, 4/98.

৬। "The attainment or realisation of the Absolute (Brahman) is like the getting of the forgotten necklace worn on one's own neck". N. K. Brahman : Philosophy of Hindu Sādhanā, p. 179.

তিরোভাব ও আবির্ভাব উভয়ই ভ্রান্তি। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'ঠিক এইপ্রকার এই সম্প্রসাদ (মুক্তজীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (অর্থাৎ দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করিয়া) পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া স্বস্বরূপেই অভিনিষ্পন্ন হন'।[১] এই অবস্থাই জীবের মুক্তি বলিয়া কথিত হয়।[২] জীব পূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে বদ্ধ মনে করিত। তাহার ফলে সংসারতাপে দগ্ধ হইয়া নানা দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিত। স্বরূপোপলব্ধি হইলে জীব সর্ব্বদুঃখের অতীত হন, পূর্ব্ববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। শ্রৌতপ্রতিজ্ঞা পর্য্যালোচনা করিলে ঐ অর্থ ই সহজে প্রতীত হয়। শ্রুতিতে কথিত আছে, প্রজাপতি প্রতিবারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমি পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মার উপদেশ করিব"।[৩] অতঃপর তিনি আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়গত দোষ হইতে মুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, সশরীর (অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানসম্পন্ন) আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত। সশরীরের প্রিয়াপ্রিয়বোধের বিনাশ হয় না। কিন্তু অশরীর (অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানরহিত) হইলে আত্মাকে কখনও প্রিয় বা অপ্রিয় স্পর্শ করে না—ছান্দোগ্য, উ, ৮।১২।১। অতঃপর উপসংহারে তিনি বলিলেন যে অশরীর আত্মা "পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া স্বস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন"—ছান্দোগ্য, উ, ৮।১২।২ ও ৮।১২।৩। তিনি উত্তম পুরুষ। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পূর্ব্ববন্ধনবোধের নিবৃত্তি মাত্র হইলেই মোক্ষ হয়। তাহাতে অপূর্ব্ব কিছু লাভের অপেক্ষা নাই। বন্ধন কাটিয়া গেলেই স্বরূপবোধ আবির্ভূত হয়। 'স্বরূপপ্রাপ্ত জীব পরব্রহ্মের সহিত অবিভাগ হন'।[৪] 'অবিভাগ' শব্দে সাধারণতঃ 'বিভাগবিহীন' বা 'অভেদ' বুঝায়। এই সাধারণ অর্থ হইতে আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন যে মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মে আত্যন্তিক একীভাব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভেদনির্দ্দেশক কিছুই থাকে না)—দ্রষ্টব্য কঠ, উ, ২।১।১৫ ; মুণ্ডক, উ, ৩।২।৮ ; এবং প্রশ্ন, উ, ৬।৫ র শঙ্করভাষ্য। তিনি বলেন, ইহাই আচার্য্য বাদরায়ণেরও অভিমত। "অবিভাগো-বচনাৎ"।[৫] 'শ্রুতিবাক্য হইতে (জানা যায়, প্রাণাদি পরব্রহ্মে) অবিভাগে (লয় হয়)।' শঙ্কর বলেন, 'অবিভাগ' অর্থ এখানে নিরবশেষ'। শ্রুতির মতে,

---

১। ছান্দোগ্য, উ, ৮ ১২।৩ র শঙ্করভাষ্য।

২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২র শঙ্করভাষ্য। ৩। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৭-১৩ খণ্ডে প্রজাপতির আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪ র শঙ্করভাষ্য, ৫। ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

সুষুপ্তি এবং প্রলয়েও জীব ব্রহ্মে লয় হয়। বাদরায়ণও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহা সাবশেষ বা শক্ত্যবশেষ লয়। সে কারণে উহা হইতে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্যই তিনি বলিয়াছেন, মোক্ষে অবিভাগ বা নিরবশেষ লয় হয়।[১] শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তাহাদের নামরূপ বিনষ্ট হয়, (তখন) তিনি পরমপুরুষ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। তিনি অকল ও অমৃত হন"—প্রশ্ন, উ, ৬।৫ র শঙ্করভাষ্য; ব্রহ্মসূত্র ৪।২।১৬ র শঙ্করভাষ্য।' কলা (ভাগ) অবিদ্যাজনিত। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার ফলে যে লয় তাহা সাবশেষ হইতে পারে না। উহা নিরবশেষই হইবে। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত অবিভাগ। ভাস্করের ব্যাখ্যাও তদ্রূপ। লবণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি আপন বক্তব্য পরিষ্কার করিয়াছেন। লবণের টুক্‌রা যেমন সমুদ্রে পড়িয়া গলিয়া যায়, সমুদ্রে সম্যক্‌রূপে মিশিয়া যায়, মুক্তজীবও তেমন পরব্রহ্মে বিলীন হন, তাঁহাদের "স্বরূপাব্যতিরেকীভাব" হয়।[২] নিম্বার্কও সেই শ্রুতিবাক্য অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'অবিভাগ' অর্থ 'তাদাত্ম্য'। অপরপক্ষে শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজ মনে করেন যে অবিভাগ[৩] শব্দ এখানে মুক্তজীবের নিরবশেষ ব্রহ্মলয় নির্দ্দেশ করে না। অবিভাগ অপৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ পৃথগ্‌-ব্যবহারানর্হসংসর্গ।* (দ্রষ্টব্য শ্রীভাষ্য ৪।২।১৫)। রামানুজাচার্য্য মনে করেন যে জীবের মুক্তি কালীন ব্রহ্মসম্পত্তি পৃথগ্‌-ব্যবহারানর্হসংসর্গ মাত্র এবং সুষুপ্তি ও প্রলয় কালীন ব্রহ্মসম্পত্তি পৃথগ্‌-ব্যবহারার্হসংসর্গ মাত্র। মুক্তি ও সুপ্তি প্রলয়ে উভয়ত্রই জীব ব্রহ্মসম্পন্ন হন। অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বিশেষ লাভ করেন। সুপ্তপ্রলীন ও মুক্ত উভয়েরই ব্রহ্মসম্পত্তিতে স্বীয় ব্যক্তিত্ব থাকে। কিন্তু সুপ্তপ্রলীনের ব্যক্তিত্বের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী; মুক্তের ব্যক্তিত্বের পুনরুত্থান হয় না। এই পুনরুত্থান বা পুনরুদ্ভবই জীব ও ব্রহ্মের পৃথগ্‌ব্যবহার। সুপ্তি প্রলয়ান্তে জাগরণ ও পুনঃ সৃষ্টি দেখিয়া অনুমান করা হয় যে সুপ্তপ্রলীন জীবের যে ব্রহ্মসম্পত্তি উহাতে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে ও ব্রহ্মের সহিত কেবল পৃথগ্‌-ব্যবহারার্হসংসর্গ লাভ হয় মাত্র। কিন্তু মুক্তজীবের যে ব্রহ্মসম্পত্তি উহাতেও জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে, অথচ

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬ র শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬ র ভাস্কর ভাষ্য।

৩। শ্রীকণ্ঠের টীকাকার অপ্পয় দীক্ষিত লিখিয়াছেন, "সুপ্তিপ্রলয়য়োরিব ব্যাপারোপরমেণ সূক্ষ্মরূপতয়াবস্থানমবিভাগঃ।"

* পৃথক্ ব্যবহারের অযোগ্য সংসর্গ।

পৃথগ্ ব্যবহারার্ণর্হসংসর্গবিশেষ লাভ হয় মাত্র একথা রামানুচার্য্য কি হেতুতে অনুমান করেন তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া দেখাইতে না পারিলে তাঁহার অবিভাগ শব্দের উক্তানুরূপ ব্যাখ্যা কি করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ?[১] জীব ও ব্রহ্মের বিভাগ কারক অবিদ্যাসংস্কারাদি মোক্ষদশায় বস্তুতঃ থাকে না বলিয়া উভয়ের সম্যক্ একত্বভাবাপত্তিই স্বীকার করিতে হয়। শঙ্কর বলেন, "তত্ত্বমসি"—ছান্দোগ্য, উ, ৬।৮।৭ ; "অহং ব্রহ্মাস্মি"—বৃহ, উ, ১।৪।১০ প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সমূহও ঐ সিদ্ধান্তের পোষণ করেন। এইরূপে আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন যে, মুক্তজীব ও পরব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন। মুক্তাবস্থা অন্য কিছুই নহে, ব্রহ্মই মুক্তাবস্থা।[২] তিনি বলেন এই অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই ভগবান ব্যাসেরও অভিপ্রেত। 'যখন তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্ হিরণ্যবর্ণ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর-পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পুণ্যপাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইয়া পরমসাম্য প্রাপ্ত হন' —"পরমং সাম্যমুপৈতি"[৩]—এই শ্রুতি সুস্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য পরম বা নিরতিশয়। আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন, 'পরমসাম্য' ও 'অদ্বয়' অভিন্নার্থক। দ্বৈত হইলে সাম্য আংশিক বা অপকৃষ্ট হয়। উহাকে পরমসাম্য বলা যায় না।[৪] অদ্বৈত বা একত্ব বিবক্ষিত না হইলে শ্রুতির 'পরম' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনার কোন স্থান নাই। কারণ, মুণ্ডক শ্রুতির যে বাক্যে 'পরমসাম্য' শব্দ আছে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইবাক্যে 'একত্ব' বিবক্ষায় 'সমান' শব্দের দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে।[৫] আবার উহার অনতিব্যবহিত পরে শ্রুতি সাক্ষাদ্ভাবে বলিয়াছেন, মোক্ষে "আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি"।[৬] অর্থাৎ 'আত্মা' ফলদানে অপ্রবৃত্ত সমস্ত কর্ম্মসহ অব্যয় পরব্রহ্মে একত্বভাব প্রাপ্ত হন'। তদনন্তর শ্রুতি সমুদ্রগামী নদীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন—মুণ্ডক ৩।২।৮। ঐ দৃষ্টান্তের মর্ম্ম সম্বন্ধে একাধিক মত থাকিতেই পারে না। 'প্রশ্ন'শ্রুতিও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, 'নদী তখন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রই

১। রামানুজের মতে ব্রহ্ম সম্পত্তি ব্রহ্মসংযোগ মাত্র কিন্তু তদ্ভাবাপত্তি নহে।

২। "ব্রহ্মৈবহিমুক্তাবস্থা", ব্রহ্মসূত্র, ৩.৪।৫২র শঙ্করভাষ্য

৩। মুণ্ডক, ৩।১।৩

৪। মুণ্ডক, ৩।১।৩র শঙ্করভাষ্য

৫। মুণ্ডক, ৩।১।১,২ (আর দ্রষ্টব্য শ্বেতাশ্বতর, উ, ৪।৬,৭)।

৬। ঐ , ৩।২।৭

হইয়া যায়। মোক্ষে জীবও তদ্রূপ পরব্রহ্মই হন'—প্রশ্ন, উ, ৬।৫। এইরূপে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইল যে 'একত্ব' বিবক্ষায় মুণ্ডক শ্রুতি 'পরমসাম্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।[১] বেদান্তদর্শনের এক সূত্রে 'বিভাগ' শব্দের ব্যবহার আছে—"বিভাগঃ শতবৎ"।[২] উহার অর্থ 'অংশচ্ছেদ করণ'। অবিভাগ তাহারই বিপরীত। সুতরাং উহাকে অংশাংশীভাববোধক বলা যাইতে পারে না। বিজাতীয়, সজাতীয় এবং স্বগত যত প্রকারের বিভাগ বা ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে, 'অবিভাগ' শব্দ প্রয়োগে তাহাদের সকলগুলিরই সম্ভাব সম্ভাবনা প্রতিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১) শ্রুতিতে "একমেব" শব্দদ্বয়ে সজাতীয় স্বগত-ভেদশূন্যতা ও অদ্বিতীয় শব্দে বিজাতীয় ভেদরাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে (ঐ, ৬।২।১, শঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরি টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই আচার্য্য শঙ্করের মতে মুক্তজীব ব্রহ্মই। ব্রহ্মভাব ও মোক্ষ তুল্য কথা।[৩] ব্রহ্ম অনেক নহে, তিনি এক। অতএব মুক্তিও এক।[৪] "অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে"।[৫] 'মুক্তপুরুষ পরমাত্মার সহিত অবিভাগে অবস্থান করেন', অর্থাৎ পরমাত্মাই মুক্তজীবের স্বরূপ। আচার্য্য শঙ্করের মতে আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে মুক্তজীব পরমার্থতঃ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ,—"পারমার্থিক চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ"। তথাপি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ("ব্যবহারাপেক্ষা") ঐশ্বর্য্যবান্। নিষ্পাপত্বাদি, বস্তুর স্বরূপগত ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রকারবিশেষ নহে। তাহাতে পাপাদি নাই, কেবল এইমাত্র সে সকলের অভিধেয়। সত্যকামত্বাদি যদিও বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্মরূপে কথিত হইয়াছে, তথাপি ঐগুলি ঔপাধিক বলিয়া চৈতন্যের ন্যায় ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে।[৬] "ইদন্তু পারমার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ববিক্রিয়া রহিতং নিত্যতৃপ্তং নিরবয়বং স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাবং যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সহ কার্য্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপাবর্ত্ততে তদশরীরং মোক্ষাখ্যম্"।[৭] "যাহা পরমার্থিক সত্য, কূটস্থ, নিত্য, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত, নিত্যতৃপ্ত নিরবয়ব এবং স্বয়ংজ্যোতিঃ

১। নিরুক্তকার যাস্কমুনি লিখিয়াছেন, "সমিত্যেকীভাবে"।
২। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।১১
৩। "ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ", ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৪র শঙ্করভাষ্য
৪। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২ র শঙ্করভাষ্য
৫। ,, ৪।৪।৪ র ,,
৬। ,, ৪।৪।৬ র ,,
৭। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৪র শঙ্করভাষ্য।

স্বরূপ (স্বপ্রকাশস্বরূপ), যাহাতে স্বকার্য্যসহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের এবং কালত্রয়ের স্থান নাই (অর্থাৎ যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত ও কালত্রয়াতীত) তাহাই অশরীরত্ব নামক মোক্ষ"। এই অশরীরত্বের বোধ জীবিতাবস্থায় কাহারও কাহারও হয়, তাই শঙ্করের মতে জীবন্মুক্তি স্বীকার্য্য।[১] তিনি সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন।[২] আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে ভগবান বাদরায়ণও বেদান্তদর্শনে সদ্যোমুক্তিবাদ স্বীকার করেন নাই একথা বলা যায় না। তিনি মনে করেন যে তিনি (বাদরায়ণ) প্রকৃতই উহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠোক্ত জনৈক প্রাচীন অজ্ঞাতনামা বেদান্তাচার্য্যের মতও তদ্রূপ। কিন্তু আচার্য্য রামানুজাদি সদ্যোমুক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রতীকোপাসক ব্যতীত অপর সকল ব্রহ্মোপাসক দেহপাতের পর দেবযান মার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মে উপনীত হন। সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মবাদী। সুতরাং সদ্যোমুক্তি তাঁহাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। শ্রীকণ্ঠ সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ও ক্রমমুক্তিবাদী হইয়াও তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে ব্যাস সদ্যোমুক্তিও স্বীকার করিতেন। বিশেষ প্রণিধান করিলে আরও দেখা যায় যে, যখনই দেবযান গতির প্রসঙ্গ আসিয়াছে, তখনই শ্রীকণ্ঠ উল্লেখ করিয়াছেন যে নিরন্বয়োপাসকের* দেবযান গতি হয় না। তাহাতে মনে হয় তিনি বাহিরে ক্রমমুক্তিবাদ প্রচার করিলেও অন্তরে অন্তরে সদ্যোমুক্তিবাদেও আস্থাবান ছিলেন। স্বকৃত 'আনন্দলহরী' এবং 'শিবাদ্বৈত-নির্ণয়' গ্রন্থে আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিতও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদের প্রচারক হইলেও স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে তিনি যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন তন্মধ্যে আমাদের অনুমিত পূর্ব্বোক্ত যুক্তিটিও স্থান পাইয়াছে।[৩]

কর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারা সালোক্যাদি লাভ হয়। কর্ম্মের তারতম্যহেতু উপাসকের ফলেরও তারতম্য বা ভেদ হয়। কিন্তু ব্রহ্মৈকত্ব মুক্তিতে উৎকর্ষাপ-কর্ষরূপ আতিশয্য সম্ভব নহে।[৪] মোক্ষাবস্থায় দর্শনাদিব্যবহারের অভাব

১। জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে শঙ্করের মত জানার জন্য আমাদের এই গ্রন্থের 'জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। আমাদের এই গ্রন্থের 'সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

*নির্গুন উপাসকের

৩। দ্রষ্টব্য শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রীকৃত 'The Sivādvaita of Srikantha pp 279-290.

৪। "নতু মুক্তৌ কশ্চিদতিশয়সম্ভবোঽস্তি," ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২, শঙ্করভাষ্য

হয়।[১] একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। সে অবস্থায় কে কি করিয়া কাহাকে দেখে, কে কি দিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করে ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। (বৃহ, উ, ৪।৫।১৫)। অতএব মোক্ষ ব্যবহাররহিতাবস্থাই। মুক্ত সর্ব্বৈকত্ব দর্শন করেন বলিয়া দ্বিতীয় কিছু দেখেন না।[২] মুক্তাবস্থায় বিশেষবিজ্ঞান (জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়জ্ঞান) লুপ্ত হইলেও বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মা নষ্ট হয় না। মুক্তাবস্থায় বিজ্ঞানঘনাত্মা বিদ্যমান থাকে।[৩] আচার্য্য শঙ্কর বলেন মোক্ষাবস্থায় শুধু উপাধির বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না।[৪] পরমেশ্বরই জীবের যথার্থস্বরূপ, জীবভাব উপাধিকৃত, (ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৮, শঙ্করভাষ্য)। রজ্জু তত্ত্বজ্ঞান হইলে যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পভাব দূর হইয়া যায়, এবং অকল্পিত রজ্জুরূপ প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে আরোপিত জীবভাব দূর হইয়া যায় এবং অকল্পিত চিদ্রূপের অভেদোপলব্ধি হয়। (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।১৯র শঙ্করভাষ্য)।

আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির মতে মুক্তি জন্যবস্তু। কারণ উহা সাধনলব্ধ। শঙ্কর বলেন জন্যবস্তু বিনাশশীল। ইহাতে মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়ে। আচার্য্য শঙ্করের মতে মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। উহা ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয় না। মিথ্যাজ্ঞানের নাশে যে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই মুক্তি। মোক্ষ আর ব্রহ্ম একই কথা। ব্রহ্মই মোক্ষ বা মোক্ষই ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞানই মুক্তি। জীব সর্ব্বাবস্থায়ই মুক্ত। আচার্য্য রামানুজের মতে জীব মুক্তাবস্থায়ও ব্রহ্ম হয় না, ব্রহ্মসম হয়। তাঁহার মতে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই মুক্তি। শঙ্কর ইহাকে আপেক্ষিক মুক্তি বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সম্বন্ধে শঙ্করের বিরোধী। শঙ্কর বলেন গুণ থাকিলেই অজ্ঞান আছে। তাই সগুণ উপাসকদের নিত্য নিরতিশয় মুক্তি লাভ হইতে পারে না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে মুক্ত জীবেরও ভগবানের সেবারূপ ক্রিয়া আছে। শঙ্কর বলেন ক্রিয়া থাকিলেই গমনাগমন আছে, তাই সগুণ উপাসকদের তাঁহার মতে গমনাগমন করিতে হয়। গমনাগমন করিতে হয় বলিয়া দুঃখভোগও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

১। "দর্শনাদিব্যবহারাভাব" ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।৯র শঙ্করভাষ্য।

২। "মুক্তস্যাপি সর্ব্বৈকত্বাৎ সমানো দ্বিতীয়াভাবঃ," ছান্দোগ্য উ, ৮।১২।৩র শঙ্করভাষ্য।

৩। ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২২র শঙ্করভাষ্য।

৪। "উপাধিপ্রলয়ং এবায়ং নাত্মপ্রলয়ং" ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪ শঙ্করভাষ্য।

বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ভেদাভেদবাদকেও অদ্বৈতবাদিগণ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী। একই বস্তুতে একই কালে ভেদ ও অভেদ এই পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার সমাবেশ হইতে পারে না। যদি ভেদকে মানা হয় তবে অভেদকে ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি অভেদ মানা হয় তবে ভেদকে ত্যাগ করিতে হইবে। এইজন্য কোন কোন বৈদান্তিক ভেদ ও অভেদের সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মোক্ষ অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায় বলিয়া অভেদ সত্য, আর সংসার দশায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ আছে বলিয়া ভেদও সত্য। শঙ্করের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত অসংগত বলিয়া মনে হয়। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থার কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'অসি' এই অস্ত্যর্থ 'অস্' ধাতুর প্রয়োগ দ্বারা অভেদের কথাই বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' (৭।২৪।১) একত্বদর্শনকে ভূমা ও অমৃত বলা হইয়াছে, আর নানাত্বদর্শনকে অল্প ও মর্ত্ত্য (মরণশীল) বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রতীত হয় যে ভেদজ্ঞান অসত্য এবং অভেদজ্ঞানই সত্য। অদ্বৈত বেদান্তিগণের মতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ ও নিত্যমুক্ত। মুক্তি সাধ্য নহে। উহা জীবের নিত্য সিদ্ধাবস্থা। কেবল অজ্ঞানবশতঃ জীব নিজকে বদ্ধ ও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলেই জীবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়।[১] এই মতে জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। তাই অদ্বৈতমতে অভেদ জ্ঞানই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

রামানুজ মতে মুক্তি

রামানুজাচার্য্য যামুনাচার্য্যের প্রশিষ্য। তাই রামানুজ যে যামুনের মতের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং রামানুজ মতের মুক্তি সম্বন্ধে বলিতে হইলে যামুনের মত উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। আচার্য্য যামুন বলেন, মুক্ত পুরুষের অহন্তা থাকে। সুতরাং উহার ব্যক্তিত্বও থাকে।[২] তিনি বলেন মুক্তিতে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না, কিম্বা উহার অভাব হয় মনে করিলে মোক্ষের অপুরুষার্থতা সিদ্ধ হয়। কেননা, চিদ্‌ধাতুদ্বয়ের অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার এই চিদ্‌বস্তুদ্বয়ের একটি অর্থাৎ পরমাত্মামাত্র শেষ থাকিলে মোক্ষরূপ ফল কাহার হইবে? জীবাত্মার ও পরমাত্মার

১। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১৯র শঙ্করভাষ্য।
২। সিদ্ধিত্রয় (সম্বিৎসিদ্ধি) পৃঃ ৮৭

তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নিত্যবর্ত্তমান। অবশ্য রামানুজ "তাদাত্ম্য" বলিতে জীব জগতের তদাত্মক ভাব (ব্রহ্মরূপতা) কেই বুঝেন, কিন্তু ব্যাপ্য জীবজগত ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে বলিয়াই বুঝেন। জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের এই তাদাত্ম্য বা অভেদের নির্দ্দেশকে তিনি, 'চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা' এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই বলিয়া মনে করেন। (শ্রীভাষ্য ১।১।১)। নিত্য বলিয়া ঐ সম্বন্ধের বিনাশ কখনও হয় না। সুতরাং মুক্তিতেও উহা থাকে। "ব্রহ্মানন্দহ্রদান্তস্থো মুক্তাত্মা সুখমেধতে"। 'মুক্তাত্মা ব্রহ্মানন্দরূপ হ্রদের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সুখলাভ করেন'। অদ্বৈতবাদিগণ মুক্ত পুরুষেরও অহন্তা থাকে তাহা মানেন না। তাঁহারা বলেন, অহন্তা অবিদ্যাত্মিকা। অবিদ্যার নাশ হইলেই মুক্তি হয়। সুতরাং মুক্তিতে অহমর্থ থাকে না। যামুন বলেন, "অহমিত্যেব হি তস্য স্বরূপং"[১] অর্থাৎ অহমর্থ প্রত্যগাত্মার স্বরূপ, সেইহেতু মুক্তিতেও উহার অনুবৃত্তি থাকিবে, অর্থাৎ মুক্ত জীবেরও অহংবোধ থাকিবে।

রামানুজ বলিতেছেন,[২] প্রত্যগাত্মা অহমর্থ এবং জ্ঞাতা। অহমর্থ-আত্মার স্বরূপ, আর জ্ঞান উহার ধর্ম্ম। উহা জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞপ্তিমাত্র নহে, জ্ঞাতাই। মোক্ষদশায়ও অহমর্থের অনুবৃত্তি থাকে। কেননা স্বরূপের নাশ হইতে পারে না। মোক্ষে অহং প্রত্যয়ের নাশ হয় মানিলে, আত্মনাশই অপবর্গ বলিয়া প্রকারান্তরে প্রতিজ্ঞাত হইয়া পড়ে। ঐ প্রকার মোক্ষের জন্য কে যত্ন করিত ? বরং মোক্ষের প্রস্তাব শুনিয়া লোক ভয়ে দূরে পলায়ন করিত। ততোধিক, মুক্তের যে অহং প্রত্যয় থাকে শ্রুতিতে ও তদনুসারী স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মাত্মভাবের অপরোক্ষানুভূতি হেতু যাহাদের অবিদ্যা নিরবশেষে নির্ধৌত হইয়া গিয়াছিল সেই বামদেবাদিরও 'অহং বলিয়া আত্মানুভব শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় *। যিনি সম্যক্ প্রকারে অজ্ঞানবিরহিত সেই পরব্রহ্মই এই 'অহং' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ"[৩] ইত্যাদি। গীতায় (৫।১৮, ১০।২০, ৭।৬, ১০।৮, ১৪।৪) কৃষ্ণ বহুবার অহং শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

১। সিদ্ধিত্রয়, (আত্ম), পৃঃ ৩০

২। শ্রীভাষ্য, ১।১।১ ; ২.৩।১৯ ৩। ছান্দোগ্য, উ, ৬।৩।২

* অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং" ইত্যাদি শ্রুতি। বৃহ, উ, ৩।৪।১০

এখানে আমরা দেখিতে পাই আচার্য্য রামানুজ মোক্ষেও অহমর্থের (অহংপদার্থের) অনুবৃত্তি থাকে বলিয়া বলিতেছেন এবং যাঁহারা মোক্ষে অহমর্থের অনুবৃত্তি থাকে না বলিয়া বলেন তাঁহারা প্রকারান্তরে আত্মনাশই স্বীকার করিতেছেন বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। এখন বিচার্য্য এই তিনি যে অহমর্থের অনুবৃত্তির কথা বলেন এবং অদ্বৈতবাদীরা যে অহমর্থের নাশের কথা বলেন; এই উভয় অহমর্থে উভয়ে একই পদার্থকে বা তত্ত্বকে বুঝিয়াছেন কিনা? উভয় দর্শনের আলোচনায় ইহা প্রতীত হয় যে উভয়ের মতে অহমর্থে একই তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করমতে অহংপদার্থ পরমার্থতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারতঃ 'আমি সুখী আমি দুঃখী, আমি মূর্খ আমি বিদ্বান্' ইত্যাদি জ্ঞান বিশিষ্ট অহং পদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে; ইহা বুদ্ধ্যহংকারাধ্যাসযুক্ত আত্মা। আচার্য্য শঙ্কর মোক্ষদশায় যে অহং পদার্থের নাশ স্বীকার করিয়াছেন উহা এই বুদ্ধ্যহংকারাধ্যাসযুক্ত আত্মা। তিনি শুদ্ধ অহং পদার্থের নাশ স্বীকার করেন নাই। আচার্য্য রামানুজ আচার্য্য শঙ্করের উক্তানুরূপ শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিলে ঐরূপ কটাক্ষ করিতে পারিতেন না মনে হয়।

আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক রহিত এবং ক্ষুধা পিপাসা শূন্য, তথা সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। সংসার দশায় কর্ম্মাখ্য অবিদ্যাদ্বারা ঐ স্বরূপ তিরোহিত থাকে, আর পরে মুক্ত দশায় পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে সেই স্বরূপ পুনঃ আবির্ভূত হয়। জ্ঞানানন্দাদি অপর অপর স্বাভাবিক গুণসমূহ যেগুলি পূর্ব্বে কর্ম্মদ্বারা সঙ্কুচিত ছিল, সেইগুলিও তখন বিকশিত হয়।[১] তখন মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ হন।[২] শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সর্ব্বং পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদি।[৩] "আত্মদর্শী সর্ব্ববস্তুকে আত্মস্বরূপেই দর্শন করেন এবং সেইহেতু সর্ব্ববস্তু সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন। সর্ব্বজ্ঞত্ব সত্যকামত্বাদি বিষয়ে মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের সাম্য লাভ করিলেও তাঁহারা তাঁহার জগদ্ব্যাপার নিয়মনশক্তি লাভ করিতে পারেন না। মুক্ত পুরুষও পরমেশ্বরের নিয়াম্য থাকেন, পরমেশ্বর নিত্য সর্ব্বনিয়ন্তা"।[৪]

মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মের মধ্যে নিয়াম্য নিয়ামক ভাব থাকে বলাতে সিদ্ধ হয় যে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে, অভেদ বা ঐক্য হয় না। রামানুজ বলেন, 'সাধনবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্তির পরও জীবের পরব্রহ্মের

১। শ্রীভাষ্য, ৪।৪।৩ ২। শ্রীভাষ্য, ৪।৪।১৬
৩। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৬।২ ৪। শ্রীভাষ্য, ৪।৪।২০

স্বরূপৈক্য লাভ সম্ভব নহে। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না। যেমন, উক্ত হইয়াছে যে কেহ কেহ মনে করেন যে "পরমাত্মা এবং জীবাত্মার যোগ (বা একত্বই) পরমার্থ। উহা মিথ্যা। কেননা, এক দ্রব্য কখনও অন্য দ্রব্য হইতে পারে না"।[১] মুক্তের তদ্ধর্ম্মতা (বা ভগবদ্ধর্ম্মতা) লাভ হয়। 'ভগবদ্গীতা'য়ও তাহাই উক্ত হইয়াছে। 'এই জ্ঞানকে আশ্রয় করতঃ আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রলয়ে ব্যথিত হন না এবং সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না', (গীতা, ১৪।২১) ইত্যাদি।[২] শ্রুতিতে আছে, "যেমন নদীসমূহ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হয় এবং নাম ও রূপ পরিত্যাগ করতঃ অস্তগমন করে, তেমন বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য-পুরুষে গমন করেন"।[৩] "তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন"।[৪] তাহা হইতে রামানুজ মনে করেন যে মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত "পরমসাম্য" লাভ করেন।[৫] মুক্তের স্বরূপ "ব্রহ্মের ভাব বা স্বভাব (সাদৃশ্য) স্বরূপৈক্য নহে"—শ্রীভাষ্য ১।১·১। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানৈকাকার। আচার্য্য রামানুজ ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞপ্তিমাত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। তবে তিনি মনে করেন যে ব্রহ্ম জ্ঞানবৎ স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানৈকগম্য বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং মুক্তও জ্ঞানৈকাকার। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই চিদ্‌বস্তু, অতএব চিদংশে উভয়ের সাম্য আছে। এই সমতাকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য রামানুজ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ মানেন; কিন্তু তিনি জীব এবং ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করেন না। জ্ঞানরূপভাবে মুক্ত ও পরব্রহ্ম এক প্রকার, সুতরাং ভেদরহিত। পরন্তু বদ্ধাবস্থায় জীব দেবাদিরূপ*। সুতরাং তখন পরমাত্মার ও উহার ভেদ আছে। জীবের দেবাদিরূপ কর্ম্মরূপ অজ্ঞান-মূলক, স্বরূপতঃ নহে। পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা মূলভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে দেবাদিভেদ হেতুর অভাবে নির্ব্বাপিত হয়। তখন জীব পরমাত্মার সহিত (জ্ঞানাংশে) অভেদ হয়।[৬] রামানুজ মনে করেন যে শ্রুতি

১। বিষ্ণুপু, ২।২৪।২৭ (প্রকরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বিষ্ণুপুরাণের এই বচনের অভিপ্রায় রামানুজ যেমন বলিয়াছেন তাহা নহে, উহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ অভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বরং মনে হয়)।

২। শ্রীভাষ্য, ১।১।১ ৩। মুণ্ডক, উ, ৩।২।৮ ৪। মুণ্ডক, উ, ৩।১।৩

৫। শ্রীভাষ্য, ১।১।১ ৬। শ্রীভাষ্য, ১।১।১

*দেব, মনুষ্য, পশু ইত্যাদি।

চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপভেদ ও স্বভাবভেদ প্রতিপাদন করেন। উহাদের সম্বন্ধও শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। চিৎ জীব ভোক্তা, অচিৎ জগৎ ভোগ্য এবং পরব্রহ্ম উভয়ের ঈশিতা এই "স্বরূপবিবেক" কোন কোন শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। অপর শ্রুতিতে আছে যে, চিদচিদবস্তু সমূহ সর্ব্বাবস্থায় (কি কারণাবস্থায় কি কার্য্যাবস্থায়) ব্রহ্মের শরীর; সেই হেতু তাঁহার নিয়াম্য এবং তাহা হইতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত।[১] চিদচিদাত্মক সর্ব্ববস্তু শরীর, আর ব্রহ্ম আত্মা। ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই চিদচিদ্ সর্ব্ববস্তু তাঁহার "প্রকার" (ধর্ম্ম), এবং আত্মা তিনি "প্রকারী" (ধর্ম্মী)।[২] "ব্রহ্মের এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত চিদ-চিদ্‌বস্তু সমূহের আত্ম-শরীর-ভাবই তাদাত্ম্য" বলিয়া কথিত হয়।[৩] "অতএব চিদচিদাত্মক সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্মতাদাত্ম্য শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই বলিয়া জানা যায়।"[৪] দেহ ও আত্মার স্বরূপৈক্য যেমন সম্ভব নহে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্যও তেমন সম্ভব নহে। জীব ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাব স্বাভাবিক বলিয়া কখনও উহার নাশ হইতে পারে না। যেহেতু জীব সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মের শরীর, সেই হেতু মুক্তিতেও ব্রহ্মের সহিত উহার স্বরূপৈক্য হইতে পারে না। জীব ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্রহ্ম হন না, তাঁহার জীবভাব (নিয়াম্যভাব) চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে। (শ্রীভাষ্য, ৪।৪।১৮)। সুতরাং ভোগ মাত্রে ব্রহ্মসাম্য থাকিলেও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন প্রভৃতি ব্যাপারে জীবের কখনও কোনই অধিকার নাই। (ঐ, ৪।৪।১৭)। এই বিষয়ে রামানুজ সম্প্রদায়ের বড়গলই ও টেঙ্গলই শাখায় কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। বড়গলইগণ বলেন যে, মুক্তজীবেরও সৃষ্টিসামর্থ্য নাই। টেঙ্গলইগণ এই প্রকার শক্তিসংকোচ মুক্তজীবের বেলায় স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভগবদাদেশে (ভগবানের শক্তিতে) অনুপ্রাণিত হইয়া মুক্ত আত্মাও সৃষ্টি প্রভৃতি করিতে পারেন। মোক্ষাবস্থায় যে ভগবদানন্দের বিকাশ হয় সে সম্বন্ধেও উভয় শাখায় মতভেদ দৃষ্ট হয়। বড়গলইগণ মুক্তাত্মার আনন্দোপলব্ধিতে বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না। কিন্তু টেঙ্গলইগণ বলেন যে ভগবদানন্দের ন্যূনাধিক্য না থাকিলেও জীবমাত্রের স্বভাব গত বৈচিত্র্যানুসারে সেবাভেদে ভগবদানন্দের আস্বাদন এক প্রকারে হয় না। গোবিন্দাচার্য্য অষ্টাদশ বিষয়ে উভয় শাখার মতভেদ বর্ণনা করিয়াছেন।[৫]

১। শ্রীভাষ্য, ১।১।১ ২। শ্রীভাষ্য, ১।১।১
৩। ঐ, ১।১।১ ৪। ঐ, ১।১।১

৫। See The Astādasa bhedas or the eighteen points of Doctrinal differences between the Tengalais and the Vadagalais of the Visistādvaita Vaisnava schools, South India, G. A. Govindacharya (J.R.A.S., 1910, PP. 1103—1112.)

আত্মা বহু ও নিত্য। আবার জ্ঞানৈকাকারত্ব নিবন্ধন সকলের একরূপত্বও আছে। প্রকৃতরূপে আত্মবেদনক্ষম ব্যক্তিগণ উহাদের ভেদকাকার অবগত হন।[১] শ্রুতিতে কখনও কখনও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। তাহা বিশেষণ-বিশেষ্য-দৃষ্টিতেই। কিম্বা শরীর-আত্ম-ভাবেই। বিশেষণ বিশেষ্যের অংশ বটে, আবার উহা হইতে ভিন্নও। "বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ঐ প্রকারে জীব ও পরের, বিশেষণ ও বিশেষ্যের অংশাংশিত্ব এবং স্বভাবভেদ উপপন্ন হয়"।[২] "প্রভা ও প্রভাবান, শক্তি ও শক্তিমান এবং শরীর ও আত্মারূপে জগৎ ও ব্রহ্মের অংশাংশিতার" শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] ব্রহ্মাংশত্বাদি দৃষ্টিতে জীবগণের একরূপত্ব থাকিলেও উহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে। প্রতি শরীরে জীব ভিন্ন ভিন্ন এবং অণু[৪] "অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্ব্বিশেষবস্তুপ্রতিপাদনমস্তি; নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ"।[৫] 'অতএব শাস্ত্রসমূহে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া, এবং জগৎ প্রপঞ্চ ভ্রান্তি (সুতরাং মিথ্যা) বলিয়া প্রতিপাদিত হয় নাই; চিৎ (জীব), অচিৎ (জগৎ) এবং ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদও নিষেধ করা হয় নাই'। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ ভেদ স্বাভাবিক মানেন বলিয়াই, রামানুজ মনে করেন যে উহারা কখনও এক হইতে পারেন না, এমন কি মুক্তিতেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারেন না। "নৈবং পরঃ"—শ্রীভাষ্য ২।৩।৪৫। "যে হেতু ব্রহ্ম সবিশেষ সেই হেতু সমস্ত শ্রুতিবাক্য সমূহ বলিয়াছেন যে সবিশেষ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়"।[৬] তাই রামানুজের মতে সবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাতকারই মুক্তি। মুক্ত জীব জ্ঞানানন্দস্বরূপে আবির্ভূত হন। অপহত পাপাত্বাদি গুণ লাভ করেন। সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হন। জগতের শাসনাদি ব্যতীত তাঁহারা অপর ব্রহ্মৈশ্বর্য্য লাভ করেন। মুক্তজীব ইচ্ছা করিলে সর্ব্বলোকে বা সর্ব্বত্র সংচরণ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের এতাদৃশ গুণবত্তা পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন, "কর্ম্ম কর্তৃত্বস্যৈব নিষেধাৎ স্বেচ্ছয়া সংচরণোপপত্তেঃ। অতোমুক্তো ভগবৎ সংকল্পায়ত্তস্বেচ্ছয়া সর্ব্বত্র সংচরতি"—শ্রীনিবাস

১। শ্রীভাষ্য, ২।৩।৪৩

২। শ্রীভাষ্য, ২।৩।৪৫ (শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত বঙ্গভাষান্তর দ্রষ্টব্য)।

৩। ঐ , ২।৩।৪৬।

৪। ঐ , ২।৩।৪৮

৫। ঐ , ১।১।১

৬। ঐ , ১।১।১

দাস, যতীন্দ্রমতদীপিকা, পৃঃ ৭৮। সুতরাং তাঁহারা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতে পারেন না। ভোগেই জীব ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন। জীব ভগবানের চিরদাস। মুক্তজীব তাঁহার দাসরূপে অবস্থিত থাকিয়া, তাঁহার লীলার সহচর হইয়া অপার আনন্দলাভ করেন। মুক্তজীবেরও ভগবানের অধীনতা অব্যাহতই থাকিয়া যায়। এমনকি নির্ম্মলতা, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল ভগবদ্ গুণ মুক্তজীবে স্বভাবতঃ আবির্ভূত হয় তাহাও মূলে যে ভগবদধীন তাহাতে সকল বৈষ্ণবগণ একই মতাবলম্বী মনে হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সকলেইত স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা চায়, অধীনতা কাহারও কাম্যও নহে, সুখদায়কও নহে; এই রূপাবস্থায় ভগবদধীনতা জীবের কাম্য বা পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিবার কি হেতু থাকিতে পারে? উত্তরে আচার্য্য রামানুজ বলিবেন যে এইরূপ প্রশ্ন দেহাভিমান হইতেই উৎপন্ন হয়, যাঁহাদের দেহাতিরিক্ত আত্মার বোধ জাগিয়াছে, তাঁহারা কখনই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন না।[১] পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ভগবৎ পারতন্ত্র্যকেই কেন রামানুজ পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "যাহার যে প্রকার দেহে আত্মাভিমান, তাহার পুরুষার্থবোধও তদনুরূপ। মুক্তপুরুষগণ ভগবৎ পারতন্ত্র্যকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। মুক্তাত্মার স্বাতন্ত্র্যাভিমান হয় না। কারণ ঐ প্রকার অভিমান দেহসম্বন্ধমূলক—উহা কর্ম্মজন্য বিপরীত-জ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থের, অর্থাৎ বিষয়ের, সুখাত্মকতা কর্ম্মজন্য। তাই বিষয় মাত্রই পরিচ্ছিন্ন ও অস্থায়ী। কিন্তু কর্ম্ম-নিবৃত্তি হইয়া গেলে ঐরূপ প্রতীতি আর হইতে পারে না। একমাত্র পরব্রহ্ম অথবা পরমাত্মাই স্বতঃ সুখময়; সুতরাং নিত্যানন্দস্বরূপ। বিষয়ের সুখময়তা অথবা দুঃখময়তা কর্ম্মসাপেক্ষ, স্বাভাবিক নহে। কর্ম্মক্ষয়ে জগৎ ব্রহ্মেরই বিভূতি বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাই তাহা নিত্যানন্দময় রূপে প্রকাশ পায়। পারতন্ত্র্যকে যে দুঃখ বলা হয়, তাহা ভগবৎপারতন্ত্র্য নহে। ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অধীনতা জীবের স্বভাবসিদ্ধ নহে বলিয়া দুঃখকর, উহাকে লক্ষ্য করিয়াই পারতন্ত্র্যের নিন্দাবাদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভগবৎপারতন্ত্র্য ভগবদঙ্গভূত আশ্রিত জীবের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, উহা পূর্ণানন্দময় মুক্তভাব এবং সাধনা মাত্রের পরম লক্ষ্য"।[২] জীব নিত্য অণু, ভগবান্ বিভু। জীব অঙ্গ

১। দ্রষ্টব্য বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ২৫১-২৫২।

২। দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় বৈষ্ণব দর্শনের উপর প্রবন্ধ নং ২।

ও আশ্রিত, ভগবান্ অঙ্গী ও আশ্রয়। সুতরাং জীব যে ভগবদাশ্রিত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই আশ্রিত ভাবই দাস্য বা কৈঙ্কর্য্য, ইহার পূর্ণ বিকাশই মোক্ষ। এই অবস্থায় প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতাও থাকে না। মুক্তিতে জীবের স্বাভাবিক দাস্যাভিমান অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে মুক্তিতেও বৈষ্ণবগণের মতে আমিত্ববোধ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। নির্ব্বাণাদি মুক্তিতে আমিত্ববোধ বা অভিমান থাকে না, কিন্তু বৈষ্ণবগণ ঐ প্রকার মুক্তিকে উপেক্ষার চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ প্রার্থয়ামি ন মুক্তয়ে। 'ভবান্ প্রভুরহং দাস' ইতি যত্র বিলুপ্যতে"। এই উক্তিটি হনুমানের। তিনি বলিয়াছেন, 'যে মুক্তিতে জীব ও ভগবানের-পরস্পর দাসপ্রভু সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা যাহাই হউক, আমি তাহা প্রার্থনা করি না।[১] ভক্তের ঐরূপ উক্তিতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে মুক্তির সহিত ইহার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? উত্তরে বলা যায়, "যাহাকে মোক্ষ বলা হইয়া থাকে তাহা বস্তুতঃ ভক্তিরই অবাধিত স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি মাত্র" (দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত উত্তরায় বৈষ্ণবদর্শনের উপর প্রবন্ধ নং ২)।

আচার্য্য রামানুজের মতে জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ, সুতরাং যেমন বদ্ধাবস্থায়, তেমন মুক্তাবস্থায়ও জীব অণুই থাকেন। আচার্য্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে মুক্তজীবের অণুত্বের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গীতাভাষ্যে মুক্তজীবকে নিম্নোদ্ধৃত স্থলে বিভুও বলিয়াছেন মনে হয়। গীতাতে জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ এইপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে, "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মন সৎ তন্নাসদুচ্যতে"—ঐ, ১৩।১২। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"—ঐ, ১৩।১৩। রামানুজ মনে করেন, 'অমানিত্বাদি সাধনসমূহ দ্বারা জ্ঞেয় বা প্রাপ্য যে প্রত্যগাত্মা তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে গীতার ঐ বচনে প্রত্যগাত্মাকে "ব্রহ্ম", "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ঐ সকল বচনকে তিনি এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ব্রহ্ম বৃহত্ত্বগুণযোগি, শরীরাদেরর্থান্তরভূতং, স্বতঃ শরীরাদিভিঃ পরিচ্ছেদরহিতং ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বমিত্যর্থঃ।" "স চানন্ত্যায় কল্পতে"

১। বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতায় (২-১২) বলা হইয়াছে যে এই সেবকভাব দ্বিবিধ। গন্ধমাল্যাদি সম্পাদন একজাতীয় সেবা, ইহাকে কৈঙ্কর্য্য কহে, আর রূপসেবা নামেও একপ্রকার সেবা আছে। (বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা, ২-১৩)।

(শ্বেতা, উ, ৫।৯) ইতি হি শ্রূয়তে ; শরীরপরিচ্ছিন্নত্বং চাস্য কর্ম্মকৃতম্, কর্ম্মবন্ধান্মুক্তস্যানন্ত্যম্ ; আত্মন্যপি ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে" (রামানুজ গীতাভাষ্য, ১৩।১২) ইত্যাদি।[১] তিনি বলেন যে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি" বাক্য প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্মেরই প্রতি প্রযোজ্য। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ পাণিপাদাদিরহিত হইলেও শ্রুতিতে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ" * ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হন। শ্রুতিতে আরও আছে যে মুক্তিতে পরিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের পরমসাম্য প্রাপ্ত হন। "প্রত্যগাত্মনোঽপি পরিশুদ্ধস্য তৎসাম্যাপত্ত্যা সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদিকার্য্যকত্বং শ্রুতিসিদ্ধমেব"—রামানুজ গীতাভাষ্য, ১৩।১৩। 'পরিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মার তৎসাম্যাপত্তিহেতু সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদিকার্য্যকত্ব নিশ্চয় শ্রুতিসিদ্ধ'। উক্ত বচনে আছে, "লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"। রামানুজ বলেন, "লোকে যদ্‌বস্তুজাতং তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি, পরিশুদ্ধস্বরূপং দেশাদি পরিচ্ছেদরহিতয়া সর্ব্বগতমিত্যর্থঃ,"—ঐ, ১৩।১৩। উহার তাৎপর্য্য এই যে ('ত্রি') লোকে যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই ব্যাপিয়া স্থিত থাকে, (আত্মার) পরিশুদ্ধ স্বরূপ দেশাদিপরিচ্ছেদরহিত বলিয়া সর্ব্বগত'। এইখানে তিনি মুক্ত আত্মাকে সর্ব্বগত বা বিভু বলিয়াছেন। বেঙ্কটনাথ বলেন যে রামানুজ যে জীবের পরিশুদ্ধ স্বরূপকে 'দেশাদিপরিচ্ছেদরহিততয়া সর্ব্বগত' বলিয়াছেন, তাহা উহার ধর্ম্মভূত জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া।[২] (দ্রষ্টব্য বেদান্তদেশিকাচার্য্য বেঙ্কটনাথ কৃত তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা টীকা, গীতা, ১৩।১৩)। পরন্তু রামানুজের ঐ লেখা হইতে তাহা সহজে মনে হয় না। অন্ততঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে রামানুজের ঐ লেখা হইতে কেহ যদি মনে করেন যে তিনি মুক্ত জীবকে বিভু বলিয়া মানিতেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

রামানুজ পাঞ্চরাত্রসংহিতার মত পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি পৌষ্করসংহিতার ও পরমসংহিতার বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] সুতরাং উহাদের প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করিতেন। উহাদের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মই হয়, মুক্তজীবের ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। রামানুজ তাহা মানেন নাই। 'অহির্বুধ্ন্যাদি' কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় মুক্ত জীব বিভু

১। রামানুজ এইখানে বলিয়াছেন যে গীতার ১৪।২৬, ২৭ ও ১৮।৪৫ শ্লোকে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'আত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', জীবপরিচ্ছেদ (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্ত বিভাগ, ২য় সম্পুট, পৃঃ ২১৪)।

৩। দ্রষ্টব্য শ্রীভাষ্য, ২।২।৪১ ও ৪২ * শ্বেতা, উ, ৩।১৬

হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রামানুজাদি তাহা মানেন না। তাঁহাদের মতে জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ, সুতরাং যেমন বদ্ধাবস্থায়, তেমন মুক্তাবস্থায়ও অণু থাকে। এইবাদও কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আছে। কোন কোন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য মুক্তজীবের বিভুত্ব বিষয়ক পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রবচনের তাৎপর্য্য যথাশ্রুত অর্থে নহে, ভিন্নার্থে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মতে মুক্ত জীব বস্তুতঃ অণু থাকিয়াও জ্ঞানে বিভু হয়। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যা সমীচীন হয় নাই। শ্রেডার মনে করেন যে শৈবসিদ্ধান্তের প্রভাবেই বৈষ্ণবশাস্ত্রে মুক্ত জীবের বিভুত্ববাদ আসিয়া পড়িয়াছে।[১] প্রকৃত কথা হয়তো ভিন্ন। ভাগবতধর্ম্মে মূলতঃ শৈব বৈষ্ণব ভেদ ছিল না। তখন ভাগবতধর্ম্মী আপন রুচি অনুসারে শিব, বিষ্ণু কিম্বা অপর যে কোন নামে ভগবানকে উপাসনা করিতে পারিতেন ও করিতেন। সুতরাং ভাগবতধর্ম্মী শৈবের ও ভাগবতধর্ম্মী বৈষ্ণবের মধ্যে দার্শনিকসিদ্ধান্তভেদ মূলতঃ ছিল না। পরে পরে উহা হইয়াছে। তখনও শৈবগণ মুক্তজীব বিষয়ক প্রাচীন সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবগণ তাহা স্বল্পবিস্তর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ঐ প্রাচীন সিদ্ধান্ত তাঁহাদের (বৈষ্ণবদের) কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা গ্রন্থে রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতকথা এমনও হইতে পারে। ইহা যে একেবারে কল্পিত নহে, তাহার প্রমাণ এই যে ভাগবতধর্ম্মের উপলব্ধ প্রাচীনতম গ্রন্থ 'গীতায়' আত্মাকে সর্ব্বগত বলা হইয়াছে।[২] আরও বলা হইয়াছে যে উহা দ্বারা পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত।[৩] সুতরাং উহার মতে আত্মা বিভু। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতায়'ও তাহার উল্লেখ আছে। পাঞ্চরাত্রবাদী আচার্য্য যামুন আত্মাকে ব্যাপী বলিয়াছেন। তাই মুক্তাত্মাকে হয়তো রামানুজ তাঁহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই কোথায়ও কোথায়ও বিভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আচার্য্য বেঙ্কটনাথ আচার্য্য বরদবিষ্ণুমিশ্রের গ্রন্থ হইতে (যে গ্রন্থের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই), নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সংসারদশায়াং স্বরূপজ্ঞানয়োঃ সঙ্কোচাদণুপরিমাণমাত্মস্বরূপম্। মোক্ষদশায়াং তু সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপি জ্ঞানং চ বিস্তীর্ণতয়া প্রকাশতে। অয়মর্থঃ", (ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন বেঙ্কটনাথ প্রণীত, বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্ত বিভাগ, ২য় সম্পুট,

---

১। দ্রষ্টব্য Schrader : Introduction to the Pāncarātra. পৃঃ ৯০

২। গীতা ২।২৪

৩। ঐ, ২।১ , (গীতা ভাগবতধর্ম্মী শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভৃতি সকল উপাসক সম্প্রদায়েরই মান্য)।

৪। গীতা, ৯।৪

পৃঃ ২১৪)। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে", (শ্বেত, উ, ৫।৯) ইতি শ্রুত্যাঽবগম্যতে"। 'সংসারদশায় স্বরূপের ও জ্ঞানের সঙ্কোচ বশতঃ আত্মস্বরূপ অণু পরিমাণ। পরন্তু মোক্ষদশায় সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী এবং জ্ঞান বিস্তীর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। কেশের অগ্রভাগের শতাংশের এক অংশকে শতধা বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করিলে যাবৎ পরিমাণ হয়, জীব তাবৎ পরিমাণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। উহা অনন্ত হইতে সমর্থ হয়, শ্রুতি হইতে ঐ অর্থ অবগতি হয়'। উহা হইতে বলা যায় যে আচার্য্য বরদবিষ্ণু মিশ্র (১২০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) আত্মাকে স্বরূপতঃ বিভু বলিয়া মনে করিতেন। তিনি আচার্য্য রামানুজের ভাগিনেয় এবং শিষ্য।[১] এবং রামানুজের দার্শনিক মত প্রভাবে প্রভাবিত। সুতরাং তিনি যে ঐ বিষয়ে রামানুজ হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন তাহাও আশ্চর্য্য মনে হইবে।

রামানুজের মতে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদ্ বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ সম্যক্ অভেদ বুঝায় না। মুক্তিতে জীব ভগবানের সেবার অধিকার লাভ করেন। ঐরূপ মুক্তির পক্ষে এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ প্রতিবন্ধক হওয়ায় রামানুজ জীবন্মুক্তিকে স্বীকার করেন নাই। তবে 'গীতার' ভাষ্যে আচার্য্য রামানুজ ও আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ এই জীবন্মুক্তাবস্থাকে যেন স্বীকার করিয়াছেন মনে হয়,[২] (দ্রষ্টব্য গীতা, ৫।১৯র রামানুজ ও বলদেবের ভাষ্য)। তবে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তাঁহারা জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার করেন নাই।

১। ইনি বরদার্য্য, বরদাচার্য্য বা বরদগুরু নামেও খ্যাত ছিলেন। ইনি 'তত্ত্বনির্ণয়' নামক এক প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পৌত্রও বরদাচার্য্য বা বরদগুরু নামে খ্যাত। উঁহার গ্রন্থের নাম 'তত্ত্বসার। (দ্রষ্টব্য প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, পৃঃ ৫৭৫ ও ৫৭৮-৯)।

২। "ইহৈব সাধনানুষ্ঠানদশায়ামেব তৈঃ সর্গোজিতঃ সংসারোজিতঃ ব্রহ্মণিস্থিতিরেব হি সংসারজয়ঃ।" (গীতা, ৫।১৫ র রামানুজ ভাষ্য)। "ইহ সাধনদশায়ামেব তৈ সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ।" (ঐ, বলদেব ভাষ্য)। সাধনানুষ্ঠান দশায় ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় বলিলে জীবন্মুক্তিকে কি অস্বীকার করা যায়? কারণ শরীর থাকা কালীন যে ব্রাহ্মীস্থিতি উহাইতো জীবন্মুক্তাবস্থা। (দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের 'জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি অধ্যায়)

ভাস্করমতে মুক্তি।

ভাস্করাচার্য্য বলেন মুক্তজীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন,—"জীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকোঽভেদ ঔপাধিকস্তু ভেদঃ", ভাস্করভাষ্য, ৪।৪।৪। এই বিষয়ে তিনি সর্ব্বতোভাবে আচার্য্য শঙ্করের অনুসরণ করিয়াছেন। আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি উক্ত মতকে আরও বিশদ্ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যথা চ ভগ্নে ঘটে ঘটাকাশো মহাকাশ এব ভবতি দৃষ্টত্বা-দেবমত্রাপীতি। জীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকোঽভেদ ঔপাধিকস্তু ভেদঃ স তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে"।[১] 'যেমন দেখা যায়, ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ মহাকাশই হয় এবিষয়েও ঠিক সেইরূপই। জীব ও পরব্রহ্মের অভেদই স্বাভাবিক, ভেদ ঔপাধিক। উপাধির বিনাশে ঐ ভেদ বিদূরিত হয়। জীব স্বরূপতঃ বিভু।[২] "জ্যায়স্ত্বং তু নিজং রূপম্'—ভাস্করভাষ্য, ২।৩।২৯। "আত্মা মুক্তঃ সর্ব্বগতঃ" ঐ ৪।৪।১৫। মুক্তিতে জীব স্বীয়রূপে অভিব্যক্ত হয়—"অভিসম্পত্তিশ্চাভি-ব্যক্তিঃ"।[৩] তাই মুক্তজীবও বিভু হন। মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাত্মক হন এবং নিরতিশয় সুখানুভূতি লাভ করেন।[৪] মুক্ত সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ করেন।[৫] উহা অবন্ধ্যসঙ্কল্পত্ব লাভ করেন বলিয়া অনন্যাধিপতি হন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হন।[৬] সর্ব্বশক্তি ও সত্যসঙ্কল্পবলে উহার নির্ম্মিত বহু শরীরে ভোগ-সংবিত্তিলক্ষণ-চেতনা ও তৎসাধনীভূত মনাদির আবির্ভাব হয়।[৭] "ন নিরঙ্কুশং মুক্তানামৈশ্বর্য্যং"।[৮] 'মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না।' "পারমেশ্বরাধীনমেবৈষামৈশ্বর্য্যং ন স্বাতন্ত্র্যমিতি"—ঐ, ৪।৪।২১। 'তাঁহার ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের অধীন, স্বতন্ত্র নহে।' মুক্তের ভোগ পরমেশ্বরের সমান হয়।[৯] মুক্তের পুনরাবৃত্তি হয় না। মুক্ত পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া তাঁহার সাথে আনন্দ উপভোগ করেন।[১০] "অতো জীবদবস্থায়াং ন মোক্ষঃ"—ঐ, ৩।৪।২৬। ভাস্কর জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না।[১১] তিনি সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি উভয়ই স্বীকার করেন। তিনি মুক্তিকে কেবলমাত্র

১। ভাস্করভাষ্য, ৪।৪।৪.　　২। ভাস্করভাষ্য, ২।৩।২৯ ও ৪।৪।১৫

৩। ঐ ৪।৪।১　　৪। ঐ ১।১।৪ ও ৪;৪।৭-৮

৫। ঐ ৪।৪।৮　　৬। ঐ ৪।৪।৯

৭। ঐ ৪।৪।১৫　　৮। ঐ ৪।৪।২১

৯। ঐ ৪।৪।২১　　১০। ঐ ৪।৪।২২

১১। ভাস্করভাষ্য, ৩।৪।২৬ and S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. III, P. 11.

জ্ঞানলভ্য মনে করেন না। বেদবিহিত কর্ম্মের অকরণে মুক্তি লাভ হইতে পারে না, (দ্রষ্টব্য ভাস্করভাষ্য, ৩।৪।২৬)। বেদবিহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের অনুশীলনের দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।[১] "এবং কর্ম্মসহিতাবিদ্যাঽপবর্গ প্রাপণ-যোগ্যেতি"—ঐ, ৩।৪।২৬। রামানুজ মতে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য মুক্তাবস্থায় থাকে, কিন্তু ভাস্করের মতে মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের কোন পার্থক্য থাকে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অংশে ভাস্কর মতের সহিত শৈববেদান্তি শ্রীকণ্ঠের মতের কিছুটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভাস্করভাষ্য আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে আচার্য্য ভাস্কর যেন মুক্তজীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন স্থির ও সুসঙ্গত মতবাদ স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার ভাষ্য অসংদিগ্ধরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্ণয় করে ইহা বলা যায় না। ভেদকে ঔপাধিক স্বীকার করিয়াও তিনি স্থানে স্থানে আবার মুক্তজীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিভাব, মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভোগৈশ্বর্য্য বিষয়ে সমতা মাত্র, মুক্তজীবের ব্রহ্মবৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রাপ্তি হইলেও সেখানেও মুক্ত নিয়াম্য ও ব্রহ্ম নিয়ামক ইত্যাদি তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, (দ্রষ্টব্য ভাস্করভাষ্য ৪।৪।২১, ২২)। উল্লিখিত মতবাদ এবং জীবন্মুক্তি অস্বীকার ও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি সমর্থন প্রভৃতির দ্বারা ভাস্করোক্ত মুক্তির সহিত শঙ্করোক্ত মুক্তির পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। শঙ্কর ঐ রূপ মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি মনে করেন, পূর্ণ নির্ব্বাণ মনে করেন না।

শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তি।

পাশবিচ্ছেদ ও পশুত্ব নিবৃত্তিই মুক্তি।[২] শিবত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি।[৩] মুক্তিতে জীব শিবের কল্যাণময় গুণ লাভ করেন এবং মল ও দোষ শূন্য হন।[৪] মুক্তজীব শিবতুল্য বা শিব সমান হন, কিন্তু শিবই হন না।[৫] "পরিপূর্ণং অহংভাবং প্রকটং অনুভবতি"।[৬] মুক্তাবস্থায় জীব নিজের পরিপূর্ণ অহংভাবকে অনুভব করিলেও শিবের সাথে এক হইয়া যান না। মুক্তপুরুষের অহং ভাব সাংসারিক

১। ভাস্করভাষ্য, ৩।৪।২৬ and S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosophy vol. III P. 9,

২। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ১।১।১ ; ৩।৪।৪৮ ; ৪।১।২

৩। ঐ, ৪।১।৩ ; ৪।৪।৯ ৪। ঐ, ৪।৪।৯

৫। ঐ, ১।৩।৮ ; ৩।২।২৪ ; ৩।৩।৪০ ; ৪।৪।১ ; ৪।৪।৪ ; ৪।৪।৯

৬। ঐ, ৪।৪।১৯

পরিচ্ছিন্ন অহংভাব নহে, উহা অপরিচ্ছিন্ন অহংভাব।[১] মুক্তজীব বিভু।[২] মুক্তজীবের ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিকার নাই।[৩] মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত সমান আনন্দ অনুভব করেন।[৪] মুক্তজীবেরও অন্তঃকরণ আছে। মুক্তজীব বিশুদ্ধ স্বাধীন ও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ লাভ করতঃ উহা দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন।[৫] তিনি শিবের চিরস্থায়ী আনন্দরূপ সর্ব্বদার জন্য দর্শন করেন।[৬] শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তি একটি শূন্যাবস্থা নহে, উহা একটি পরমানন্দময় অবস্থা।[৭] মুক্তি পরিপূর্ণ জ্ঞানাবস্থা।[৮] পাঞ্চভৌতিক দেহনাশের পর এই অবস্থা লাভ হয়।[৯] শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তি সাধ্য এবং উপাসনার ফল। ব্রহ্মের কৃপায় মুক্তি লাভ হয়।

শ্রীকণ্ঠের মতে শিবত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি। নিম্বার্কের মতে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি। শিব ও কৃষ্ণের ভিতর তত্ত্বের দিক্ হইতে কোন ভেদ নাই। রামানুজের মতে মুক্তজীব ঈশ্বরের চির দাস, শ্রীকণ্ঠ মুক্তজীবের চির দাস্যভাব স্বীকার করেন না। ভাস্করের মতন শ্রীকণ্ঠ মুক্তি দুইপ্রকার বলিয়াছেন, সদ্য ও ক্রমিক। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতঃ ভেদ স্বীকার করেন নাই। শ্রীকণ্ঠের মতে জীব ও ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতঃ ভেদ বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়ে শ্রীকণ্ঠ রামানুজ মতের অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। তবে রামানুজ মতে জীব অণু ও প্রতি শরীরে বিভিন্ন এবং শ্রীকণ্ঠের মতে জীব বিভু ও প্রতি শরীরে বিভিন্ন।

নিম্বার্কমতে মুক্তি।

জীব অণু। মুক্তাবস্থায়ও জীব জীবই। তবে মুক্তজীব আপনার ব্রহ্মস্বরূপতা ও জগতের ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করেন। তিনি আপনাকে ও জগতকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। নিম্বার্ক তদ্‌ভাবাপত্তিকেই (ব্রহ্মভাবাপত্তিকেই) মোক্ষ বলিয়াছেন।[১০] "ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা" শ্রুতির অর্থে নিম্বার্ক ব্রহ্মভাবাপত্তিকেই বুঝেন। মোক্ষে জীব ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত হন।[১১] 'ব্রহ্মস্বরূপলাভ' শব্দে

১। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪।৪।১৯
২। ঐ, ৪।৪।১৯
৩। ঐ, ৪।৪।১৭-১৮
৪। ঐ, ৪।৪।২১
৫। ঐ, ১।৩।১ ; ৪।৪।১৪
৬। ঐ, ১।৩।১ ; ৪।৪।১ ;
৭। ঐ, ২।১।৩৫ ; ৪।৪।৯ ; ৪।৪।১৪
৮। ঐ, ১।১।১
৯। ঐ, ৪।২।৮ ; ৪।২।১৮
১০। মন্ত্ররহস্যষোড়শি, শ্লোক,১৪ ; প্রপন্নকল্পবল্লী, শ্লোক, ২২
১১। বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, ৫।৩।২৬

মোক্ষের সমগ্র তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যায় না বলিয়া তিনি মোক্ষকে স্বীয় 'আত্ম-স্বরূপলাভ'ও বলিয়াছেন।[১] জীব বদ্ধাবস্থায় বা মুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ ভিন্ন, যেমন সূর্য্য তাঁহার কিরণ হইতে ভিন্ন।[২] "অবিভাগেঽপি (বিভাগব্যবস্থোপপদ্যতে দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ) সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্য্যতৎ-প্রভয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ"—নিম্বার্কভাষ্য, ২।১।১৩। অর্থাৎ 'যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ' অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎপ্রভা, অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।' ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম এক হইতে পারেন না।[৩] নিম্বার্কের মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও যান না বা তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বও ত্যাগ করেন না। মুক্তিকে বুঝাইতে যে 'সাম্য' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার অর্থ সমতা কিন্তু একতা নহে।[৪] মুক্তজীব নিজের স্বতন্ত্রতা বা ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াই ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন। ঐরূপ ব্রহ্মসমতাই মুক্তি। মুক্তিতে অবিদ্যাজাল সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যাওয়ায় জীব জ্যোতির্ম্ময় নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।[৫] তাই মুক্তিকে ব্রহ্মসমতা লাভ বা স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হয়।[৬] নিম্বার্ক মতকে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ বলা হয়, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে সাম্যও আছে এবং ভেদও আছে। মুক্তজীব ঈশ্বরের সমান গুণ ও স্বভাব প্রাপ্ত হন, উভয়ই সমান পবিত্র, পাপশূন্য, দোষরহিত এবং সর্ব্বজ্ঞ।[৭] মুক্তজীব পূর্ণকাম অর্থাৎ যখন যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বপুরুষদের সহিত ইচ্ছা মাত্রই সাক্ষাৎ পান।[৮] মুক্তপুরুষ ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন এবং যে কোন লোকে গমন করিতে পারেন, কোন সহায় বা অবলম্বন গ্রহণ না করিয়াই।[৯] মুক্ত নিজেই নিজের প্রভু, কাহারও অধীন

১। বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, ৪।৪।১-২

২। ঐ ২।১।১৩

৩। ঐ ২।৩।৪২ ; আর দ্রষ্টব্য 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-রাজ, শ্লোক, ১

৪। "পরমং সাম্যমুপৈতি," মুণ্ডক, উ, ৩।১।৩

৫। "স্বেনরূপেন অভিনিষ্পদ্যতে" ছান্দোগ্য, উ, ৮।৩।৪

৬। সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-রাজ, শ্লোক, ১৩

৭। নিম্বার্ক ভাষ্য, ৪।৪।৪

৮। ঐ , ৪।৪।৮

৯। নিম্বার্কভাষ্য (বেদান্তপারিজাত সৌরভ) ৩।৩।৪০

নহে।[১] তিনি একমাত্র ঈশ্বরের অধীন। মুক্তজীব ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন।[২] নিজেরই সৃষ্ট শরীরাদি বিশিষ্ট হইয়া ভগবল্লীলারসভোগ করিতে পারেন।[৩] স্বসৃষ্ট শরীরাদি অভাবে ভগবৎ সৃষ্টশরীরাদিযুক্ত হইয়া মুক্তপুরুষ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।[৪] মুক্তপুরুষ কর্তৃক যে তাঁহাদের শরীরাদি সৃষ্ট হইবেই এমন কোন নিয়ম নাই। অতএব, মুক্তপুরুষের শরীরাদিসৃষ্টি স্বেচ্ছায় ও ভগবদ্‌ইচ্ছায়, এই উভয়রূপেই হইয়া থাকে।

মুক্তজীব অণু।[৫] ঈশ্বর বিভু।[৬] "বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্যচ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে"—শ্বেতাশ্ব, উ, ৫।৯। অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণু পরিমাণ, কিন্তু ঐরূপ হইলেও জীব গুণে অনন্ত হইতে পারে। জীবের অণুত্ব মুক্তিতেও দূর হয় না, কারণ উহাই জীবের স্বভাব, জীবের অণুত্ব তাঁহাকে বিভিন্ন শরীরে একই সাথে আনন্দ উপভোগে বাধা দেয় না।[৭] প্রদীপ যেরূপ একস্থানে স্থিত হইয়াও স্বীয় প্রভার দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, মুক্তজীবও স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা অনেক শরীরে আবিষ্ট হন।[৮] জগতের সৃষ্ট্যাদিব্যাপারের ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে, মুক্তজীবের নাই।[৯] জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্ষমতা ভিন্ন মুক্তজীব সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।[১০] মুক্তজীব সব্ববিধ ভয়মুক্ত হন, এবং রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হন।[১১] ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা মুক্তজীবের লাভ হয় না। জীবের জীবত্ব সর্ব্বাবস্থায়ই থাকে।

পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নিম্বার্কমতে মুক্তি সম্বন্ধে নিম্নানুরূপ বলিয়াছেন, "জীবের যখন প্রকৃতি-সম্বন্ধ ছিন্ন হয় তখনই তাঁহাকে মুক্তজীব বলে।" ঐ প্রকৃতি সম্বন্ধই বন্ধন, উহার নিবৃত্তিই মুক্তি। এই মুক্তি দ্বিবিধ বলিয়া মুক্তজীবও দুই প্রকার। 'বেদান্তকৌস্তভা'দি গ্রন্থে "কার্য্য-কারণ-

---

১। নিম্বার্কভাষ্য, ৪।৪।৯ ২। ঐ ৪।৪।২১

৩। মুক্তজীবের শরীর ঈশ্বরের মতনই অপ্রাকৃত। দ্রষ্টব্য বেদান্তরত্নমঞ্জুসা, পৃঃ ৩১-৩৪ ও নিম্বার্কভাষ্য, ৪।৪।১৪)

৪। নিম্বার্কভাষ্য, ৪।৪।১৩ ৫। নিম্বার্কভাষ্য, ৪।৪।১৫

৬। " ৪।৪।১৫

৭। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৬।২ তে বলা হইয়াছে জীব এক হয়, দুই হয়, তিন হয় পাঁচ হয় ইত্যাদি।

৮। নিম্বার্কভাষ্য, ৪।৪।১৫ ৯। ঐ, ৪।৪২০

১০। ঐ, ৪।৪।১৭ ১১। ঐ, ৪।৪।১৯

প্রকৃতি নিবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবদ্‌ভাবাপত্তি"কেই মুক্তি বলা হইয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থে প্রত্যগাত্মার স্বরূপলাভকেও মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মুক্তাবস্থায় ভগবদ্‌ভাবের প্রাপ্তি না হওয়ার দরুণ পরমানন্দের বিকাশ হয় না। সেই হেতু এই অবস্থা কৈবল্যের নামান্তর মাত্র"।[১]

'নিম্বার্ক মতে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই পরব্রহ্ম। ইনি দোষহীন, কল্যাণগুণের আকর। ভগবান মুক্তগম্য, (ভগবৎ) কৃপালভ্য ও মুমুক্ষু ব্যক্তির একমাত্র জিজ্ঞাস্য। তাঁহার স্বরূপের ন্যায় তাঁহার দেহও অনন্ত (অসংখ্যেয়) কল্যাণগুণের আশ্রয়।[২] মুক্তপুরুষগণ ভগবদ্‌সাম্য লাভ করায় তাঁহাদের দেহও ঐরূপ গুণশালী হয়। নিত্যমুক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ এই তিন প্রকার জীব। নিত্যমুক্তগণ সর্ব্বদাই সংসার দুঃখরহিত, স্বভাবতঃ ভগবদনুভাবিত ও ভগবৎ-স্বরূপ-গুণাদিবিষয়ে অনুভবানন্দসম্পন্ন,' (দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় বৈষ্ণবদর্শনের উপর প্রবন্ধ নং ৩)। মুক্তগণ অপ্রাকৃতদেহ লাভ করেন। বন্ধনাবস্থায় উহা আবৃত ছিল। জীব যখন ভগবানের কৃপালাভের দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎ লাভ করেন তখন তাঁহার নিত্য সিদ্ধ অপ্রাকৃত দেহের সহিত যোগলাভ হয়। ঐ দেহ নির্ব্বিকার, হেতু-জন্য নহে। ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ হইতে নিত্য বিলক্ষণ, কিন্তু চিৎ অচিৎ উভয় তত্ত্বই সদাই ব্রহ্মাত্মক। বৃক্ষ হইতে পত্র, প্রদীপ হইতে প্রভা, গুণী হইতে গুণ এবং প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় যেরূপ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে বা কার্য্য করিতে সমর্থ নহে এবং পত্রাদি বৃক্ষাদির অংশ ও বৃক্ষাদি হইতে অভিন্ন হইয়াও স্বগতভেদ রহিত নহে, তদ্রূপ মুক্তিতেও পৃথক্ স্থিত্যাদির অভাববশতঃ অভেদ সত্ত্বেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে। মুক্তাবস্থায়ও পরস্পরের ভেদ না মানিলে উভয়ের স্বরূপহানি প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। "মুক্তাবস্থায় প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা হইতে অবিভক্ত ভাবে নিজকে অনুভব করিয়া থাকেন। পরমাত্মা জীবের স্বাংশী, জীব তাঁহার স্বাংশ। তাই জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বরাত্মক ও তাঁহা হইতে অবিভাজ্য। যদিও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জীবে স্বাভাবিক বিভাগ আছে, তথাপি উভয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিভাগসহিষ্ণু স্বাভাবিক

১। পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় বৈষ্ণবদর্শনের উপর প্রবন্ধ নং ৩।

২। ঐ

এই প্রবন্ধে পণ্ডিতজী ভগবানের স্বরূপের ও দেহের অনন্তকল্যাণগুণ সমূহের বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন।

অবিভাগও বর্ত্তমান আছে। উভয়ের স্বরূপাবিভাগ অঙ্গীকার সমীচীন নহে। 'বিভাগসহিষ্ণু অবিভাগই' জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ"।[১] অতএব মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদ এই মতে সিদ্ধ হয় না।

আচার্য্য নিম্বার্ক তাঁহার স্বীয় প্রকরণ গ্রন্থে জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন মনে হয়। "দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, (দ্রষ্টব্য নিম্বার্কভাষ্য, ৪।২।৭ র সন্তোদাস বাবাজীর টীকা)। ডক্‌টর রমা চৌধুরী বলেন, পরিশেষে নিম্বার্ক জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই।[২] ডক্‌টর চৌধুরী এখানে নিম্বার্কভাষ্যকে উপেক্ষাই করিয়াছেন মনে হয়। ব্রহ্মসূত্রের (৪।২।৭) ভাষ্যে নিম্বার্ক নিম্নরূপ লিখিয়াছেন, "হৃদয় পুণ্ডরীকে একশত একটী নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে। (জ্ঞানী উপাসক) সেই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। আর অধঃ ও বক্রগামী বাকি একশত নাড়ী কেবল দেহ হইতে জীবের উৎক্রমণ সাধক হয় মাত্র। (উক্ত ভাষ্যে) নাড়ী বিশেষের দ্বারা বিদ্বানের (অর্থাৎ জ্ঞানী জীবন্মুক্তের) উৎক্রমণ গতি বর্ণিত হইয়াছে। 'যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা হইতে মর্ত্ত্য (জীব) মুক্ত হন তখন সে অমৃতত্ব লাভ করেন,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবিত কালেই অমৃতত্ব লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে।* (অর্থাৎ জীবন্মুক্তি অঙ্গীকার করা হইয়াছে)। সেই সময়ে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ এবং (জ্ঞানলাভের) পরে কৃত পাপপুণ্যের অশ্লেষ অর্থাৎ অলিপ্ততা জন্মে"। ইহাতে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে জীবিত কালেই নিম্বার্কাচার্য্য অমৃতত্ব লাভ অর্থাৎ মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য ইহাও বুঝা যায় যে তিনি জ্ঞানীর উৎক্রমণ স্বীকার করিয়া সদ্যোমুক্তি অস্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ইহাকে সগুণ উপাসকের উৎক্রান্তি বলিয়া বলিয়াছেন। তিনি সগুণ উপাসককে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্তের উৎক্রমণ নাই।

১। দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় বৈষ্ণবদর্শনের উপর প্রবন্ধ নং ৩।

২। "Finally, according to Nimbarka, there is no such thing as jivanmukti or salvation in this life, here and now." Dr. R. Bose (Chowdhury), Doctrines of Nimbarka and His followers, Vol. III, p. 46. (Pub. by R.A.S. of Bengal, Calcutta, 1943.)

* বৃহ, উ, ৪।৪।৭

নিম্বার্ক ভাস্করাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন মনে হয়। ঐ জন্যই বোধ হয় তাঁহার অপর নাম ভাস্করাচার্য্য। নিম্বার্ক ভাস্করের ভেদাভেদবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, ভাস্করের মত পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। ভাস্করের মতে মুক্তজীব ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন, (ভাস্করভাষ্য ৪।৪।৪)। নিম্বার্কের মতে মুক্তজীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য প্রাপ্ত হন না।

জীবের জীবত্ব থাকিবেই। মুক্তজীবও অংশমাত্র। মুক্তজীব বিভু কখনই হইতে পারেন না। এইখানে ভাস্কর ও নিম্বার্কের পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিম্বার্কের মতাবলম্বী দেবাচার্য্য ও সুন্দরভট্টের মুক্তজীব সম্বন্ধে মত নিম্নে উল্লেখ করা সমীচীন মনে হইতেছে, কারণ তাঁহারা নিম্বার্কমতে মুক্তজীবের স্বরূপের আরও সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

দেবাচার্য্য ভগবৎ প্রাপ্তিই মুক্তি বলিয়াছেন। মুক্তাবস্থায় পঞ্চভূতের সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে জীবের স্বমমত্ব-ভাবনা দূর হইয়া যায়, এবং স্থায়ী প্রজ্ঞা লাভ হয়।[১] মুক্তাবস্থায় জীবের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না, শুধু 'অহং মম' এই অভিমান নষ্ট হয়। মুক্তজীবও বদ্ধজীবের মত ঈশ্বরের অধীন। বদ্ধজীব যেরূপ মৃত্যু ইত্যাদি ভয়ে ভীত মুক্তজীব সেইরূপ নহে। মুক্তজীব সর্ব্ব-ক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকেন বলিয়া তাঁহার ভয় করিবার কিছুই নাই।[২] মুক্তজীব অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন ও ঈশ্বরেব সেবাপরায়ণ হন।[৩] তিনি জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না, কারণ তাঁহার মতে দেহমুক্তিতাই মুক্তি।[৪]

সুন্দরভট্ট দেবাচার্য্যের শিষ্য। তিনি বলেন মুক্তিতে জগৎবন্ধন ছিন্ন হয়, এবং ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্তি হয়।[৫] জগৎবন্ধন ছিন্ন হওয়ার অর্থ হইল অনাদি অবিদ্যা বা কর্ম্ম হইতে মুক্তি। ঐ অবিদ্যা প্রকৃতি বা ভূতসংসর্গে সঞ্জাত এবং 'আমি' 'আমার' এই অভিমান স্বরূপ। সুন্দরভট্টের মতে 'আমার' (মম) অর্থ মৃত্যু এবং বন্ধন, ও 'আমার নয়' (ন মম) অর্থ মুক্তি।[৬] মুক্তের ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রজ্ঞা লাভ হয়।[৭]

১। সিদ্ধান্ত জাহ্নবী, ১।১।১, পৃঃ ৪৪,নং ৯৪ (এখানে লেখক বেদান্ত রত্নমঞ্জুসাকে অনুসরণ করিয়াছেন)।
২। ঐ ১।১।১, পৃঃ ১৬৪-১৬৪, নং ৯৯
৩। ঐ ১।১।৪ পৃঃ ১৮৯, নং ৯৯
৪। ঐ পৃঃ ১৯৫
৫। মন্ত্রার্থরহস্য, পৃঃ ২৮
৬। ঐ পৃঃ ১৮
৭। ঐ পৃঃ ৩০-৩১

আচার্য্য মধ্বের মতে মুক্তি।

যাঁহারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহাকে অপরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ করেন তাঁহারাই মুক্ত, (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।১,২ র তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা দ্রষ্টব্য)। মুক্তি সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য ভেদে চারি প্রকার। যে ভোগ্য সকল পরমাত্মা ভোগ করিয়া থাকেন, সেই সকল মুক্তপুরুষগণও ভোগ করেন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৪।৪।৪)। মুক্ত পুরুষেরা অচিদ্ দেহ (অচিন্ময় দেহ) পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহ গ্রহণ করেন। চিন্ময় দেহে অবস্থান করাই মুক্তি, (ঐ, ৪।৪।৬)। মুক্তের ভোগে কোন যত্ন করিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তপুরুষের ভোগ সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ হয়, (ঐ ৪।৪।৮)। আচার্য্য মধ্ব নিজ সমর্থনে 'বরাহপুরাণে'র বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'তাঁহাদের একমাত্র বিষ্ণুই অধিপতি, অন্য কোন নিয়ামক নাই,' (ঐ, ৪।৪।৯)। সমস্ত প্রাণীদিগের, যতিদিগের ও আচার্য্যদিগের নিয়ামক বিষ্ণুই। বিষ্ণু ভিন্ন জ্ঞানীদিগের অন্য কোন অধিপতি নাই,' (ঐ ৪।৪।৯)। আরও দ্রষ্টব্য—"মুক্তস্যাপিতুবদ্ধত্বমস্তি যৎ স হরের্বশঃ। মুক্তাখ্যা দুঃখমোক্ষাৎ স্যাদ্বদ্ধাখ্যাহর্য্যধীনতা" ॥ (গীতাতাৎপর্য্য-নির্ণয়, মধ্বাচার্য্য গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৮৯৭)। 'মুক্তগণ পরম বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া স্ব-স্ব-গুণের তারতম্যানুসারে আনন্দলাভ করিয়া অবস্থান করেন। মুক্তিতেও কেহ ব্রহ্মের সমান হইতে পারেন না'— "মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্দেহং সংশ্রিতাহপি। তারতম্যেনতিষ্ঠন্তি গুণৈরানন্দপূর্ব্বকৈঃ॥ নসমোব্রহ্মণঃ কশ্চিন্মুক্তাবপিকথঞ্চন"। (ঐ, পৃঃ ৬৮৫-৮৬)। আচার্য্য মধ্ব নিজ সমর্থনে 'বরাহ' ও 'গরুড়' পুরাণের বচন উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, মুক্তের 'সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের যোগ্যতা নাই', (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।১৭-১৮)।[১] একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎসৃষ্টাদির অধিকার আছে, অন্য কোন মুক্তপুরুষদিগের নাই।[২] 'কোন কোন জীব মুক্ত হন, আবার কেহ কেহ মুক্ত হইতে পারেন না। মুক্তদিগের মধ্যে কেহ ইহলোকে স্থিত হন, কেহ আবার অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন; কেহ মহর্ল্লোকে, কেহ তপলোকে, কেহ সত্যলোকে, আবার কোন মহাজ্ঞানী ক্ষীরসাগরে গমন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য হেতু কেহ সামীপ্য, কেহ সালোক্য ও কেহ সাযুজ্য লাভ করেন। পরে অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীমন্নারায়ণাখ্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন'।[৩]

১। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।১৭-১৮তে উদ্ধৃত বরাহপুরাণের বচন।

২। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।২৯ ৩। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।১৯শে উদ্ধৃত গরুড়পুরাণের বচন।

কিন্তু ৪।৪।২১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে মুক্তপুরুষগণের আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তাঁহারা একরূপেই সর্ব্বদা অবস্থান করেন ও সর্ব্বদা হরির উপাসনা করিয়া থাকেন।[১] তাঁহার 'গীতাতাৎপর্য্য' নামক গ্রন্থে লিখিত (ঐ, পৃঃ ৬৮৫-৮৬) মতবাদের সহিত ঐ সূত্রের (৪।৪।২১) ভাষ্যের সামঞ্জস্য নাই। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" এই ব্রহ্মসূত্রের (৪।৪।২২) ভাষ্যে মনে হয় যেন তিনি আবার মুক্তদিগের পরস্পরের মধ্যে ভোগসাম্যের কথা বলা হইতেছে কল্পনা করিয়া নিম্নশ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "এতমানন্দময়মাত্মানমনুপ্রবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে যথা কামঞ্চরতি যথা কামম্পিবতি যথাকামং রমতে যথাকাম-মুপরমতে ইতি"। 'এই আনন্দময় আত্মাতে অনুপ্রবেশ করিয়া তিনি (মুক্ত) জন্মগ্রহণ করেন না ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না, হ্রাস প্রাপ্ত হন না ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন; তিনি ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন, যথাভিলাষ পান করেন, ইচ্ছানুরূপ রমণ ও উপরমণ করেন।' পরন্তু রামানুজ, ভাস্কর এবং নিম্বার্ক প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও ভেদাভেদবাদীগণ উপরোক্ত সুত্রের ভাষ্যে "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই শ্রুতি উদ্ধার করিয়া মুক্তগণের ব্রহ্মের সহিত ভোগে মাত্র সমতা আছে এবং জগদ্ব্যাপার প্রভৃতিতে ক্ষমতাসাম্য নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বের উল্লিখিত শ্রুতি দৃষ্টেও ইহা প্রতীত হয় না যে উক্ত শ্রুতিতে মুক্তের পরস্পর ভোগ সাম্যের কথা উক্ত হইয়াছে। তিনি (মধ্ব) উক্ত সুত্রের ভাষ্যে পুনরায় 'নারায়ণতন্ত্র' ও 'কূর্ম্মপুরাণো'ক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া মুক্তদের পরস্পরের মধ্যে কখন কখন ভোগের হ্রাসবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, "ভোগানান্ত বিশেষেতু বৈচিত্র্যং লভতে ক্বচিৎ", নারায়ণতন্ত্র। "কদাচিৎ কবিশেষস্ত নৈব তেষাং নিষিধ্যত ইতি কৌর্ম্মে।" মুক্তের পুনরাবৃত্তি হয় না।[২] "প্রলয়কালে সকলমুক্তগণই ভগবদ্‌দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অন্য সময়ে তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে স্বরূপ হইতে বাহির হইতে পারেন, এবং স্বরূপপ্রবিষ্ট হইতেও পারেন। সালোক্য মুক্তিতে মুক্তগণ ভগবৎলোকের যে কোন স্থানে থাকিয়া ইচ্ছানুসারে ভোগ করিয়া থাকেন। সামীপ্য ও সারূপ্য ভোগও উক্ত প্রণালীতে হয় মনে করিতে হইবে। জীব অণু হইলেও জীবের যোগ্যতানুসারে ভগবান তাহার জন্য কল্যাণতম মহদ্রূপ* নির্ম্মাণ করিয়া দেন বলিয়া তাহার পক্ষে ভোগ সম্পাদন সম্ভবপর হয়।"

১। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।২১

২। পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন, ৪।৪।২৩

* শ্রেষ্ঠ শরীর

(গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'উত্তরা'য় মধ্বের উপর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য মধ্ব "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫) সূত্রের ভাষ্যে মুক্তজীবের ব্রাহ্মদেহেও ভোগ সম্পন্ন হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্ব জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণ মুক্তি স্বীকার করিতেন না।

মধ্বাচার্য্যের মতে জীব অণু ও প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন। জীব অস্বতন্ত্র। ভগবানেব সাথে জীব কখনও অভিন্ন হইতে পারেন না। ভগবান সেব্য, আর জীব সেবক। জীব চেতন, কিন্তু উহার জ্ঞান সসীম। চেতন জীব দুই প্রকারের—দুঃখী ও দুঃখরহিত। দুঃখী জীব দুই প্রকারের। এক প্রকার মুক্তির যোগ্য ও অন্য প্রকার মুক্তির অযোগ্য।

"দুঃখসংস্থ (জীবগণ) মুক্তির যোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য ভেদে দ্বিবিধ। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, রাজগণ এবং (উত্তম) নরগণ এই পঞ্চপ্রকার জীব মুক্ত (অর্থাৎ মুক্তির যোগ্য)। আর মুক্তির অযোগ্যগণ তমোগ* ও সৃতিসংস্থিত (অনন্তকাল ধরিয়া সংসারে গমনাগমনপরায়ণ)। দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ ও অধম মর্ত্ত্যগণই তমোগ ও সৃতিসংস্থভেদে দ্বিবিধ গতিশীল"।[১] ইহাতে মনে হয় যেন মধ্বাচার্য্য এখানে সেমিটিক (semitic) ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের মত অনন্ত নরকে গমনযোগ্য এবং তদতিরিক্ত আর এক নূতন— 'অনন্তকাল ধরিয়া সংসার চক্রে ভ্রমণপরায়ণ' এক শ্রেণীর জীব স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক দার্শনিক সাহিত্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথায়ও এই জাতীয় কল্পনা দেখা যায় না।

অদ্বৈতবেদান্ত যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন উহা জীবের অকল্যাণই সাধন করিয়া থাকে, আচার্য্য মধ্ব তাহাই মনে করেন। "অগ্নির্মাণবকঃ" এই কথা বলিলে অগ্নির সঙ্গে মানবকের (ব্রহ্মচারীর) অভেদ বুঝায় না। শুধু এই মাত্র বুঝায় যে মানবকটি বহ্নিসদৃশ। সেইরূপ অপূর্ণ জীব ও পূর্ণব্রহ্মের বা হরির অভেদ অসম্ভব। জীব ব্রহ্মের সদৃশ। ঐ সাদৃশ্যই "অহংব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। জীবের ঐ ব্রহ্মসাদৃশ্য স্বীয় গুণোৎকর্ষের ফলে ধাপে ধাপে (সালোক্যাদিরূপে) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মধ্বাচার্য্যের সাথে রামানুজাচার্য্যের মতের অনেক সাদৃশ্য ও অনেক পার্থক্য আছে। তাই আমরা উভয় মতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

উভয়ের সাদৃশ্য—মুক্তজীব ব্রহ্ম হন না বা ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন না। মুক্ত

১। দ্রষ্টব্য তত্ত্বসংখ্যান গ্রন্থ।

* অনন্ত নরকাশ্রয়ী

জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে। মুক্তজীব ভগবান হইতে ভিন্ন। বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তজীব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যেমন বদ্ধাবস্থায়, তেমন মুক্তাবস্থায়ও জীব অণুপরিমাণ। মুক্তজীবের অপ্রাকৃত দেহ আছে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। রামানুজমতে জ্ঞানী জীবজগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। আর মধ্বের মতে জ্ঞানী জীবজগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে অস্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে রামানুজের ও মধ্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, রামানুজ দর্শন "পরস্পর বিরুদ্ধভেদাদি পক্ষত্রয়ের অঙ্গীকার হেতু ক্ষপণকপক্ষে নিক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষনীয়"।[১] রামানুজও দ্বৈতবাদে দোষারোপ করিয়াছেন, "অত্যন্তভিন্ন (জীব ও ব্রহ্মের) কোন প্রকারেই ঐক্য অসম্ভব বলিয়া যাঁহারা বলেন সেই সমস্ত কেবলভেদবাদীদের পক্ষে ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ নিশ্চয় সম্ভব হয় না। তাহাতে সর্ব্ববেদান্ত পরিত্যাগ হয়।"[২] পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেন, "রামানুজ মতেও ব্রহ্মাদি জীবগত তারতম্য শুধু সংসারাবস্থায়, মুক্তাবস্থায় সর্ব্বজীব পরস্পর ও পরমাত্মার সহিত অংশতঃ সাম্যবিশিষ্ট। শ্রীসম্প্রদায়েও তারতম্যবাদ যে না আছে তাহা নহে, তবে মাধ্বসম্প্রদায়ের মত এতটা ব্যাপক ভাবে নহে"।[৩]

আচার্য্য মধ্বের মতে মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্ম হইতে ভেদ তথা নিজেদের মধ্যে তারতম্য থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে ভেদ থাকে না তিনি তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। মুক্তিতে যদি জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ দৃষ্ট না হইত, তবে বিমোক্ষের জন্য যত্ন করা কাহার উচিৎ হইত? (দ্রষ্টব্য ভাগবততাৎপর্য্য নির্ণয়, ৪।২২।২৭, মধ্বাচার্য্য গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৮৩৯.২)। এই বচন নাকি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে অনূদিত। জীবের উপাধি (স্বরূপ এবং বাহ্য) দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়। মুক্তিতে বাহ্য উপাধি লয় পায়, পরন্তু অপরটি থাকে। সর্ব্বোপাধির বিনাশ হইলে প্রতিবিম্ব কি প্রকারে হইত? আত্মবিনাশার্থ কখনও প্রযত্ন করা কি প্রকারে উচিৎ হইত? মুক্তিতে পুরুষের তথা জ্ঞানজ্ঞেয়াদির অভাব হইলে মুক্তির নিশ্চয় অপুরুষার্থতা হইত।

১। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের বিবরণের প্রারম্ভ।

২। শ্রীভাষ্য, ১।১।১র বঙ্গভাষান্তর, ২২৯ পৃষ্ঠা। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ লিখিত।

৩। দ্রষ্টব্য 'উত্তরা'য় বৈষ্ণবদর্শনের উপর প্রবন্ধ নং ৩।

সুতরাং উহা সর্ব্বথা অনুপপন্ন হয়। সেই হেতু উহা যাঁহাদের মত, তাঁহারা নিশ্চয় তমোনিষ্ঠ বলিয়া মধ্বের অভিমত। (ঐ, ৪।২২।২৬, মধ্বাচার্য্য-গ্রন্থাবলী, পৃঃ, ৮৩৯)। এই বচন নাকি স্কন্দপুরাণের। ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্যজ্ঞানবশতঃ জীব তমে গমন করে; আর ভেদজ্ঞানবশতঃ পরমপদে গমন করে। স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্রাদিজ্ঞান ভেদদর্শীরই হয়। (ঐ, ১০।৪।১৯, গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৮৬৫.২ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে)। ত্রিবিধজীবসংঘ এবং অব্যয় পরমাত্মা উহাদের ভেদ সত্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মোহবিবর্জ্জিত। (ঐ, ১।২।২২, গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৯৯১.১)। এই বচনটি মহাসংহিতা হইতে অনূদিত। ঐ নামের কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা ছিল বলিয়া জানা নাই। মুক্তজীব নিশ্চয় বিষ্ণুর অচল এবং ধ্রুব পরমস্থানে গমন করেন।

মধ্বের ন্যায় রামানুজও জীব ও ঈশ্বরের, তথা জীবগণের পরস্পরের ভেদ স্বাভাবিক এবং নিত্য বলিয়া মানেন। তবে মধ্বের মতে জীব সমূহের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক তারতম্য ভেদ আছে। উহা নিত্য সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও উহা থাকে। অপর কথায় মুক্তজীবগণের মধ্যেও তারতম্যভেদ আছে। পক্ষান্তরে রামানুজ মনে করেন যে সমস্ত জীব স্বভাবতঃ সমান; উহাদের তারতম্যভেদ বদ্ধাবস্থায় দেবমনুষ্যাদি শরীরোপাধির ভেদবশতঃ, মুক্তাবস্থায় ভেদকারক ঐ শরীরোপাধি হইতে বিমুক্ত হয় বলিয়া সমস্ত জীব সমান। তিনি মনে করেন যে "গীতা'র "অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"[১], "সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্"[২] ও "যদাভূতপৃথগ্ভাব-মেকস্থমনুপশ্যতি"[৩], প্রভৃতি বচনে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে মুক্তজীব ভগবানের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন,[৪] তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন।[৫] তাঁহার সহিত পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।[৬] সুতরাং মুক্তজীব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সমান।[৭] তবে তাঁহাদের উভয়েরই মতে মুক্তজীব বহু এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। রামানুজ ব্রহ্মের ও মুক্তজীবের শরীরীশরীরাদি ভাব হেতু তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। মধ্ব তাহা করেন না। নিয়ামকনিয়াম্য সম্বন্ধ উভয়েরই সম্মত। মধ্বের মতে শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য, ভেদও সত্যই, জীবগণ হরির অনুচর, উহাদের মধ্যে উচ্চনীচভাব আছে, অমলানিজসুখানুভূতিই মুক্তি,

---

১। গীতা, ১৩।১৭.১

২। ঐ, ১০।২৯.১

৩। ঐ, ১৩।৩১.১

৪। গীতা, ১৪।২

৫। ঐ, ১৪।২৯

৬। মুণ্ডক, উ, ৩।১।৩

৭। বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা, ৪।১০।৩৪ ; ৪।১০।১৩-৬

তাহার সাধন ভক্তি ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ ; হরি একমাত্র সর্ব্ব বেদগম্য ।[১]

বল্লভাচার্য্যের মতে মুক্তি ।

গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য প্রাপ্তিই মুক্তি । শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা করা ও সর্ব্বাত্মভাব লাভ করাই মুক্তি । যখন সমস্ত কিছুই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়, যখন ব্রহ্মরূপ কার্য্যের ব্রহ্মই কারণ বলিয়া অনুভব হয়, তখনই সর্ব্বাত্মভাব সিদ্ধ হয় । শুদ্ধজীব সকলই শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে সেবা করিয়া পরমানন্দলাভ করেন । যে জীবের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, সে জীব সেই রূপে তাঁহাতে (ভগবানে) আবিষ্ট হইয়া ভগবদানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ।[২] আমরা যে উপরে সর্ব্বাত্মভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আচার্য্য বল্লভের মতে উহা ভগবদ্বিষয়ক নিরুপাধি স্নেহরূপ ভক্তি বিশেষ । সেই সর্ব্বাত্মভাব মর্য্যাদা ও পুষ্টিভেদে দুই প্রকার । রাজা অম্বরীষ প্রভৃতির মর্য্যাদা সর্ব্বাত্মভাব । ব্রজসুন্দরীগণের সর্ব্বাত্মভাব শুদ্ধা পুষ্টিভক্তির ফলস্বরূপ । ইহাকে পুষ্টি সর্ব্বাত্মভাব কহে ।[৩] "শ্রীগোলোকধামে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরসোৎসবে পতিভাবে ভগবানকে সেবা করাই জীবের মোক্ষ" ।[৪] "মুক্তজীব দ্বিবিধ, জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত । অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয় । সনকাদি মুনিগণ জীবন্মুক্ত । যাঁহারা ব্যাপক বৈকুণ্ঠ বা পরমব্যোম ব্যতিরেকে অন্যান্য ভগবল্লোকে বাস করেন তাঁহারাও মুক্ত । তারপর ভগবানের বিশিষ্ট কৃপার ফলে পরমব্যোমে প্রবেশ হইলে পরামুক্তি বা বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব ঘটিয়া থাকে । দৈবজীবের মধ্যে কেহ কেহ সৎসঙ্গ পাইয়া মার্গানুরাগ জন্য শ্রবণাদি সমুদ্ভুত ফলরূপা স্বতন্ত্র ভক্তির দ্বারা নিত্য লীলাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন" ।[৫] নিম্নে জীবসৃষ্টির ক্রম ও জীব সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা সঙ্গত মনে হইতেছে ।

---

১ । "শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ, সত্যং জগৎ, তত্ত্বতো ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ । মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা, ভক্তিশ্চ তৎ সাধনং হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ" ।

২ । "যথাঽনুগ্রহো যস্মিন্ জীবে স তাদৃশং তদাবিশ্য ভগবদানন্দমশ্নুত ইতি সর্ব্বমবদাতম্ ।" অনুভাষ্য, পৃঃ ১৩৯৪

৩ । স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, পৃঃ ৬৭৪, (১ম সংস্করণ)

৪ । ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী, বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদ, পৃঃ ৫৯

৫ । পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় বল্লভমতের উপর প্রবন্ধ ।

বল্লভমতে জীবাত্মা অণুপরিমাণ, ব্রহ্মাংশ ও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সৃষ্টিকালেই জীবে সত্ত্বাংশ প্রবল হয় এবং আনন্দাংশ তিরোহিত হয়। সৃষ্টির কথা শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হইয়া সৃষ্টিক্রম কি করিয়া মানিলেন ? আচার্য্য বলেন ভগবান লীলাবশে জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে তিনি শুদ্ধ ও অবিকারি রূপেই অবস্থান করিতেছেন। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই তাঁহাতে এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্যকারণের অভেদনিবন্ধন তাঁহার মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈত নামে কথিত হয় । ("অচিন্ত্যানন্তশক্তি মতি সর্ব্বভবনসমর্থে ব্রহ্মণি বিরোধা-ভাবাচ্চ", অণুভাষ্য, ২।১।২৭)। ভগবানের চিদংশই জীবশব্দ বাচ্য। জীব অণু বটে, কিন্তু ভগবদাবিষ্ট হইলে তাহাতে আনন্দাংশের অভিব্যক্তি হয় এবং ব্যাপকতা প্রভৃতি ভগবদ্ধর্ম্ম তাহাতে প্রকাশ পায়। কিন্তু তখনও জীবের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। আনন্দাংশের সম্বন্ধবশতঃ চিদংশে ব্যাপকতা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র, (তত্ত্বদীপ ও তৎপ্রকাশ, পৃষ্ঠা, ৮৩ দ্রষ্টব্য)। জীব ত্রিবিধ—শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। সৃষ্টিকালে আনন্দাংশ তিরোহিত হইয়া যে শুদ্ধ চিদ্ভাব প্রকাশ পায় উহাই শুদ্ধজীব। ইহার পর অবিদ্যাসম্বন্ধ সংঘটিত হইলে জীব বদ্ধ বা সংসারী হয়। সংসারীজীবের ভগবানের ইচ্ছায় ঐশ্বর্য্যাদি গুণ তিরোহিত হয়। শুদ্ধজীবে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের অংশ বর্ত্তমান থাকে। সংসারীজীবের মধ্যে কেহ বা দৈবভাবাপন্ন, আবার কেহ বা আসুরভাবাপন্ন। ভগবান যাহাদিগের সহিত লীলা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে দৈবত্ব দান করিয়া থাকেন, আর যাহাদিগের হৃদয়ে আসুরভাব দেখেন তাহাদিগকে সংসার ভ্রমণে রত করান। আসুরজীব স্থূলদেহ লাভ করিয়া মুক্তির প্রতিবন্ধক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া থাকে ও নীচ যোনিতে ভ্রমণ করে। ইহারা সর্ব্বদাই সংসারী। যখন ভগবান আত্মরমণের ইচ্ছা করেন তখন আসুরজীবও শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই মুক্তির মূলে ভগবদিচ্ছারই প্রাবল্য আর ঐ ভগবদ্‌কৃপালাভই মুক্তি ।

মুক্তি সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার মানা হয়। যে কোন দেবতার উপাসনায় সেই দেবতার সহিত সাযুজ্য লাভ হয়। দেবতা সগুণ হইলে তাঁহার সাথে সাযুজ্য লাভকে সগুণ মুক্তি কহে। ভগবান ব্যতীত সকলেই সগুণ, তাই কৃষ্ণ সাযুজ্যই নির্গুণ মুক্তি। জ্ঞানমার্গে নির্গুণ মুক্তি লাভ হয় না। জ্ঞানমার্গে যে মুক্তিলাভ হয় তাহা কৈবল্য মুক্তি। আচার্য্য বল্লভ ঐ মুক্তির সমাদর করেন নাই। কৈবল্যে অধ্যাস বা আসক্তি থাকে না বটে, তবে

তখনও সগুণভাব থাকে, কারণ বিদ্যা ও অবিদ্যার বৃত্তি তখনও স্বীকার করিতে হয়। উহার পরে গুণাতীতে প্রবেশ লাভ হয়। ভক্তি না হইলে কৈবল্যকে অতিক্রম করিয়া নির্গুণ মুক্তি লাভ হয় না। এই নির্গুণমুক্তি লাভকেই আচার্য্য বল্লভ অধিক সমাদর করিয়াছেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে মুক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য কোন বেদান্তভাষ্য রচনা করেন নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তভাষ্য। শ্রীমৎমধ্বাচার্য্যের মতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত হওয়ায় তিনি মধ্বের ভাষ্যকে গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল যে স্থলে তিনি মধ্বের সহিত একমত হইতে পারেন নাই সেখানে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীরূপ ও সনাতনও ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য রচনা করিয়া যান নাই। অষ্টাদশ শতকে (খৃষ্টীয়) আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। আমরা বলদেবের 'গোবিন্দভাষ্যে'র মতকেই গৌড়ীয় মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তকে নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে।

কর্ম্মসম্বন্ধ ও কর্ম্মশরীরাদি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক স্বরূপে অবস্থিতিই স্বরূপাভিনিষ্পত্তি এবং তাহাই মুক্তি।[১] মুক্তিতে জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং আটপ্রকার গুণ লাভ করেন।[২] মোক্ষাবস্থায়ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ বর্ত্তমান।[৩] মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয় না, মুক্তজীব ব্রহ্ম সদৃশ হন।[৪] অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলেও গুণ-গুণি-ভাবে, দেহ ও দেহি-ভাবে জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, (দ্রষ্টব্য ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী, বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ, পৃষ্ঠা ৫৭)। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত অভিলষিত বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকেন, স্বাধীন ভাবে তিনি ঐরূপ ভোগ করিতে পারেন না। ভোগে ব্রহ্মেরই প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মুক্তজীবের প্রাধান্য নাই।[৫] মুক্তজীব অণু। মুক্তজীব স্বীয় অণুত্ব প্রযুক্ত অনন্ত

১। গোবিন্দভাষ্য, ৪।৪।২
২। ঐ , ৪।৪।১
৩। ঐ , ১।১।২
৪। ঐ , ১।১।১৭
৫। ঐ , ১।১।১৬

আনন্দশালী হইতে পারেন না। অল্পধনযুক্তব্যক্তি মহাধনের আশ্রয়েই সম্পন্ন হন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।[১] সতী স্ত্রী যেরূপ পতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ মুক্তজীবগণ হরিকে আয়ত্ত করেন।[২] তদুপপন্ন (মুক্ত) জীব অপৃথক্‌রূপে তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সালোক্যাদি উহারই প্রকার ভেদ।[৩] মুক্তজীব ব্রহ্মদ্বারা নিষ্পন্ন অপহতপাপত্বাদি ও সত্যসঙ্কল্পত্ব গুণসমূহে বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন।[৪] মুক্তজীব সর্ব্বজ্ঞ হন, (গোবিন্দভাষ্য, ৪।৪।১৬।) পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে সত্যসঙ্কল্পহেতু মুক্ত পুরুষের অন্য কেহ অধিপতি বা নিয়ামক নাই। তাঁহার অধিপতি একমাত্র পুরুষোত্তমই, অন্য কেহ নহে। মুক্তজীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব তাঁহারই (হরিরই) অধীন। মুক্ত বিধিনিষেধের অধীন নহে।[৫] মুক্তের জগদ্ব্যাপারে (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে) হাত নাই।[৬] ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের একমাত্র ভোগ সম্বন্ধেই সাম্য আছে, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সর্ব্বকালিক স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পারমার্থিক ভেদ নিত্যই বিদ্যমান আছে।[৭] মুক্তের ভগবদ্‌ধাম হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। সর্ব্বেশ্বর হরি স্বাধীন মুক্তপুরুষকে আত্মলোক হইতে কখনই পতিত হইতে দিবার ইচ্ছা করেন না, এবং মুক্তও হরিকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।[৮] উপাসনার তারতম্যহেতু মুক্তগণের ভিতরেও ভেদ আছে।[৯] পুরাণাদি শ্রবণজন্য জ্ঞানবশতঃ শূদ্রাদিরও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ফলে তারতম্য দৃষ্ট হয়।[১০] এইমতে বিদেহমুক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু জীবন্মুক্তি নহে।[১১] মুক্তি সাধ্য এবং ভগবানের কৃপায় লাভ হয়। বলদেবের ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কের মতেরই অনুরূপ মনে হয়। অদ্বৈতবাদ যে ব্রহ্মকে গুণশূন্য মনে করে তাহা বলদেব সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের গুণশূন্যতা প্রতিপাদন করেন না। ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণসকল নাই। তিনি অপ্রাকৃত গুণশালী বা অনন্তকল্যাণগুণময় বলিয়া বলদেব মনে করেন। বলদেবের এই সিদ্ধান্ত অনেকটা রামানুজেরই অনুরূপ প্রতীয়মান হয়। তাঁহার মতেও সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি।

১। গোবিন্দভাষ্য, ৪।৪।২০
২। ঐ , ১।১।১৬
৩। ঐ , ৪।৪।৪
৪। ঐ , ৪।৪।৫
৫। ঐ , ৪।৪।৯
৬। ঐ , ৪।৪।১৭-১৮
৭। ঐ , ৪।৪।২১
৮। ঐ , ৪।৪।২২
৯। প্রমেয়রত্নাবলী, ৬।২।৩
১০। গোবিন্দভাষ্য, ১।৩।৩৮
১১। ঐ , ৩।৩।৩৩

চতুর্থ অধ্যায়।

মীমাংসামতে মুক্তি।

জৈমিনির মীমাংসাসূত্রে স্বর্গ প্রাপ্তির কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে মুক্তির বর্ণনা নাই। পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে মুক্তিকে অধিক সমাদর করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদেরই মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রপঞ্চ সম্বন্ধ বিলয়ো মোক্ষঃ", শাস্ত্রদীপিকা, পৃঃ ৫৫৭। 'এই জগতের সহিত (আত্মার) সম্বন্ধ বিলয়ের নামই মোক্ষ'। তিন প্রকার বন্ধন পুরুষকে আবদ্ধ করে—ভোগায়তন শরীর, ভোগসাধন ইন্দ্রিয় সকল, আর ভোগ্য শব্দাদি বিষয় সকল। এই তিনপ্রকার বন্ধনের আত্যন্তিক বিলয়কেই মোক্ষ কহে—"ত্রেধা হি প্রপঞ্চঃ পুরুষং বধ্নাতি—ভোগায়তনং শরীরং, ভোগসাধনানি ইন্দ্রিয়ানি, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়োবিষয়াঃ। ভোগ ইতি চ সুখদুঃখবিষয়োঽপরোক্ষানুভব উচ্যতে। তদস্য ত্রিবিধস্যাপি বন্ধস্য আত্যন্তিকো বিলয় মোক্ষঃ", শাস্ত্রদীপিকা, পৃঃ ৩৫৮। 'আত্যন্তিক' শব্দের অভিপ্রায় এই বুঝিতে হইবে যে মুক্তিতে শুধু পূর্ব্বে উৎপন্ন শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের নাশই হয় না, ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার দরুণ ভবিষ্যৎ শরীরের উৎপত্তির সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়। অদ্বৈতবেদান্তে প্রপঞ্চবিলয়কেই মোক্ষ বলা হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসা প্রপঞ্চসম্বন্ধবিলয়কে মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মীমাংসা ঐরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে জীব মুক্ত হইলেও প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকে, যেরূপ সংসারাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। মুক্তাত্মার প্রপঞ্চের সহিত কেবলমাত্র সম্বন্ধ বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রপঞ্চ (জগৎ) বিলয় প্রাপ্ত হয় না। মীমাংসার মতে জীব এবং জগৎ সত্য। আচার্য্য প্রভাকর বলেন, "পরিক্ষয়নিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মের নিঃশেষ হওয়ায় যে আত্যন্তিক দেহচ্ছেদ হয় উহাই মুক্তি'—"আত্যন্তিকস্তু দেহোচ্ছেদো নিঃশেষধর্ম্মাধর্ম্মপরিক্ষয়নিবন্ধনো মোক্ষঃ", প্রকরণপঞ্চিকা, তত্ত্বালোক, পৃঃ ১৫৬। প্রভাকরের মতে আরও বলা হয়, "নিয়োগসিদ্ধিরেব মোক্ষঃ"। অন্য কোন ফলের আশা না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই নিয়োগসিদ্ধি, ঐ নিয়োগসিদ্ধিই মোক্ষ। তাই মুক্তিকে কার্য্যরূপ দশা বলা যায়, যে দশায় ক্রিয়া আছে, কিন্তু অন্য কোন ফলের আকাঙ্খা নাই, (দ্রষ্টব্য প্রকরণপঞ্চিকা, পৃঃ ১৮০-১৯০)। মুক্তাবস্থায় সুখদুঃখের বিলয় হয়। মুক্তিতে আত্মা গুণশূন্য হন। সুখও একটি গুণ। সেইহেতু মুক্তিতে উহারও অভাব হয়। মহর্ষি গৌতম ও কনাদোক্ত মুক্তির সহিত

মীমাংসার মুক্তির এইখানে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মীমাংসার মুক্তিকে আত্মার স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্তিও বলা হইয়াছে—"স্বাত্মস্ফুরণরূপঃ," প্রকরণপঞ্চিকা, পৃঃ ১৫৭।

কেহ কেহ বলেন যে, মুক্তিতে যে সুখানুভূতি আছে আচার্য্য কুমারিলভট্ট তাহা মনে করিতেন। (তাঁহাদের মতে) 'চিত্তের দ্বারা আত্মসুখানুভূতিই' মুক্তি— "চিত্তেন স্বাত্মসৌখ্যানুভূতি ঃ"। তাঁহারা আরও মনে করেন, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের মন বর্ত্তমান থাকে। (দ্রষ্টব্য শাস্ত্রদীপিকা,পৃঃ ১২৬-১২৭)। কিন্তু 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র মতে মুক্তি অভাবাত্মকাবস্থা বলিয়া মোক্ষাবস্থায় কোন কিছুরই অনুভূতি থাকে বলিয়া স্বীকার করা যায় না, (দ্রষ্টব্য শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার প্রকরণ, শ্লোক ১০৭)। কুমারিলমতাবলম্বীরা বলেন যে মুক্তাবস্থায় মন থাকে না। মুক্তি দুঃখচ্ছেদরূপ অবস্থা মাত্র। কুমারিল পরমাত্মপ্রাপ্ত্যবস্থাকেও মুক্তি বলিয়াছেন— "ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যপুনরাবৃত্ত্যাত্মকপরমাত্মপ্রাপ্ত্যবস্থা ফলবচনম্," (দ্রষ্টব্য তন্ত্রবার্ত্তিক)। 'ন্যায়সুধা' গ্রন্থেও 'তন্ত্রবার্ত্তিকে'র মতই সমর্থিত হইয়াছে। 'ন্যায়সুধা' গ্রন্থে কুমারিল ব্যবহৃত পরমাত্মপ্রাপ্তি সংজ্ঞাকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করিতেছি। 'শরীরসম্বন্ধোপাধিবশতঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বযুক্ত সংসারী অবস্থা পরিত্যাগের দ্বারা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিত অসংসারী স্বরূপাবস্থার স্ফূর্ত্তিই পরমাত্ম-প্রাপ্তিরূপাবস্থা। সেই স্বরূপাবস্থার স্ফূর্ত্তি অজন্য অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে। অতএব সেই স্বরূপাবস্থাপ্রাপ্তির (পরমাত্মস্বরূপাবস্থাপ্রাপ্তির) অক্ষয়ত্বই যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন'। "শরীরসম্বন্ধোপাধিকর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাত্মক-সংসারিরূপাবস্থাপরিত্যাগেন অকর্ত্তৃভোক্তৃ-ত্বাত্মকাসংসারিরূপনিজাবস্থায়া এব পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপত্বেন তস্যা অবস্থায়া অজন্যত্বাদ্ যুক্তমক্ষয়ত্বম্," ন্যায়সুধা। অর্থাৎ কিনা, আত্মার সংসারীরূপাবস্থা ত্যাগ করিয়া যে অসংসারী স্থিতি তাহাকেই পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ অবস্থা বা মুক্তি কহে। এই স্বরূপাবস্থাপ্রাপ্তির অজন্যত্ব হেতুজনিত অক্ষয়ত্ব স্বীকারের দ্বারা গ্রন্থকার যেন অদ্বৈতবেদান্তপ্রতিপাদ্য নিত্যসিদ্ধ মুক্তির আভাস দিতেছেন। মুক্তিকে অপুনরাবৃত্তিও বলা হইয়াছে। অপুনরাবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি উভয়ের অভেদ নিরসন অর্থাৎ ভেদ প্রতিপাদনের জন্য মুক্তের 'অপুনরাবৃত্ত্যাত্মকতা' (অপুনরাবৃত্তির কথা) উক্ত হইয়াছে— "অপুনরাবৃত্তের্ব্রহ্মপ্রাপ্তিতোঽভেদনিরাসায় অপুনরাবৃত্ত্যাত্মকতা উক্তা," ন্যায়সুধা। গ্রন্থকার এখানে একথা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন যে শ্রুতি মুক্তজীবের সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া যে "ন স পুনরাবর্ত্ততে" অর্থাৎ মুক্তজীব পুনরায় আবর্ত্তন

করেন না এই কথা বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য এই যে মুক্তিতে জীব স্বীয় স্বরূপাবস্থায় স্থিতি লাভ করেন এবং পুনরায় সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করেন না বটে কিন্তু জীব ঈশ্বরে (ব্রহ্মে বা পরমাত্মায়) লীন হন না, জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে। 'ন্যায়সুধা'র এই উক্তি দৃষ্টে মনে হয় যেন পাছে পাঠক তাঁহার (গ্রন্থকার) কথিত পরমাত্মপ্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন এই আশঙ্কায় তিনি যেন মুক্তিতে স্বরূপলাভ হয় বলিয়াছেন। কুমারিলের মতে মুক্তিতে দুঃখ ধ্বংস হইয়া অসংসারী আত্মা বিদ্যমান থাকেন। তিনি বলেন মুক্তাত্মার সুখানুভূতি থাকে না। "সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গ এব ভবেদেষ, পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ," শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, শ্লোক ১০৫। অর্থাৎ মোক্ষকে যদি সুখোপভোগরূপ অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়, তবে উহা স্বর্গ বিশেষই হয়, এবং তাহা হইলে কোন কালে উহার ক্ষয় অবশ্যই হইবে। তাই যাঁহারা বলিয়াছেন যে নিত্যসুখের অভিব্যক্তিই মুক্তি তাঁহাদের এই মত উপরোক্ত শ্লোকের দ্বারা অসমর্থিত হইয়াছে। মীমাংসকাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার 'শাস্ত্রদীপিকা' গ্রন্থের 'তর্কপাদে'র প্রথমে আনন্দমোক্ষবাদীদের মতের বিশেষ বর্ণনা করিয়া ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন মুক্তিতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় না, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মাত্র হয়। "সুখদুঃখোপভোগহিঁ সংসার ইতি শব্দ্যতে। তয়োরনুপভোগস্তু মোক্ষং মোক্ষবিদো বিদুঃ। শ্রুতিরপ্যেবমাহ ভেদং সংসারমোক্ষয়োঃ ॥ নহবৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়বিহীনতা। অশরীরং বাব সন্তং স্পৃশতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে", শাস্ত্রদীপিকা, তর্কপাদ। তবে এই কথা বলা চলে যে, ভট্টকুমারিলের প্রকৃত মত কি ছিল এই বিষয়ে পূর্ব্বকালে মতবিরোধ দেখা গিয়াছিল, এবং পার্থসারথি মিশ্রও সেই মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'শাস্ত্রদীপিকা'র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "কুমারিলমতেনাহং করিষ্যে শাস্ত্রদীপিকাং" 'কুমারিল মতে শাস্ত্রদীপিকা প্রণয়ন করিব।' এই কথা বলাতে 'শাস্ত্রদীপিকা'কারের মত যে কুমারিলের মত তাহা বলা যায়। সুতরাং 'শাস্ত্রদীপিকা'য় মুক্তিতে সুখানুভূতি নাই বলাতে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কুমারিল সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ মুক্তিতে সুখানুভূতি নাই এই মতকেই সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী মীমাংসক গাগাভট্ট তাঁহার 'ভট্টচিন্তামণি' গ্রন্থের 'তর্কপাদে' সুখ ও দুঃখ এই উভয়ের উপভোগাভাবকেই মুক্তি বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ প্রপঞ্চস্য সর্ব্বথাবিলয়ো মুক্তিঃ। স চ দুঃখাভাবরূপত্বাৎ পুরুষার্থঃ। তেন সুখদুঃখোপভোগাভাবো মোক্ষ ইতি ফলিতম্"। ভট্টকুমারিলের স্বকীয় উক্তি ও তাঁহার মতাবলম্বীদিগের

উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কুমারিলাচার্য্য মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় তাহা স্বীকার করিতেন না। তবে যে মাধবাচার্য্য স্বকীয় গ্রন্থে কুমারিল মুক্তিতে সুখানুভূতি স্বীকার করিতেন বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই (আমাদের মনে হয়) যে কুমারিলের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত অনেকাংশে এক মতাবলম্বী 'তৌতাতিত' বা 'তুতাত' নামে অন্য কোন মীমাংসকাচার্য্য ছিলেন, যাঁহাকে মাধবাচার্য্য কুমারিলভট্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মাধবাচার্য্য ঐ তুতাত মীমাংসকাচার্য্যেরই শ্লোক নিজের গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ শ্লোক কুমারিলভট্টের লিখিত বলিয়া ভুল করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' 'আর্হতদর্শনে' "তথা চোক্তং তৌতাতিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া যে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলভট্টের 'শ্লোক-বার্ত্তিকে'র শ্লোক নহে। ঐ ভাবের কতিপয় শ্লোক যাহা 'শ্লোকবার্ত্তিকে' দেখা যায় তাহার পাঠ অন্যরূপ।[১] তাই বলা যাইতে পারে যে তৌতাতিত এই নামটি কুমারিলের নহে। সুতরাং তুতাত আচার্য্য মুক্তিতে সুখানুভূতি মানিলেও উহা কুমারিলভট্টের মত নহে। কুমারিলের মতে আত্মানুভূতিকে মোক্ষ বলায় তাঁহার মত প্রায় বেদান্তমতের অনুরূপ মত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে কিন্তু এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম এই কথা তিনি স্বীকার করিতেন না। আর তিনি অদ্বৈতবাদীদের মত শুধু আত্মজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয় এই কথা স্বীকার না করিয়া আত্মজ্ঞান ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে মুক্তি লাভ হয় বলিয়াছেন।[২] 'জ্ঞানবানও বিহিতকর্ম্মের অকরণে ও অবিহিত কর্ম্মের করণে পাপসঞ্চয় করিয়া থাকেন'—"জ্ঞানবত্যপি বিহিতানুষ্ঠাননিসিদ্ধাচরণাভ্যাং প্রত্যো-বায়োৎপত্তেঃ", ভট্টচিন্তামনি, পৃঃ ৫৭। ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় মনে করিতেন যে কুমারিলের মতে আত্মজ্ঞান কর্ম্মক্ষয়ের সহায়তা করে না। তিনি বলেন; সমগ্র ধর্ম্মাধর্ম্মের উচ্ছেদে যে আত্যন্তিক দেহচ্ছেদ তাহাই মুক্তি। তাঁহার মতে কর্ম্মই হইল ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয়ের কারণ এবং ঐ কর্ম্মক্ষয় জনিতই মুক্তিলাভ হয়।[৩] কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে কুমারিল জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদী, জ্ঞানও মুক্তিলাভে সহায়তা করে।

১। দ্রষ্টব্য শ্লোকবার্ত্তিক (দ্বিতীয় সূত্রবার্ত্তিকে) ১১৭ ও ১১৮।

২। তত্র জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং ভোগাৎ পূর্ব্বক্রিয়াক্ষয়ে।
উত্তরপ্রচয়সত্ত্বাদ্ দেহোনোৎপদ্যতে পুনঃ॥ ১০৮
মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥ ১১০
শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ।

৩। দ্রষ্টব্য Indian Thought, vol II, p, 258-9,

মধুসূদন সরস্বতী গুরু মতের মুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনাশ জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির আত্যন্তিক উচ্ছেদই ঐ মতে মোক্ষ বলা হয়"।[১] তিনি ভট্টমতেরও দুইটি শাখার বিবরণ তাঁহার 'বেদান্তকল্পলতিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এক শাখায় (নারায়ণভট্ট প্রভৃতির শাখায়) দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইলে তখন আত্মাতে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান যে নিত্যানন্দের অনুভূতি উহাই ভট্টকুমারিল মতে মুক্তি বলিয়া ধরা হইত,—"দুঃখাত্যন্তসমুচ্ছেদে সতি প্রগাত্মবর্ত্তিনঃ। নিত্যানন্দস্যানুভূতির্মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ", মানমেয়োদয়, প্রমেয় প্রকরণ, শ্লোক ২৬। কিন্তু অপর শাখায় (পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতির শাখায়) মুক্তিতে সুখানুভূতির অভিব্যক্তি নাই তাহাও বলা হইয়াছে। এই দুই শাখার মতভেদের উল্লেখ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার 'বেদান্ত-কল্পলতিকা'য় সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।[২]

১। মধুসূদন সরস্বতী, বেদান্তকল্পলতিকা, পৃঃ ৪

২। " ঐ " ৪

পঞ্চম অধ্যায়

সাংখ্যমতে মুক্তি

সাংখ্যমতের মূল আচার্য্য মহর্ষি কপিলের লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালে যে কয়েকখানি সাংখ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত 'সাংখ্যকারিকা'ই প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয়। শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপে ঐ গ্রন্থেরই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহাকে এক্ষণে 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' বলা হয়, ঐ গ্রন্থের নামও তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। আমরা সাংখ্যমতের মুক্তি সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে যাইয়া মুখ্যতঃ আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র মতই উল্লেখ করিব। পরে সাংখ্যমতানুরূপী পাতঞ্জলযোগমতের মুক্তি সম্বন্ধে চর্চ্চা করিব। তৎপরে চরকে ও মহাভারতে উক্ত প্রাচীন সাংখ্যমতের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই বন্ধন। আর উহাদের বিবেকই মুক্তি। 'যে কোন প্রকারে প্রকৃতির সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ' —"যদ্বাতদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ", দ্রষ্টব্য সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৬।৭০। 'প্রয়োজন চরিতার্থ হেতু প্রকৃতির নিবৃত্তি এবং শরীর পাত হইলে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ হয়'—"প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তেঃ। ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি"॥ সাংখ্য-কারিকা, ৬৮। অসঙ্গ-চিৎস্বরূপ-আত্মা তখন (মোক্ষাবস্থায়) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ তখন আর তাঁহাতে (আত্মায়) প্রাকৃতিক কোন ভাব (সুখদুঃখমোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম) প্রতিবিম্বিত হয় না। তখন 'ত্রিবিধদুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) সমূলে উচ্ছেদ হয়'—"কৈবল্যং দুঃখত্রয়বিগমং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ", ঐ, তত্ত্বকৌমুদী। আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কখন কখন আবার ইহাও বলিয়াছেন যে বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিরই হয়, পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া উহার বন্ধন ও মুক্তির কথাই উঠিতে পারে না। তিনি বলেন, 'কোন পুরুষই বন্ধন, মোচন এবং সংসরণ ভাগী নহে, নানা-পুরুষাশ্রিতা প্রকৃতিরই বাস্তবিক সংসরণ, বন্ধন ও মোচন হইয়া থাকে'— "তস্মান্ন বধ্যতেঽসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ"।। সাংখ্যকারিকা, ৬২। তাই ঐ কারিকার

'মাঠরবৃত্তি'তে একথাও বলা হইয়াছে যে পুরুষের বন্ধন ও মুক্তির কথা যিনি বলেন তিনি মূঢ়'। 'প্রকৃতি পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের উদ্দেশ্যে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সপ্তরূপদ্বারা (জ্ঞান ব্যতীত) আপনাকে আপনি বন্ধন করেন এবং একরূপে অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা আপনাকেই আপনি মুক্ত করেন'—"রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ। সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ" ॥ সাংখ্যকারিকা, ৬৩)। 'পূর্ব্বে যে পুরুষের অপবর্গের কথা বলা হইয়াছে, উহা পুরুষে আরোপিত (যথার্থতঃ নহে) প্রতিবিম্বরূপ মিথ্যা দুঃখের বিয়োগ মাত্র'—"যঃ পুরুষস্যাপবর্গ উক্তঃ স প্রতিবিম্বরূপস্য মিথ্যাদুঃখস্য বিয়োগ এব"। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ১।৭২। সম্যক্ জ্ঞানাধিগমে আরোপিত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বিদূরিত হইলে পুরুষ স্বতন্ত্র, অসঙ্গ বা কেবলর ভাব প্রাপ্ত হন। ইহাই কৈবল্য বা মুক্তি।

সাংখ্যে মুক্তি দুই প্রকার মানা হইয়াছে—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগাদির কারণ হয় না, কিন্তু প্রারব্ধ সংস্কার-বলে কিছুদিন শরীরধারণ ঘটিয়া থাকে—"সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনাম-কারণতাপ্রাপ্তৌ। তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ" ॥ সাংখ্য-কারিকা, ৬৭)। এই অবস্থাটিকে জীবন্মুক্তাবস্থা কহে। প্রারব্ধ ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তখন শরীর পাত হওয়ায় ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ হয়, (দ্রষ্টব্য সাংখ্যকারিকা, ৬৮)। ইহাই মুক্তি।

সাংখ্যের ন্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বলেন যে মুক্তপুরুষ বহু। সাংখ্যমতে মুক্ত-পুরুষদিগের মধ্যে তারতম্য নাই, কিন্তু বৈষ্ণবমতে তারতম্য আছে মানা হয়। সাংখ্যমতে মুক্তের অপ্রাকৃতদেহ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু বৈষ্ণবমতে মুক্তের অপ্রাকৃত দেহমনাদি আছে। সাংখ্যের মতে মুক্ত বিভু, বৈষ্ণবমতে মুক্ত অণু। সাংখ্যমতে মুক্ত নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, বৈষ্ণবমতে মুক্ত সগুণ বা ক্রিয়াযুক্ত।

সাংখ্যের সহিত যোগের মুক্তির দার্শনিক দৃষ্টিতে কোন পার্থক্যই নাই। তথাপি একই মুক্তিকে আরও সুন্দর ভাবে বুঝিবার জন্য পাতঞ্জলযোগমতের মুক্তির বর্ণনা নিম্নে করা যাইতেছে।

পাতঞ্জলযোগমতে মুক্তি।

চিত্তের পরিণামকে বৃত্তি কহে। চিত্তের বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করার নাম যোগ।[১] এই যোগ আর সমাধি একই কথা। সমাধি দুই প্রকার। নির্ব্বিকল্প যোগ

১। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" যোগসূত্র, সমাধিপাদ, ২

বা সমাধি অবস্থায় চিত্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তখন পুরুষ স্বস্বভাবে, আপন কেবল স্বভাবে অবস্থান করেন। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে কৈবল্য বা মুক্তি কহে। স্তরে স্তরে প্রজ্ঞার বিকাশের ফলেই চিত্ত বিনষ্ট হওয়ায় মুক্তাবস্থা লাভ হয়। যে সমস্ত চরম প্রজ্ঞার ফলে চিত্ত ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় তাহা নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে। ১। দুঃখের কারণভূত সংসারকে জানিয়াছি এবং এই সংসার সম্বন্ধে জানিবার আর কিছুই নাই; ২। সংসারের মূল কারণ উৎপাটিত হইয়াছে, আর কিছুই উৎপাটন করিবার নাই; ৩। নিরোধ সমাধি দ্বারা এই উৎপাটন কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে; ৪। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান লাভ হইয়াছে। এই প্রজ্ঞা সকল লাভের পর কতকগুলি তাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে। যথা, ১। বুদ্ধির পুরুষার্থতা সম্পন্ন হয়; ২। চিত্ত বিশীর্ণ হইয়া প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয়; ৩। বুদ্ধি আপন গুণস্বভাবে পরিণত হয়। এই অবস্থাই মুক্তাবস্থা বা কৈবল্য।

মোটামুটি যোগের মতে মুক্তি কি তাহা অবগত হইয়া আরও এই অবস্থাটিকে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসকল পুরুষের (প্রতি) ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) জন্মায়। অতএব পুরুষার্থ বিরহিত কার্য্য—বুদ্ধ্যাদি ও কারণ—গুণত্রয়ের (বা মূল প্রকৃতিস্বরূপ গুণত্রয়ের) যে প্রতিলোম প্রলয় বা প্রতিপ্রসব অর্থাৎ কিনা প্রকৃতিরূপে অবস্থান তাহাকেই কৈবল্য (কেবলের ধর্ম্ম) বা মুক্তি কহে। কৈবল্যকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে প্রতিবিম্বিত না হওয়ায় পুরুষ নিজ স্বচ্ছভাবে অবস্থান করেন) কহে। চিতি শক্তিই স্বরূপ।[১] এখানে কৈবল্য শব্দে পুনরুত্থান রহিত বিদেহ কৈবল্যাবস্থাকেই বুঝায়। কৈবল্য অর্থ চিরতরে স্বরূপস্থিতি অর্থাৎ দ্রষ্টার চিরতরে স্বরূপে অবস্থান। উহাকে অসম্প্রজ্ঞাতযোগও বলা যায়। এই কৈবল্যরূপিণী চিতিশক্তি অসংহতা। সংহতাশক্তি বার বার কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এই চৈতন্য মাত্র স্বরূপিণী অসংহতা চিতিশক্তি হইতে সেইরূপ কার্য্য কখনও উৎপন্ন হয় না, তাই ইনি কেবলা।[২] ইহার কোনকালেও বদ্ধভাব ছিল না, অথবা সমাধির আশ্রয়ে ইহার মোক্ষও কোনকালে আবির্ভূত হয় নাই। ইনি বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই অতীত বস্তু। আমরা পূর্ব্বে মুক্তিকে অসম্প্রজ্ঞাতযোগাবস্থাও বলিয়াছি। অসম্প্রজ্ঞাতযোগ লাভ হইলে পুরুষ

১। "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি"। যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ৩৪

২। "চিতিশক্তিরেব কেবলা," ঐ, ব্যাসভাষ্য।

চিতিশক্তিতে (দ্রষ্টৃস্বরূপে) প্রতিষ্ঠিত হন।[১] এই অবস্থা পুরুষের আত্যন্তিক গুণবিয়োগাবস্থা অর্থাৎ তাঁহার আর কখনও গুণের সহিত সম্বন্ধ হয় না। গুণের সহিত চিরতরে বিয়োগই কৈবল্য বা মুক্তি।[২] সত্ত্বপুরুষান্যথাখ্যাতিরূপ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্তি আসিলে অবিদ্যাদি ক্লেশবীজ সমস্ত মনের সহিত বিনষ্ট হয়, তখন পুরুষের স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ মুক্তি লাভ হয়।[৩] কৈবল্যাবস্থায় অবিদ্যার অভাব হওয়ায় প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধের অভাব হয়, তাই এই অবস্থায় বন্ধনের আত্যন্তিক উপরম হয়। এই আত্যন্তিক বন্ধোপরমাবস্থাকেই কৈবল্য বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা কহে।[৪] কোন কোন জ্ঞানীর জীবদ্দশায়ই আত্মখ্যাতি স্থির ও অবিপ্লব (মিথ্যাজ্ঞানশূন্য) হইয়া থাকে। উহারা পর পর সপ্তপ্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাকে অনুভব করিয়া কুশল হন, আবার চিত্তের অত্যন্ত বিনাশ হইলেও পুরুষকে কুশল বা মুক্ত বলা হয়, কারণ তখন পুরুষ গুণাতীত হন।[৫] প্রথম প্রকার কুশলকে জীবন্মুক্ত ও দ্বিতীয় প্রকার কুশলকে বিদেহমুক্ত বলা যাইতে পারে। চিত্তের লয়ের পূর্ব্বে জীবন্মুক্তাবস্থা এবং শরীর-পাতের সাথে সাথে যখন চিত্তেরও লয় হয় তখন উহাকে বিদেহমুক্তাবস্থা কহে।[৬]

সাংখ্য ও যোগের মুক্তি বা কৈবল্যে আনন্দাভিব্যক্তি থাকে না। আনন্দ বা সুখ প্রকৃতির ধর্ম্ম। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই যখন মুক্তি, তখন প্রকৃতির ধর্ম্ম যে সুখ বা আনন্দ তাহা পুরুষে থাকিতে পারে না। পুরুষ মুক্তাবস্থায় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি স্ব-স্বরূপে কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ বা চৈতন্যময়। পুরুষের এই চৈতন্যময় অবস্থায় স্থিতির নামই মুক্তি বা কৈবল্য।

চরকোক্ত সাংখ্যমতে মুক্তি।

অনাত্মবস্তুর সহিত আত্মার সংযোগের কারণ অজ্ঞান এবং তজ্জনিত তৃষ্ণা। যেমন গুটীপোকা, মৃত্যুপ্রদ আপনার সূত্রদ্বারা আপনাকে আবেষ্টিত করে সেইরূপ আত্মা অজ্ঞানতা বশতঃ বিষয়-তৃষ্ণারূপ উপাধি গ্রহণ করে এবং

১। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"। যোগসূত্র, সমাধিপাদ, ৩

২। "পুরুষস্যাত্যন্তিকো গুণবিয়োগঃ কৈবল্যং, তদা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি," ঐ, বিভূতিপাদ, ৫০, ব্যাসভাষ্য।

৩। "তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ঐ, বিভূতিপাদ, ৫০

৪। ঐ, সাধনপাদ, ২৫

৫। ঐ, সাধনপাদ ২৭ র ব্যাসভাষ্য।

৬। "অনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশলঃ, প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশলঃ"।

তাহাতে নিত্য দুঃখী হয়। সুখ দুঃখ হইতে ইচ্ছাদ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। আবার তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ, কেননা তৃষ্ণাই বেদনার আশ্রয়ভূত ভাবসমূহকে উৎপাদন করে। যাঁহার উপার্জ্জন নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয় স্পর্শ নাই। আর স্পর্শ ব্যতীত বেদনা নাই।[১] যে জ্ঞানী বিষয় সমূহকে অগ্নিতুল্য মনে করিয়া উহাদের কবল হইতে নিবৃত্ত হন, অনারম্ভ এবং অসংযোগ হেতু তাঁহার নিকট দুঃখ থাকিতে পারে না।[২] যোগ বা সমাধিতে এবং মোক্ষে সর্ব্বপ্রকার বেদনার অবসান হয়। মোক্ষে উহাদের নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়। যোগ মোক্ষের সাধক। বিষয়ের সন্নিকর্ষই মনের প্রবৃত্তি জন্মায়। মন আত্মাতে সম্যক্ স্থিত হইলে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই নিবৃত্তি হয় এবং বশীত্ব লাভ হয় (ইন্দ্রিয়গণ স্ববশীভূত হয়)। ইহাকেই যোগবিদ্ মহর্ষিগণ সশরীরের যোগ বলিয়া থাকেন। এই যোগ দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।[৩] সহেতুক সমস্তই (জগৎ প্রপঞ্চ) দুঃখময়, এবং অনিত্য। উহারা অনাত্মা। উহারা আত্ম-কৃতও নহে। তথাপি উহাদিগেতে অহন্তামমতারূপ আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। উহারা অহং নহে, মম নহে, এই প্রকার সত্যবুদ্ধি যাবৎকাল উদয় না হয়, তাবৎকাল ঐ অহন্তামমতা বুদ্ধি থাকে। এই সমস্ত আমি নহি ও উহারা আমার নহে এইরূপ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, আত্মা সমস্তকে অতিক্রম করে। উহাই পরমসন্ন্যাস। ঐ পরমসন্ন্যাস লাভ হইলে সমস্ত বেদনা এবং সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান সমূলে (নিঃশেষে) বিনষ্ট হয়।[৪] এই অবস্থাই মুক্তাবস্থা।

চরকে আছে, সর্ব্বসন্ন্যাসী, সর্ব্বসংযোগনিঃসৃত ভূতাত্মা এক ও প্রশান্ত হয়।[৫] অনন্তর মহর্ষি আত্রেয় বলেন, ঐ অবস্থায় ভূতাত্মা বা জীব ব্রহ্মভূত হয়। তখন উহা সমস্ত ভাবসমূহ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। উহার কোন চিহ্ন থাকে না। সুতরাং তখন আর উহা উপলব্ধ হয় না। অর্থাৎ তখন উহার ব্যক্তিত্ব থাকে না; সেইহেতু ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌রূপে উহা উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মবিদের গতি ব্রহ্মই। উহা অক্ষর এবং অলক্ষণ। মুক্তজীব ব্রহ্মই হন। সেইহেতু তাহা আর পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ হয় না। ব্রহ্মবিদগণই এই তত্ত্ব

১। চরক, শারীরস্থান, ১।১৩২-৩৩

২। ঐ, ("), ১।১৯৫

৩। ঐ, ("), ১।১৩৫-৩৭

৪। ঐ, ("), ১।১৫০-৫২

৫। ঐ, "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বসন্ন্যাসী সর্ব্বসংযোগনিঃসৃতঃ। একঃ প্রশান্তো ভূতাত্মা…"॥

বুঝিতে পারেন। অপর ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারেন না।[১] মুক্তিকে তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণও বলিয়াছেন।[২]

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বেদান্তোক্ত সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মভাবের সহিত আত্রেয়োক্ত ব্রহ্মভূতভাবের কোন সম্পর্ক নাই। উহা বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের নির্ব্বাণের তুল্য সম্যক্ বিনাশ মাত্র।[৩] প্রথমে বলা উচিত যে চরক (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) নাগার্জ্জুনের (১৮১ খ্রীষ্টাব্দ) শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং নাগার্জ্জুনোক্ত নির্ব্বাণের সহিত চরকোক্ত মোক্ষ বা ব্রহ্মনির্ব্বাণের যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, নাগার্জ্জুনের মতের প্রভাব তাহাতে আছে বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। বরং বলা যাইতে পারে চরকের মত অনুসরণেই নাগার্জ্জুন নির্ব্বাণ সম্বন্ধে স্বীয় সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নাগার্জ্জুনোক্ত নির্ব্বাণের সহিত চরকোক্ত ব্রহ্মনির্ব্বাণের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। নাগার্জ্জুন, তথা সমস্ত বৌদ্ধ দার্শনিকগণই অনাত্মবাদী। তাঁহাদের মতে মুক্তির পরে কিছুই থাকে না।[৪] সেই দৃষ্টিতে তাঁহারা অশাশ্বতবাদী।[৫] অপরপক্ষে চরকোক্ত আত্রেয়দর্শন আত্মবাদী। অধিকন্তু উহাতে নৈরাত্মবাদের সাক্ষাৎভাবে নিন্দা আছে! আত্রেয় শাশ্বতবাদী। তন্মতে আত্মা শাশ্বত এবং অব্যয় বলিয়াই উহার বিনাশ হইতে পারে না।[৬] তবে মোক্ষে ভূতাত্মার উপলব্ধি হয় না। সুতরাং এইভাবে মোক্ষকে ভূতাত্মার বিনাশ বলা যাইতে পারে বটে। পরন্তু ভূতাত্মা সংযোগজ। আত্মা, মন ও অর্থের সমবায়কে চরক ভূতাত্মা বলিয়াছেন। জ্ঞান হইলে ঐ সমবায়ের বিনাশ হয়। তিনি ইহাও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে মন ও অর্থ উভয়ই তখন নিবৃত্ত হয়। সমবায়ের অঙ্গীভূত

১। অতপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃত সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে॥
গতির্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্। জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র
নাজ্ঞস্তদ্ জ্ঞাতুমর্হতি॥
চরক, (শারীরস্থান) ১।১৫৩-৪

২। ঐ, ৫।২২-২৪

৩। S. N. Dasgupta, History of Indian Philosophy, vol. 1. p. 215 (foot note).

৪। Stacherbatsky, The Conception of Buddhistic Nivana দ্রষ্টব্য।

৫। চরক, শারীরস্থান, ১।৩৭-৪৬; সূত্রস্থান, ১১।১৪-৬

৬। ঐ, "অব্যক্তাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ। অনাদিঃ পুরুষো নিত্যঃ"॥

ঐ অংশদ্বয়ের বিনাশ হয় বলিয়াই সমবায়ের বিনাশ হয়। কিন্তু তাহাতে উহার অপরাংশ আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং ভূতাত্মার বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। অপর কথায়, ভূতাত্মার বিনাশ নিঃশেষ বিনাশ নহে বা শূন্যে পর্য্যবসান নহে। কেননা, আত্মা তখনও শেষ থাকে। তাই, চরক বলিয়াছেন যে মোক্ষে ভূতাত্মা সর্ব্বসংযোগ হইতে নিঃসৃত, এক এবং প্রশান্ত হয় মাত্র। প্রশ্ন হইল, আত্মা তখন কোন লিঙ্গ দ্বারা উপলব্ধ হয়, উত্তর হইল, তখন আত্মার কোন চিহ্ন থাকে না, তাই উপলব্ধ হয় না। তখন আত্মার সদ্‌ভাব না থাকিলে, এই প্রশ্ন অসঙ্গত হয়। যদি তিনি মুক্ত আত্মার অসদ্‌ভাব মানিতেন, তবে তাহাই (ভূতাত্মার বিনাশ হয়) বলিতেন। ঐরূপ বলাই সমীচীন উত্তর হইত। পরন্তু, পক্ষান্তরে তিনি অন্যত্র অতি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন, আত্মা অনাদি, অনিধন, অক্ষয় এবং শাশ্বত।[১] সুতরাং চরকোক্ত নির্ব্বাণ বৌদ্ধ নির্ব্বাণের তুল্য নহে। উহা বেদান্তোক্ত ব্রহ্মনির্ব্বাণই। শ্রুতিতে আছে জীবভাব ভূতসঙ্গ জনিত, ভূতনাশের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বিনাশ হয়।[২] কোন কোন শ্রুতিতে এই বিষয়ে সমুদ্রগত নদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। অপর শ্রুতিতে শুদ্ধজলে নিক্ষিপ্ত শুদ্ধজলবিন্দুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। চরকোক্ত জীবের ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মভবনও (মুক্তি) ঠিক তৎতুল্যই। শ্রুতির ন্যায় তিনিও ব্রহ্ম নির্ব্বাণকে অক্ষর, অব্যয় ইত্যাদি বলিয়াছেন। তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন যে পরম পুরুষ বা পরমাত্মা চিৎস্বরূপ।[৩] উহা সৎস্বরূপ ও উহা যে আনন্দস্বরূপ তাহা তিনি সাক্ষাৎভাবে বলেন নাই।[৪] পরন্তু প্রকারান্তরে তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রবৃত্তিই দুঃখ, আর নিবৃত্তিই সুখ ইহাই সত্যজ্ঞান।[৫] আর "নিবৃত্তিরপবর্গঃ তৎপরং প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্‌ব্রহ্ম স মোক্ষঃ"।[৬] 'নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহার পর, তাহাই প্রশান্ত,

---

১। চরক, শারীরস্থান, ৩।১৪

২। "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি"। বৃহ, উ, ২।৪।১২

৩। চরক, শারীরস্থান, ১।১৪ ; সূত্রস্থান ১১।১৩ ইত্যাদি।

৪। ঐ, „ ১।৫৭

৫। "নিবৃত্তিরুপরমঃ। প্রবৃত্তির্দুঃখম্। নিবৃত্তিঃ সুখমিতি। যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎসত্যম্"। চরক, শারীরস্থান, ৫।১০

৬। ঐ, ৫।১৩ অন্যত্র আছে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা রজ এবং তম গুণ নিরাকৃত হইলে প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত আত্মার সংযোগ নিবৃত্তি হয়। (ঐ, ১।৩৪)। তাই বলা হইয়াছে নিবৃত্তি মোক্ষ।

তাহাই অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই মোক্ষ'। সুতরাং ব্রহ্ম সুখস্বরূপ। ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন বেদান্তমতেও ব্রহ্মকে বিশেষভাবে সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ মাত্র বলা হইয়া থাকে। ঐ সকল মতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াও স্বীকৃত হইয়া থাকে। তবে সকল সময় উহার বিশেষ উল্লেখ করা হয় না। সুতরাং চরকোক্ত ব্রহ্মকে বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম হইতে কিছুতেই ভিন্ন বলা যায় না। অতএব চরকোক্ত মুক্তি বেদান্তোক্ত মুক্তিরই অনুরূপ। মহর্ষি আত্রেয়োক্ত মুক্তি ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার মতের সৃষ্টি রহস্যও অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে আমরা তাঁহার মতের সৃষ্টির বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

মহর্ষি আত্রেয়ের মতে নির্গুণ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই মন উপাধি যুক্ত হইয়া সগুণ ঈশ্বর হন এবং তিনিই জীব হন। তিনিই আবার প্রধান বা অব্যক্ত হন সুতরাং জগতও বস্তুতঃ তিনিই। অন্যত্র তিনি স্পষ্ট বাক্যে সেই কথাই বলিয়াছেন। 'পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং অব্যক্তরূপী ব্রহ্ম এই ছয় ধাতুর সমবায় 'লোক' (বা জগৎ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ ছয় ধাতুরই সমবায় 'পুরুষ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে পৃথিবী সেই পুরুষের মূর্ত্তি, জল তাঁহার ক্লেদ, তেজ উষ্মা, বায়ু প্রাণ, আকাশ ছিদ্রসমূহ এবং ব্রহ্ম অন্তরাত্মা। যেমন জগতে ব্রাহ্মী বিভূতি, তেমন পুরুষে অন্তরাত্মিকী বিভূতি'।[১] ইত্যাদি। এই প্রকারে আত্রেয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে পুরুষ জগতের তুল্য।[২] এখানেও তিনি বলিয়াছেন যে অন্তরাত্মা এবং অব্যক্ত প্রকৃতি ব্রহ্মই। আকাশাদি প্রকৃতিরই বিকার। সুতরাং ব্রহ্মই জীব ও জগৎ হইয়াছেন। ইহাই আত্রেয়ের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম কি প্রকৃতই জগৎপ্রপঞ্চ রূপে পরিণত হন, না তিনি বিবর্ত্তিত হন? এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ উক্তি চরকসংহিতায় নাই। তবে তাঁহার একটা উক্তি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'স্বপ্নে যেমন নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, জীবন, মনোগতি, ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চার, প্রেরণ, ধারণ এবং দেশান্তর গতি, পঞ্চত্বগ্রহণও তদ্বৎ'।[৩] আত্রেয়োক্ত 'পঞ্চত্বগ্রহণ'

১। চরক, শারীরস্থান, ৫।৫

২। ঐ, ,, , ৫।৩

৩। ঐ, শারীরস্থান—"প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণং চ যৎ॥
দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা"। ১।৬৮

শব্দের তাৎপর্য্য কি ? টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বলেন, 'মরণ-জ্ঞান'। এই বচনের অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে আছে, "যাঁহাদিগের দ্বন্দ্বে পরাসক্তি, যাঁহারা অহন্তা-মমতা-পরায়ণ জন্মমৃত্যু (বা স্বর্গলয়) তাঁহাদিগেরই। পরন্তু যাঁহারা অন্য প্রকার অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নির্ম্মুক্ত এবং অহন্তা-মমতাবিহীন জন্মমৃত্যু তাঁহাদিগের নহে"।[১] উহার পরে পঞ্চত্বগ্রহণের প্রসঙ্গ আছে। জীবাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত শরীরে পঞ্চভূত মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেইহেতু লোক মৃত্যুকে পঞ্চত্বগমন বলে।[২] সুতরাং মনে হয়, 'পঞ্চত্বগ্রহণ' শব্দের অর্থ 'পঞ্চভূতাত্মক শরীর গ্রহণ' বা 'জন্ম'। অথবা 'গ্রহণশব্দ' উপলক্ষণ মনে করিয়া বলা যাইতে পারে যে 'পঞ্চত্বগ্রহণ' অর্থ 'জন্মমৃত্যু'। এইরূপে জানা যায় যে জীবের জন্ম কিম্বা জন্মমৃত্যু স্বপ্নের ক্রিয়াদির ন্যায়। কেহ কেহ উক্ত বচনের 'স্বপ্ন' শব্দকে কেবল 'দেশান্তরগতিঃ' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন, 'প্রাণাপানৌ' ইত্যাদি বাক্যের সহিত নহে। সুতরাং তাঁহাদের মতে ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই যে জীবের জন্মমৃত্যু বা দেহান্তরগ্রহণ স্বপ্নে দেশান্তর গমনের তুল্য। এই ব্যাখ্যাতেও আমাদের আপত্তি নাই। জীবের মুখ্যতম ঘটনা জন্মমৃত্যু স্বপ্নের ক্রিয়ার ন্যায় হইলে, অপরাপর ঘটনা সমূহও তদ্বৎ বলিতে হয়। তাহাতে পাওয়া যায় যে বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্তক্রিয়াই স্বপ্নের ক্রিয়ার ন্যায়। সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ ; অতএব মিথ্যা। মহর্ষি আত্রেয়ের মত এইরূপই মনে হয়। জীবভাব উৎপত্তি বিনাশশীল। আত্রেয় স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং জীবভাব মিথ্যা। তাই বলিতে হইবে যে আত্মা নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই। এখানে অদ্বৈত-বেদান্তের মতই স্বীকৃত হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

মহর্ষি আত্রেয়োক্ত মতে মোক্ষের স্বরূপের বিবৃতি সংক্ষেপে পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে আরও কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, যে "রজঃ ও তমঃ গুণের অভাবে এবং বলবৎ (প্রারব্ধ) কর্ম্মের সংক্ষয়ে কর্ম্মসংযোগের বিয়োগ হয়। তাহাতে অপুনর্ভব হয়। উহাই মোক্ষ"।[৩] তিনি মোক্ষলাভের উপায় সমূহও বিশদ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৪] উহাতে (চরকে) জীব ও জগতের সাম্যের আলোচনার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। সম্পূর্ণ এক অধ্যায়ে তিনি উহার

১। চরক, শারীরস্থান, ১।৬৭
২। ঐ, ,, ,১।৭২
৩। ঐ, শারীরস্থান ১।৪০
৪। ঐ, ১।১৪১—১৫১ ; ৫।১৩

উপদেশ করিয়াছেন।[১] ঐ সামান্যোপদেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "যিনি সর্ব্বলোক আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বলোকে সমানভাবে দেখেন, তাঁহার সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সর্ব্বলোককে আত্মাতে দর্শনকারীর আত্মা সুখদুঃখের কর্ত্তা হন। তাঁহার পক্ষে অন্য কর্ত্তা থাকে না। (জীব) কর্ম্মাত্মক বলিয়া (বক্ষ্যমান) হেতু প্রভৃতির দ্বারা যুক্ত হইয়া, 'সর্ব্বলোক আমিই' ইহা জানিয়া মোক্ষলাভের জন্য প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে। এস্থলে 'লোক'শব্দ সংযোগাপেক্ষী। ষড়্‌ধাতুসমুদায়ই সামান্যতঃ সর্ব্বলোক। (অর্থাৎ 'লোক'শব্দ এখানে জীব ও জগৎ উভয়কেই বুঝায়)। উহার হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব এবং বিয়োগ আছে। তন্মধ্যে 'হেতু' উৎপত্তির কারণ। 'উৎপত্তি' অর্থ জন্ম। 'বৃদ্ধি' অর্থ আপ্যায়ন (বা পুষ্টি)। 'উপপ্লব' অর্থ দুঃখাগম। ষড়ধাতুর বিভাগই 'বিয়োগ'। ঐ বিয়োগই জীবাপগম, উহাই প্রাণনিরোধ, উহাই ভঙ্গ এবং উহাই লোকের স্বভাব। জীবাপগমের, তথা সমস্ত সুখদুঃখের মূল প্রবৃত্তি। নিবৃত্তিতে (উহাদের) উপরম হয়। প্রবৃত্তি দুঃখ, আর নিবৃত্তি সুখ। ইহাই সত্যজ্ঞান। সর্ব্বলোকের সামান্যজ্ঞান সত্যজ্ঞান লাভের কারণ। সামান্য উপদেশের প্রয়োজন ইহাই"।[২] তিনি বলিয়াছেন, সত্যজ্ঞান দ্বারা অতিবল মহামোহময় অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। তদ্দ্বারা সর্ব্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং তাহাতে লোক সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হয়। তদ্দ্বারা যোগ সিদ্ধ হয় এবং সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তদ্দ্বারা লোক অহঙ্কার গ্রস্ত হয় না এবং সুখদুঃখের কারণের অনুসরণ করে না। তদ্দ্বারা জীব নিত্য, অজর, শান্ত এবং অব্যয় ব্রহ্ম হয়।[৩] ইহাই চরকোক্ত মুক্তি। "যিনি সর্ব্বলোকে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বলোককে দেখেন, সেই পরাবর দ্রষ্টার জ্ঞানমূলক শান্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। যিনি সমস্ত অবস্থায় এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুকে (ব্রহ্মরূপে) দেখেন, ব্রহ্মভূত শুদ্ধ তাঁহার (অপর কিছুরই সহিত) সংযোগ উৎপন্ন হয় না। করণ সমূহের অভাব হেতু তখন আত্মার কোন লিঙ্গ থাকে না। তাই তাঁহার উপলব্ধি হয় না। সর্ব্বকরণের বিয়োগহেতু তাঁহাকে তখন মুক্ত বলা হয়। বিপাপ, বিরজঃ, শান্ত, পর, অক্ষর, অব্যয়, অমৃত এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণ এই সকল পর্য্যায় শব্দদ্বারা শান্তি বা মোক্ষ অভিহিত হইয়া থাকে"।[৪] বিপাপ প্রভৃতি সংজ্ঞা হইতে

১। চরক, শারীরস্থান, ৫ম অধ্যায়।
২। ঐ, শারীরস্থান, ৪।৯-১০
৩। ঐ, শারীরস্থান, ৫।১৭-২০
৪। ঐ, ৫।২১—৪

আত্রেয়াভিমত মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মোট কথা, দেখা গেল আত্রেয়োক্ত মুক্তি অদ্বৈতবেদান্তের অনুরূপই।

মহাভারতোক্ত সাংখ্যমতে মুক্তি।

পঞ্চশিখ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমাহার ক্ষেত্র বা লিঙ্গদেহ নামে খ্যাত। উহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ হয়। সেইহেতু আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।[১] জাগ্রত ও স্বপ্নে ঐ সম্বন্ধহেতু আত্মা সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ঐ সমাহার অটুট থাকে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার সম্বন্ধ সহসা বিচ্ছিন্ন হয়। সেই জন্য তখন সংজ্ঞা (ইন্দ্রিয়জ বিশেষ বিজ্ঞান) থাকে না। কিন্তু ঐ বিচ্ছেদ অধ্রুব অর্থাৎ অল্পকাল স্থায়ী এবং এই দেহাভ্যন্তরেই হইয়া থাকে। বিদ্বান্‌গণ উহাকে তামস বলেন। শ্রুতি প্রদর্শিত মার্গে লভ্য মোক্ষে ঐ সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়। তাই তখন ইন্দ্রিয়জ সংজ্ঞা থাকে না, কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ বোধ হয় না। সেই কারণে উহাকে সুষুপ্তির ন্যায় অব্যক্ত এবং অনৃততম মনে করা ঠিক হইবে না। কেননা, সুষুপ্তিতে দেহেন্দ্রিয় সমাহার এবং 'স্বকর্ম্মপ্রত্যয়গুণ' বর্ত্তমান থাকে। তাই উহা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। মোক্ষে উহাদের সম্যক্ নিবৃত্তি হয়।[২] সুতরাং তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। "(প্রকৃত তত্ত্ব) এই প্রকার হওয়াতে, (অনাদি অবিদ্যাকামকর্ম্ম) হেতুতঃ সর্ব্বভূতগণ মধ্যে স্বভাবতঃ (সত্যানৃত ও আত্মানাত্মার মিথুনীকরণ বশতঃ সংঘাতরূপে ব্যবহারিক স্থিতিতে) বর্ত্তমান জীবের উচ্ছেদ বা শাশ্বত (স্থিতি) কি এবং কি প্রকারে হইতে পারে? যেমন (ক্ষুদ্র) নদীসমূহ (বৃহৎ) নদে পড়িয়া আপন আপন ব্যক্তিত্ব বা রূপ ও নাম পরিত্যাগ করে এবং নদসমূহ আবার সমুদ্রে পড়িয়া স্ব স্ব রূপ ও নাম পরিত্যাগ করে, সত্ত্বের সংক্ষয়ও ঠিক সেই প্রকার (অর্থাৎ স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহে লয় পায় এবং সূক্ষ্মদেহের প্রত্যেক উপাদান উহার কারণে লয় পায়)। তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। সুতরাং সংঘাতরূপ জীবের বিনাশ হয়"।[৩] এই প্রকারে মোক্ষে জীব পরমাত্মায় প্রত্যাগমন করতঃ

১। মহাভারত, ১২।২১৯।১৭-৯ আচার্য্যশঙ্কর এইমত খণ্ডন করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য বৃহ, উ, ৩।২ র শঙ্কর ভাষ্য।

২। মহাভরত, ১২।২১৯।৩৫-৮

৩। পঞ্চশিখ বারম্বার বলিয়াছেন যে মুক্ত অলিঙ্গ হয়। দ্রষ্টব্য ঐ, ১২।২১৯।৪৫ ও ৪৯

সম্যক্ রূপে মিলিত হয় এবং সর্ব্বতঃ (সর্ব্ব প্রকারে পরমাত্মা কর্ত্তৃক) পরিগৃহীত হয়। সুতরাং তখন সংজ্ঞা (ব্যক্তিত্ববোধ) কি প্রকারে থাকিবে।[১]

অনন্তর পঞ্চশিখ বলেন যে, যাঁহারা শ্রুতির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং তন্নির্দ্দেশিত মোক্ষমার্গে সাধনকরতঃ তত্ত্বোপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের পাপপুণ্য বিনষ্ট হয়, সুতরাং তজ্জনিত সুখদুঃখাদিফলভোগ নিবৃত্তি হয় এবং জন্মমৃত্যুভয় বিদূরিত হয়। সুতরাং তাঁহারা অভয়প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়া হৃদয়গুহাভ্যন্তরস্থ অলেপ আকাশকে অবলম্বন করতঃ সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে অলিঙ্গকে (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে) নিশ্চয়ই দর্শন করেন।[২] এই ব্রহ্মদর্শন আর মুক্তি একই কথা। রেশমকীট আপন তন্তুদ্বারা আপনাকে চতুর্দ্দিকে আবেষ্টন করতঃ অবরুদ্ধ হয় এবং পরে ঐ অবরোধ ভিন্ন করিয়া নিবৃত্ত হয়, জীবাত্মাও সেইপ্রকার আপনাকে বন্ধন গ্রস্ত করে এবং পুনঃ যথোপযুক্ত সাধনদ্বারা ঐ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। পাথরে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয়, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গদেহও সেই প্রকারে বিনাশ হয়। সুতরাং তখন জীবাত্মা সমস্ত দুঃখ পরিত্যাগ করে।[৩] এই সর্ব্বদুঃখরহিতাবস্থাকেই মুক্তি কহে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে সহজে জানা যায় যে, আচার্য্য আসুরির ন্যায় আচার্য্য পঞ্চশিখও ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম অলিঙ্গ বা নির্ব্বিশেষ, অনাদি অবিদ্যাকামকর্ম্মহেতু লিঙ্গদেহ স্বীকার পূর্ব্বক জীব সাজিয়া মোহ গ্রস্ত হইয়া উহা নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে। শ্রুতিপ্রদর্শিত মার্গে সাধনকরতঃ জীব ব্রহ্মকে দর্শন করে এবং অলিঙ্গ হইয়া মুক্ত হয়। তাই মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। সমুদ্রে নিপতিত নদ এবং পাথরে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের দ্বারা তিনি উহা বিশদ্ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, "আস্থিতো যুগপদ্ভাবো ব্যবহারঃ স লৌকিকঃ"।[৪] '(লিঙ্গ দেহের সহিত আত্মার যে) যুগপদ্ভাব আছে বলা হয় তাহা লৌকিক ব্যবহার মাত্র'। পারমার্থিক নহে। অপর কথায়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলা হয় যে আত্মা লিঙ্গদেহ সম্পর্কে জীব সাজিয়াছে, পরন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা বস্তুতঃ লিঙ্গদেহ স্বীকার করে নাই, অতএব জীব হয় নাই। তাই, তাঁহার মতে, আত্মার জীবভবন "অবিশ্বাসনীয়; বিনাশী, চঞ্চল এবং

১। মহাভারত, ১২।২১৯।৪১-৩
২। ঐ, ১২।২১৯।৪৬
৩। ঐ, ১২ ২১৯।৪৭
৪। ঐ, ১১।২১৯।৩৫

অধ্রুব মোহ"মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে ঐ মোহ বিনষ্ট হইলে জীবভাব যে থাকিবে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কথিত হইয়াছে যে, মহামুনি পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ঐ অমৃত-মোক্ষ সিদ্ধান্ত ("অমৃতপদং" মোক্ষ নিশ্চয়) অবগত হইয়া রাজা জনদেব জনক সর্ব্বত্র এমন অনাসক্ত হইয়াছিলেন যে স্বীয় রাজধানী মিথিলানগরীকে অগ্নিদগ্ধ হইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ন খলু মম হি দহ্যতেঽত্র কিঞ্চিৎ", অর্থাৎ ইহাতে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। তিনি বীতশোক ও পরমসুখী হইয়াছিলেন। অপর যিনিও উহা অবগত হইবেন, তিনি সেই প্রকারের উপদ্রব দ্বারা ব্যথিত হইবেন না এবং দুঃখরহিত হইয়া মুক্ত হইবেন।[১]

মহাভারতে কপিলোক্ত সাংখ্যমতে মুক্তি।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে "কপিলাদি সমস্ত ঈশ্বর যতিগণ কর্ত্তৃক বিহিত" সাংখ্যমত ব্যাখ্যা করেন।[২] সাংখ্যজ্ঞানী জানেন যে পৃথ্বী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বস্তু উহার কারণে আশ্রিত। 'তথা (জীব) আত্মা ঈশ্বর দেব নারায়ণে সক্ত, আর দেব (নারায়ণ) মোক্ষে সংসক্ত। পরন্তু মোক্ষ কোথাও সক্ত নহে'।[৩] নারায়ণ ঈশ্বর, সুতরাং সগুণ ও সবিকল্প ; আর মোক্ষ নির্গুণ ও নির্ব্বিকল্প। "কাপিলসাংখ্যতত্ত্বজ্ঞানিগণ" জানেন যে এই জগৎ জলের ফেনের ন্যায়, বিষ্ণুর শত শত মায়া দ্বারা আবৃত, ভিত্তিস্থ চিত্র সদৃশ, নলসার (অর্থাৎ নলের ন্যায় নিঃসার), অনর্থক, অন্ধকারস্থ গর্ত্তের ন্যায় (ভীষণ), বর্ষাবুদ্বুদের ন্যায় (ক্ষণস্থায়ী), বিনশ্বর, সুখরহিত এবং ধ্বংসোন্মুখ। (লোক) অবশ (হইয়া) ইহাতে রহিয়াছে"।[৪] মোক্ষের পথে সাংখ্যজ্ঞানীর গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ভীষ্ম বলেন, তিনি দেহত্যাগ করতঃ আকাশে সূর্য্যাদি ক্রমে সত্ত্বে গমন করেন। অনন্তর 'সত্ত্বগুণ (তাঁহাকে) শুদ্ধাত্মা প্রভুপরম নারায়ণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায় এবং শুদ্ধাত্মা প্রভুনারায়ণ নিজে পরমাত্মার নিকট লইয়া যান। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অমল (সাংখ্যজ্ঞানিগণ) অদ্ভুতায়তন (অর্থাৎ তৎস্বরূপ) হইয়া

১। মহাভারত, ১২।২১৯।৫০-২

২। ঐ, ১২।৩০১।৩

৩। ঐ, ১২।৩০১।২৩

৪। ঐ, ১২।৩০১।৫৯-৬০

অমৃতত্ব লাভ করেন। 'হে বিভু! তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। হে পার্থ! নির্দ্বন্দ্ব মহাত্মাদিগের ইহাই পরমাগতি বা মুক্তি'।[১] মোক্ষে আত্মা তত্তৎগুণসমূহ সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ এবং উহাদের কারণ 'প্রকৃতিকেও অতিক্রম করতঃ প্রকৃতির পর নির্দ্বন্দ্ব অব্যয় আত্মা পরম নারায়ণাত্মার নিকট গমন করেন'।[২] অনন্তর পাপপুণ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অনাময় ও নির্গুণ পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। 'হে ভারত! (তথা হইতে উহা আর) নিবর্ত্তিত হয় না'।[৩] ইহাই মুক্তি। 'হে ভারত! যদি প্রারব্ধ বশতঃ তাঁহার (নির্ব্বিকল্পসমাধিতে) মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ অবশিষ্ট থাকে, তবে (জীব) যথাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করে (অর্থাৎ জীবের ব্যুত্থান হয়)। এবং গুরুর (অর্থাৎ পরমগুরু নারায়ণের) আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করেন (অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারিণী ঈশ্বর প্রেরণা বশতঃ কর্ম্ম করেন)। পরন্তু হে কৌন্তেয়! মুমুক্ষু এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত যথার্থ জ্ঞানদ্বারা গুণার্থী (মোক্ষগুণার্থী বা প্রাকৃতগুণত্যাগার্থী) হইয়া, অল্পকালের মধ্যে (দেহপাত হইলে) পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন'।[৪] এইখানে প্রথমে জীবন্মুক্তি পরে বিদেহমুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্তর ভীষ্ম বলেন, হে রাজন! মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যগণ পরমাগতি প্রাপ্ত হন। হে কৌন্তেয়! এই (সাংখ্য) জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই। ইহাতে তোমার যেন সংশয় না হয়। সাংখ্য-জ্ঞানকেই পরজ্ঞান মনে করা হয়। "অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্"। 'উহাকে ধ্রুব, অক্ষর এবং সনাতন পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়'।[৫] "মণীষিগণ তাঁহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, কূটস্থ, নিত্য, নির্দ্বন্দ্ব ও শাশ্বত কর্ত্তা বলেন।" অধুনা প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে ভীষ্মোক্ত সাংখ্যমতের বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাই টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ভীষ্মোক্ত 'সাংখ্য' নামের অর্থ 'ঐকাত্ম্যজ্ঞান'ই, কপিলের 'ষষ্টিতন্ত্রে' প্রপঞ্চিত সাংখ্যমত নহে।[৬]

১। "………পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্"॥ মহাভারত, ১২।৩০১।৭৭-৭৯

২। ঐ , ১২।৩০১।৯৬

৩। "বিমুক্তঃ পুণ্যপাপেভ্যঃ প্রবিষ্টস্তমনাময়ম্। পরমাত্মানমগুণং ন নিবর্ত্তিত ভারত"। ঐ, ১২।৩০১।৯৭

৪। ঐ, ১২।৩০১।৯৮-৯

৫। ঐ, ১২।৩০১।১০০—১০১

৬। ঐ, ১২।৩০১।২ শ্লোকের নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

"অপাং ফেনোপমং লোকং" (১২।৩০১।৫৯-৬১) ইত্যাদি বচনে জগতের অসত্যত্ব এবং মুক্তের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব প্রতিপাদিত হওয়াতে সিদ্ধ হয় যে উহা অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানই।

মহর্ষি বশিষ্ঠ মিথিলার রাজা করাল জনককে সাংখ্যতত্ত্ব, তথা যোগতত্ত্ব উপদেশ করেন। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সাংখ্য ও যোগ মতের আচার্য্যগণের মোক্ষতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পরন্তু যখন এই (বদ্ধপুরুষ বা জীব) এই গুণসমূহকে প্রকৃতিরই (আপনার নহে) বলিয়া অবগত হয়, তখন সে গুণসমূহকে পরিত্যাগ করতঃ ঐ পর (স্বরূপকে) দর্শন করে। সাংখ্য-যোগিগণ, তথা অপর সকলেও, যাহাকে বুদ্ধির পর বলেন,[১] যাহাকে বুধ্যমান এবং অবুদ্ধপরিবর্জ্জন (জড়াহংকারাদি ত্যাগ) হেতু মহাপ্রাজ্ঞ বলেন, যাহাকে প্রকৃতি ও গুণসমূহের (অপেক্ষায়) পঞ্চবিংশতম বলেন, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে কুশল এবং পরতত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদ্বান্‌গণ সেই সকল অবগত হন। (বাল্যাদি এবং জাগ্রদাদি) অবস্থা এবং জন্মমৃত্যু ভয়ে ভীত প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ যখন অব্যক্ত এবং বুধ্যমানকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, তখন সমত্ব লাভ করেন"।[২] জীব ও ব্রহ্মের ঐ সমত্ব বা একত্বই (অর্থাৎ অভেদ) জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সম্যগ্‌দর্শন (নিদর্শন = নিশ্চিতদর্শন), এবং অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসম্যগ্‌দর্শন (অনিদর্শন = অনিশ্চিতদর্শন)। পক্ষান্তরে জীব ও ব্রহ্মের অসমত্ব বা অনৈক্য (অর্থাৎ ভেদ) দর্শনই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসম্যগ্‌দর্শন (অনিদর্শন = অনিশ্চিতদর্শন) এবং অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাম্যগ্‌দর্শন (নিদর্শন = নিশ্চিতদর্শন)। এইরূপে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন।[৩] "একত্বকে অক্ষর এবং নানাত্বকে ক্ষর বলা হয়। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নিষ্ঠ এই জীব যখন সম্যক্ (দর্শনে) প্রবৃত্ত হয় (অর্থাৎ তত্ত্বোপলব্ধিকরে), তখন একত্বই তাহার দর্শন এবং নানাত্ব অদর্শন হয়।[৪] অত্রোক্ত একত্ব ও নানত্ব, ক্ষর এবং অক্ষর, বুদ্ধ বা প্রবুদ্ধ, অবুদ্ধ বা অপ্রবুদ্ধ বা অপ্রতিবুদ্ধ ও বুধ্যমান, প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রকৃতার্থ জনকের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাহা ক্রমে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব। "হে অরিন্দম! যাহারা একমতি (বা একত্বদর্শী)

১। দ্রষ্টব্য গীতা, ৩।৪২ ও মহাভারত, ১২।৩০৫।৩১

২। "..... গময়ন্তি সমং তদা" ॥ মহাভারত, ১২।৩০৫।৩০-৩৪

৩। "এতন্নিদর্শনং সম্যগসম্যগনিদর্শনম্।
বুধ্যমানাপ্রবুদ্ধানাং পৃথক্ পৃথগরিন্দম" ॥ ঐ ১২।৩০৫।৩৫

৪। ঐ, ১২।৩০৫।৩৬-৩৭

নহে, (পরন্তু নানাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে) দর্শন করে, তাহাদিগের সম্যক্ দর্শন নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত (জগতকে) প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা ঐ সমস্ত তত্ত্ব জানে, সর্ব্বের (জগতের) জ্ঞান হেতু (সমস্ত জগতের তত্ত্বোপলব্ধিহেতু) তাহারা ব্যক্ত (জগতের) বশীভূত হয় না। সর্ব্ব অব্যক্ত বলিয়া এবং অসর্ব্ব পঞ্চবিংশক বলিয়া কথিত হয়। যাহারা ইহা জানে তাহারা অভয় হয়"।[১] আমরা এই অভয়প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়া আসিয়াছি। এই রূপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া, প্রকৃতিকে পরিবর্জ্জন করতঃ বিশুদ্ধ হন। 'এই জীব তখন তত্ত্বতা (আরোপশূন্যতা বা অধ্যাসহীনতা) প্রাপ্ত হয়, মিশ্রতা (অধ্যস্ততা) প্রাপ্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র! ইহা নিশ্চিত যে প্রকৃতির সহিত (সম্বন্ধ-বশতই) পুরুষ মিশ্র এবং অন্য (অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন) বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্তু জীব যখন প্রকৃতি ও উহার গুণজালকে ঘৃণা করে, তখন পরম পশ্য (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে) দর্শন করে, এবং তাঁহাকে (একবার) দর্শন করিলে, আর পরিত্যাগ করে না'।[২] ব্রহ্মকে অপরিত্যাগে লাভ করাই মুক্তি। জ্ঞানোদয়ে জীব বুঝিতে পারে যে অজ্ঞানতা বশতঃ ("অবিজ্ঞানাৎ," "অজ্ঞানাৎ") মোহগ্রস্ত হইয়া ("মোহাৎ") প্রকৃতির অনুসরণ করতঃ সে এতকাল নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে।[৩] 'ইনিই (পরমাত্মাই) আমার বন্ধু এবং ইহাঁর সহিত (বন্ধুতা করিতে) আমার সামর্থ্য আছে। আমি যাহাই কিছু হই না কেন, আমি ইহাঁর সহিত সাম্য বা একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাঁর সহিতই আমার তুল্যতা দেখিতেছি। আমি নিশ্চই ইহাঁর সদৃশ। ইনি বিমল। আমিও ঈদৃশ।[৪] পরিশেষে বশিষ্ঠ বলেন, এই প্রকারে পরমসংবোধ হেতু অনুবুদ্ধবান্ (জীব) পঞ্চবিংশ ক্ষরকে পরিত্যাগ করতঃ অনাময় অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়। পুরুষ (বস্তুতঃ) অব্যক্ত হইয়া ব্যক্তধর্ম্মী এবং নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইয়াছিল। হে মৈথিল! পরম নির্গুণকে দর্শন করতঃ সে তাদৃশই হয়।[৫] এই তাদৃশতা প্রাপ্তিই মুক্তি।

জীব স্বরূপতঃ অচ্যুত এবং জীব ও ব্রহ্ম এক। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত এই জীবতত্ত্ব শুনিয়া গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর মনে বড় সংশয় উপস্থিত হয়। তাই

১। "……ন ভয়ং তেষু বিদ্যতে"॥ মহাভারত, ১২।৩০৬।৪৮-৫০
২। ঐ, ১২।৩০৭।২৩-২৫
৩। ঐ, ১২।৩০৭।২৬
৪। "……অয়ং হি বিমলোঽ ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা"॥ ঐ, ১২।৩০৭।২৭-২৮
৫। ঐ, ১২।৩০৭।৪০-৪১

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, উহা সত্য কি সত্য নহে। তিনি পূর্ব্বে অনেক আচার্য্যের নিকট সেই কথা সম্যক্ শুনিয়াছিলেন। তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করার হেতু এই যে তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) কৃৎস্ন সাংখ্যজ্ঞান এবং যোগশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, এবং অধিকন্তু তিনি শ্রুতিনিধি এবং প্রবুদ্ধ, তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাহা হউক, বিশ্বাবসুর সংশয়ের হেতু এই প্রকার মনে হয়, জীব যদি সত্যই অচ্যুত হয়, তবে সে নিত্য আপনস্বরূপে স্থিত আছে বলিতে হইবে। সুতরাং হয় সে নিত্য মুক্ত, অথবা নিত্য বদ্ধ। জীবের জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রত্যক্ষ। অতএব উহাকে নিত্যমুক্ত বলা যায় না। আর যদি জীব নিত্য বদ্ধ হয়, উহার জন্মাদি দুঃখ যদি নিত্য হয়, তবে উহার মুক্তি কখনই হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষশাস্ত্র নিরর্থক হয়। আবার জীব যদি নিত্য হয়, তবে উহাকে ও ব্রহ্মকে এক বলা যায় না। আর জীব যদি বস্তুতঃ ব্রহ্মই হয় এবং নিত্য ঐ রূপেই থাকে, তবে উহার জন্মাদি দুঃখ কি প্রকারে হইল ? জীব ও ব্রহ্মকে নিত্য এক মানিলে বলিতে হয় যে ব্রহ্মই দুঃখগ্রস্ত হইয়াছেন। এই সমস্তই অতীব দুর্ব্বোধ। তাই বিশ্বাবসুর মনে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন "যদা স কেবলীভূতঃ ষড়বিংশমনুপশ্যতি। তদা স সর্ব্ববিদ্ বিদ্বান্ ন পুনর্জ্জন্ম বিন্দতি"।[১] 'যখন সেই (জীব) ষড়বিংশকে দর্শন করিয়া কেবলীভূত হন, তখন সেই সর্ব্ববিদ্ বিদ্বান্ জীব আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না'। জীব যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত আপন একত্ব উপলব্ধি না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে কালের কবলে নিমগ্ন থাকে। আর একত্ব বোধ যুক্ত হইলে সে কালের কবল হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে অর্থাৎ মুক্ত হয়। যখন দ্বিজ বুঝিতে পারে যে আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তখন সে কেবল হইয়া ব্রহ্মকে দর্শন করে।[২] এই কেবল-ভাবকেই মুক্তি বলা হইয়াছে। হে রাজন! (ব্যবহারতঃ) পরব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন ভিন্ন। (পরন্তু) তৎস্থান হেতু (অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত, অথবা যেহেতু ব্রহ্ম জীবের অধিষ্ঠান* সেইহেতু) সাধুগণ মনে করেন যে উভয়ে নিশ্চয়ই এক।[৩] গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর সহিত তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত সংবাদ বর্ণনার পর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উপসংহারে রাজা দৈবরাতি জনককে বলেন, যে

১। মহাভারত, ১২।৩১৮।৮০

২। ঐ, ১২।৩১৮।৭৬-৭

৩। "......এক এবেতি সাধবঃ"॥ ঐ, ১২।৩১৮।৭৮

*টীকাকার নীলকণ্ঠ মূলের তাৎপর্য্য বুঝাইতে রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

সকল সাংখ্যা সাংখ্য ধর্ম্মেরত, তথা যে সকল যোগী যোগধর্ম্মে রত এবং অপর যে সকল মোক্ষকামী মনুষ্য (অপর ধর্ম্মে রত), এই দর্শন তাঁহাদের সকলেরই জ্ঞানদৃষ্ট।[১] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রদত্ত সাংখ্যমত পর্য্যালোচনা করিলে দুই প্রকার সাংখ্যমতের সদ্‌ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উহাদের উভয়ত্র সমভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরন্তু একমতে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ হইতে পরম (শ্রেষ্ঠ) কোন তত্ত্বের সদ্‌ভাব স্বীকৃত হয় না, আর অপর মতে ষড়বিংশতিতম তত্ত্ব ব্রহ্মের সদ্‌ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্ব্বাচীন সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় প্রথমটিকে নিরীশ্বর সাংখ্যমত এবং শেষোক্তটিকে সেশ্বরসাংখ্যমত বলা যায়। অব্যক্তের কাল, সংখ্যা, প্রলয় এবং অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব বিভাগ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তৎ সমস্তই ঈশ্বরবাদানুগত দেখা যায়। সুতরাং ঐসকল সেশ্বরসাংখ্য মতানুযায়ী বলিতে হইবে। পুরুষের সংখ্যা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন। একমতে, অব্যক্ত এক এবং পুরুষ নানা। অপর মতে, অব্যক্তও এক এবং পুরুষ এক। প্রকৃতি বিকৃত হইয়া বহু শরীর উৎপন্ন করে এবং উহাদিগেতে উপহিত হইয়া এক পুরুষ বহু হয়। অপর কথায় পুরুষ ব্যবহারতঃ নানা, বস্তুতঃ এক। এই একপুরুষবাদ ব্রহ্মবাদী সাংখ্যগণেরই মনে হয়। কেন না, তন্মতে ষড়বিংশতম ব্রহ্ম এবং পঞ্চবিংশতম পুরুষ বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। যাজ্ঞবল্ক্য এই জীব-ব্রহ্মাঐক্যবাদের প্রশংসা করিয়াছেন; কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে উহা সমস্ত সাধুগণের সম্মত। পক্ষান্তরে যাঁহারা ব্রহ্মে সদ্‌ভাব স্বীকার করেন না, সেই সকল সাংখ্যবাদিগণকে তিনি এই বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন যে তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। ব্রহ্মবাদী সাংখ্যগণের মতে মুক্তি এক পরমনির্বিশেষাদ্বৈতাবস্থা, উহাতে ভেদত্রিপুটি (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা) থাকে না।

যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবত্ববোধ ও জগদ্‌জ্ঞান থাকে না, ব্রহ্মজ্ঞানী জীব অনন্য হয়। সুতরাং এইপ্রকারে জ্ঞাননাশ্য বলিয়া জীব ও জগতকে মিথ্যা বলা যায়। পরন্তু অজ্ঞানদশায় যে জগৎ অবাস্তব মায়া মাত্র যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলেন নাই। তিনি প্রকৃতিকে বলেন অবেদ্য এবং পুরুষকে বেদ্য। খুব সম্ভব মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় তিনিও

১। মহাভারত, ১২।৩১৮।৮৬

অব্যক্তকে অবিদ্যা এবং পুরুষকে বিদ্যা মনে করিতেন।[১] পরন্তু তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। তবে কথিত হইয়াছে যে তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়া রাজা দৈবরাতি জনক রাজ্য ত্যাগ করতঃ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং সম্পূর্ণ সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন।[২] তিনি বুঝিতে পারেন যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সত্যাসত্য এবং জন্মমৃত্যু সমস্তই প্রাকৃত, এবং সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চই ব্যক্তাব্যক্তের (ব্যক্তং বুদ্ধ্যাদি, অব্যক্তং অজ্ঞানং) কর্ম্ম।[৩] তাই সেগুলি পরিত্যাগ করতঃ ("পরিগর্হয়ন্") তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি অনন্ত, নিত্য এবং কেবল।[৪] এই অনুভূতিই মুক্তি।

১। মহাভারত, ১২।৩০৮।২

২। ঐ, ১২।৩১৮।৯৭-৮

৩। ঐ, ১২।৩১৮।৯৯-১০০

৪। ঐ, ১২।৩১৮।৯৮-৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ন্যায়বৈশেষিকমতে মুক্তি।

"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ"।[১] অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ সর্ব্ববিধ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগই মুক্তি বা অপবর্গ। শাস্ত্রে জন্মকেই দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জন্ম হইলেই শরীর ধারণ করিতে হয়। তাই শরীরকেও দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে—"জন্মনেতি। অনেন জায়মানা দুঃখশব্দেন সর্ব্বে শরীরাদয় উচ্যন্তে ইত্যুক্তং ভবতি," ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা (১।১।২২ ন্যায়সূত্রের উপর,) পৃঃ ২৩৮। সেই জন্মরূপ দুঃখের অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্ব্ব দুঃখের অত্যন্তবিয়োগকেই অপবর্গ বলা হইয়াছে।[২] এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জন্মরূপ দুঃখের অত্যন্ত-বিয়োগ কি? উত্তরে ভাষ্যকার বাৎসায়ণ বলিয়াছেন, গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্ম পুনরায় অগ্রহণকেই জন্মরূপ দুঃখের অত্যন্তবিয়োগ বলা হয়। আত্মার শরীরাদি সর্ব্ব দুঃখশূন্য স্বরূপাবস্থানকেই অপবর্গবিদগণ অপবর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্তাবস্থায় আত্মার নব বিশেষ গুণ, যথা, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও সংস্কার প্রভৃতির উচ্ছেদ হয়[৩] এবং আত্মা তখন গুণ শূন্য হওয়ায় স্বরূপে অবস্থান করে। "স্বরূপৈক প্রতিষ্ঠানঃ পরিত্যক্তোঽখিলৈগু ণৈঃ"। (ন্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ৭৭, অপবর্গ প্রকরণ)। যতক্ষণ বাসনাদি আত্মগুণ সকল বিনাশ প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, "যাবদাত্মগুণাঃ সর্ব্বে নোচ্ছিন্না বাসনাদয়ঃ। তাবদাত্যন্তিকী দুঃখব্যাবৃত্তির্ণাব কল্পতে"। (ন্যায়মঞ্জরী, অপবর্গ প্রকরণ)। বৈশেষিকদর্শনেও মুক্তিসম্বন্ধে এইরূপ মতই সমর্থিত হইয়াছে। মহর্ষি কনাদ বলেন, 'অদৃষ্টজ শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধই সংসার, এবং উহার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদই মুক্তি'। (দ্রষ্টব্য বৈশেষিক সূত্র, ৫।২।১৮)। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ণ অপবর্গকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ও ক্ষেমপ্রাপ্তি সংজ্ঞার দ্বারাও বর্ণনা করিয়াছেন।[৪]

১। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২

২। ঐ, ১।১।২২ র বাৎসায়ণ ভাষ্য।

৩। "বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারাণাং নির্মূলোচ্ছেদোঽপবর্গঃ। ন্যায়মঞ্জরী, অপবর্গ প্রকরণ।

৪। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২ র বাৎসায়ণ ভাষ্য।

অপবর্গকে শুধু আত্যন্তিক দুঃখবিমুক্তিরূপ অবস্থা বলায় কেহ কেহ মনে করেন মুক্তিতে নিত্যসুখেরও অভাব হয়। কারণ তাহা না হইলে মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি আছে ইহাও বলা হইত। আবার কেহ কেহ মনে করেন মুক্তিতে নিত্যসুখের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসায়ণ মনে করেন যে, মোক্ষে আত্মার নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমান নাই, অনুমান প্রমান নাই, ও আগম প্রমানও মিলে না।[১] যদি মুক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক সুখের উপলব্ধি হয় এইরূপ অর্থের প্রতিপাদক কোন আগম প্রমান মেলে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে "সুখ" শব্দ আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি মোক্ষে সুখাভিলাষের পরিত্যাগ না হয়, তবে মোক্ষেও বন্ধন আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সুখের প্রতি অনুরাগ বন্ধন বলিয়াই জ্ঞাত।[২]

মোক্ষে আনন্দানুভূতি থাকে কি থাকে না তাহা বর্ত্তমান ন্যায়সূত্র হইতে কিছুই স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বাৎসায়ণ প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ মোক্ষে সুখানুভূতির বিরুদ্ধবাদী। মাধবাচার্য্যের 'সংক্ষেপশঙ্করজয়' গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন এক নৈয়ায়িক গর্ব্বের সহিত আচার্য্য শঙ্করকে কণাদের মুক্তি হইতে গৌতমের মুক্তির পার্থক্য কি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, 'কণাদের মতে আত্মার গুণসম্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশে আকাশের ন্যায় স্থিতিকেই মোক্ষ বলে, আর গৌতমের মতে মোক্ষ অবস্থায় আনন্দসম্বিৎ থাকে'—"অত্যন্তনাশে গুণসংগতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে। মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসম্বিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ"। (দ্রষ্টব্য সংক্ষেপশঙ্করজয়, ৬।৬৮।৬৯)। এখানে বৈশেষিকদর্শনের মুক্তির সহিত ন্যায়মতের মুক্তির কিছু পৃথকত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উভয়ের মতে মুক্তিতে যে কোন ভেদ আছে তাহা দৃষ্ট হয় না। শঙ্কর যে কণাদমতের মুক্তির স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, উহাই বাৎসায়ণ প্রভৃতির মতে ন্যায়দর্শনেরও মত। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণও উভয় মতের মুক্তিতে কিছু পার্থক্য আছে মনে করেন। (দ্রষ্টব্য রাধাকৃষ্ণণ, ভারতীয় দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৪—২২৫)। ইহাতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, গৌতমের মুক্তিতে সুখানুভূতি আছে বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতেন। আর কণাদের মতে মুক্তিতে কোন রূপ সুখানুভূতিও

১। ন্যায়সূত্র, ১।২।২২ র বাৎসায়ণ ভাষ্য।

২। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২ র বাৎসায়ণ ভাষ্য।

থাকেনা বলিয়া মানা হইত। যেরূপ ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার স্বীকার করেন নাই যে মুক্তিতে সুখানুভূতি থাকে, ঐরূপ বার্ত্তিককার[১] ও পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণও মুক্তিতে সুখানুভূতি নাই বলিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শনভুক্ত প্রায় সকল সম্প্রদায়ই মুক্তি প্রাপ্ত জীবের আর জন্ম হয় না বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জন্ম না হইলে দুঃখ ভোগও করিতে হয় না। মুক্তিতে যে আত্যন্তিক দুঃখবিমুক্তি হয় এই বিষয়ে ন্যায়বৈশেষিক মতের সহিত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিরোধ নাই। উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'কিরণাবলী' টীকায় প্রথমেই মুক্তি বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "মোক্ষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অবস্থা। এ বিষয়ে বাদিদিগেরও বিবাদ নাই"।[২] মুক্তি হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয় এ বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিবাদ না থাকিলেও এই দুঃখ নিবৃত্তি কি দুঃখের প্রাগভাব অথবা ধ্বংসাভাব অথবা অত্যন্তাভাব এ বিষয়ে বিবাদ আছে এবং এই দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে আত্যন্তিক সুখের অভিব্যক্তি হয় কি হয় না এ বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাবকেই বুঝাইয়াছেন। "মুমুক্ষুব্যক্তি আমার আর কখনও দুঃখ না হউক এই ভাবিয়াই মোক্ষকামী হন, অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাবই কামনা করেন। তাই তাঁহার মতে দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাবই মোক্ষ। ভবিষ্যৎ দুঃখ উৎপন্ন না হইলে তাহার ধ্বংস হইতে পারে না এবং উহার প্রাগভাব থাকিলে অত্যন্তাভাবও বলা যায় না। সুতরাং দুঃখের ঐ প্রাগভাবই মুক্তি। ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদির নিবৃত্তি বশতঃ দুঃখের অপায় বা নিবৃত্তি যাহা মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা যে দুঃখের প্রাগভাব ইহাই সূত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। অবশ্য প্রাগভাব অনাদিপদার্থ, সুতরাং উহার উৎপত্তি না থাকায়, জন্য বা সাধ্য পদার্থ নাই। কিন্তু মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য পদার্থ। সুতরাং উহা প্রাগভাব বলা যায় না, ইহা অন্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন"।[৩] আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যায়দর্শন' গ্রন্থ হইতে মুক্তি দুঃখের প্রাগভাব বা ধ্বংসাভাব বা অত্যন্তাভাব এই বিষয়ের পাণ্ডিত্য পূর্ণ কিছুটা সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২ র বার্ত্তিক, পৃঃ ৮৬

২। "নিঃশ্রেয়সং পুনর্দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী, অত্রচ বাদিনামবিবাদ এব"॥ কিরণাবলী

৩। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ (মুদ্রিত ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা)।

"নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'ঈশ্বরানুমানচিন্তামণির' শেষে মুক্তি-বিচার প্রসঙ্গে উক্ত মতকে (দুঃখের প্রাগভাব-মুক্তি) মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর গুরুর মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত মত সমর্থন করিয়াও শেষে উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দুঃখের প্রাগভাব তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হইলেও প্রাগভাবের যখন প্রতিযোগিজনকত্ব নিয়ম আছে তখন মুক্তপুরুষেরও পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখ। কিন্তু কোন কালে ঐ দুঃখ না জন্মিলে, তাহার প্রাগভাব থাকিতে পারে না। প্রাগভাব তাহার প্রতিযোগীর জনক। প্রাগভাব থাকিলে অবশ্যই কোন কালে তাহার প্রতিযোগী জন্মিবে। সুতরাং মুক্তপুরুষের দুঃখের প্রাগভাব থাকিলে তাঁহারও কোনকালে দুঃখ জন্মিবে। নচেৎ তাঁহার সেই দুঃখের অভাবকে প্রাগভাবই বলা যায় না। কিন্তু মুক্ত-পুরুষেরও আবার কখনও দুঃখ জন্মিলে তাঁহাকে কেহই মুক্ত বলিতে পারে না। যদি বলা যায় যে দুঃখের কারণ অধর্ম্ম ও শরীরাদি না থাকায় মুক্তপুরুষের আর কখনও দুঃখ জন্মিতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সেই দুঃখের অভাব যেমন অনাদি, তদ্রূপ নিরবধি বা অনন্ত হওয়ায় উহা অত্যন্তাভাবই হইয়া পড়ে, উহার প্রাগভাবত্ব থাকে না। নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও তাঁহার 'নবমুক্তিবাদ' গ্রন্থে উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে মুক্তপুরুষের যখন আর কখনও দুঃখ জন্মে না, তখন তাঁহার দুঃখ-প্রাগভাব থাকিতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ অনাগত বা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে যাহার উৎপত্তি অবশ্যই হইবে তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী অভাবকে প্রাগভাব বলে। যাহা পরে কখনও হইবে না তাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না। "আমার দুঃখ না হউক", এইরূপ যে কামনা জন্মে, উহাও উত্তরোত্তর কালের সম্বন্ধবিশিষ্ট দুঃখাত্যন্তাভাববিষয়ক, উহা দুঃখের প্রাগভাব বিষয়ক নহে। ঐ অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও উহারও প্রাগভাবের ন্যায় সাধ্যত্বের কোন বাধক নাই। ফল কথা, গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্তপুরুষের দুঃখের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা নাই। এবং তিনি দুঃখের প্রাগভাবের অভাববিশিষ্ট যে দুঃখের অত্যন্তাভাব, তাহাকেই "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি" বলিয়া মুক্তির স্বরূপ বলিতেও কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রভাকর মত স্বীকার করেন নাই। এবং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারও যে উক্ত মত স্বীকার

করিয়াছেন ইহাও জানা যায় না। কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য মহামনীষী শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থ সূত্রের 'উপস্কারে' পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মার অশেষ বিশেষগুণের ধ্বংসাবধি দুঃখ-প্রাগভাবই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, উহাই মুক্তি। মুক্তি হইলে তখন আত্মার অদৃষ্টাদি সমস্ত বিশেষ গুণেরই ধ্বংস হয়, এবং আর কখনও দুঃখ জন্মেনা। সুতরাং আত্মার তৎকালীন যে দুঃখপ্রাগভাব তাহাকেই মুক্তি বলা যাইতে পারে এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হওয়ায় পুরুষার্থও হইতে পারে। .. শঙ্করমিশ্র শেষে ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ঐ সূত্রের দ্বারাও দুঃখের প্রাগভাবই যে মুক্তি, ইহাই প্রতিপন্ন হয়"।[১] কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই মুক্তি বলা হইয়াছে, কারণ "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহাই বুঝা যায়। শঙ্করমিশ্র উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করতঃ বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব সর্ব্বথা নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা সাধ্য পদার্থ না হওয়ায় পুরুষার্থ বলিয়া মানা যাইতে পারেনা। "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" শ্রুতিবাক্যের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক্ প্রাগভাবই অত্যন্তাভাবের সমানরূপে উক্ত হইয়াছে। ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে। মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁহার 'ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি' গ্রন্থে উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতির মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক বা চরম ধ্বংসই মুক্তির স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখন দেখা যাউক উক্ত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে সুখবোধ মানা হইয়াছে কি না।

পূর্ব্বে আমরা কাহারও কাহারও মতে যে মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং তৎকালে কোন সুখবোধ থাকে না তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মোক্ষে যেরূপ সুখবোধ থাকে না সেইরূপ দুঃখনিবৃত্তির বোধও থাকে না। এই অবস্থায় আত্মার বিশেষ গুণসকলের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয়। তাই কেহ কেহ এই অবস্থাকে মূর্চ্ছার তুল্য মনে করিয়া বলিতে পারেন যে এই অবস্থা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই প্রার্থিত নহে। অনেক সম্প্রদায় দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিকে মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য মনে করিয়া উহা পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ("অথ দুঃখাভাবোঽপি নাবেদ্যঃ পুরুষার্থতয়েষ্যতে। ন হি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ")॥ ইত্যাদি, ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

১। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭—৩৩৮

নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার উক্ত 'ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি' গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ পূর্ব্বোক্ত মতের অবতারণা করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল দুঃখনিবৃত্তিকেও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়, কারণ দুঃখভীরু ব্যক্তিগণ সুখ উদ্দেশ্য না করিয়াও দুঃখনিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট হন দেখা যায়। সুতরাং মুক্তিতে সুখ নাই বলিয়া যে দুঃখনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ (মুক্তি) হইতে পারিবে না, ইহা বলা সঙ্গত নহে। পরন্তু যাঁহারা বিবেকী ব্যক্তি তাঁহারা সমস্ত সুখকেই সাংসারিক সুখের পর্য্যায়ে দেখিয়া অর্থাৎ দুঃখদায়ক মনে করিয়া ঐ সুখবাসনা পরিত্যাগ করতঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্যই ইচ্ছা করেন। ঐরূপ ব্যক্তিগণই মুক্তিতে অধিকারী, "·· সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি, তেঽত্রাধিকারিণঃ"। (ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি)। অর্থাৎ উপরোক্ত মতে মুক্তপুরুষের কোন সুখবোধ থাকে না, কোন বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। ভাষ্যকার বাৎসায়ণেরও এই মত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'কিরণাবলী'র প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্য এবং 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে আচার্য্য জয়ন্তভট্ট বিশেষ বিচার পূর্ব্বক আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মাত্রই মুক্তি, ইহাই বলিয়াছেন। অপরপক্ষে মহামণীষী শ্রীহর্ষ তাঁহার 'নৈষধচরিত' কাব্যগ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মতকে যেন উপহাস করিয়া গৌতমোক্ত মুক্তি যে প্রস্তরভাব অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতি শূন্য জড়ভাব, ইহাই বলিয়াছেন।[১] এই কথা মনে করিয়াই বোধ হয় কোন কোন নৈয়ায়িক শুধু দুঃখাভাবরূপ মুক্তিকে সমাদর করেন নাই। আবার প্রাচীন কালে কোন কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গৌতমসম্মত মুক্তিতে যে আনন্দানুভূতি আছে তাহাও স্বীকার করিতেন, ইহা স্পষ্টই বাৎসায়ণাচার্য্যের উক্ত মতের বিস্তৃত বিচার পূর্ব্বক খণ্ডনের দ্বারাই বুঝা যায়। শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের 'ন্যায়সার' গ্রন্থের 'আগম' পরিচ্ছেদে উক্ত আনন্দানুভূতিরূপ মুক্তিরই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। "সুখমাত্যন্তিকং যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং। তং বৈ মোক্ষং বিজানীয়াদ্ দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ"॥ এই স্মৃতির মন্ত্রটি ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার ন্যায়সার গ্রন্থে মুক্তিতে যে আনন্দানুভূতি আছে তাহা দেখাইবার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মন্ত্রের আধারে তিনি নিজেও বলিয়াছেন, "অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি," (ন্যায়সারের শেষপংক্তি)। অর্থাৎ সুখবিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষের মোক্ষ। 'ন্যায়সারে'র টীকাকার জয়তীর্থ বলিয়াছেন, "সুখেনেতি পদেন কণাদাদিমতে মোক্ষ প্রতিক্ষেপঃ"। অর্থাৎ জয়তীর্থ বলেন, আচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ 'সুখেন'

১। শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত, ১৭।৭৫

পদের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গৌতমোক্ত মুক্তিতে সুখানুভূতি থাকে এবং কণাদাদিমতে মোক্ষে সুখানুভূতি থাকে না। তাই বলা যায় যে ভাসর্ব্বজ্ঞের মতে নিত্য অনুভূয়মান সুখবিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি বা অপবর্গ। 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে'র টীকাকার গুণরত্ন 'ন্যায়ভূষণ' নামে ন্যায়সার'গ্রন্থের এক টীকা লিখিয়াছেন। ঐ 'ন্যায়ভূষণ' টীকা বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু 'ন্যায়ভূষণে'র টীকাকার যে মোক্ষে সুখানুভূতি আছে স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য্য বেঙ্কটনাথ (রামানুজসম্প্রদায়ের) 'ন্যায়পরিশুদ্ধি' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রন্থে 'ভূষণ' মতে মোক্ষে নিত্যসুখের অনুভূতি আছে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনিও 'ভূষণের' মত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখসংবেদন সিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা"।[১] 'সর্ব্বমতসংগ্রহ'গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "মোক্ষস্তু ন দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং, অপিতু নিত্যসুখস্যাবির্ভাবোঽপি"। অর্থাৎ মোক্ষে যে দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র হয় তাহা নহে, নিত্য সুখেরও আবির্ভাব হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট মনে হয় যে ভাসর্ব্বজ্ঞ ও তাঁহার সম্প্রদায় 'ভূষণ' প্রভৃতির মতে মোক্ষে সুখানুভূতি আছে ইহাই মহর্ষি গৌতমের মত ছিল বলিয়া ধরা হইত।

"ফল কথা, ভাষ্যকার বাৎসায়ণের পূর্ব্বে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতমের মতে মুক্তিতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এই মত সমর্থন করিতেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসায়ণ উক্ত মতের খণ্ডন করায় সেই সময় হইতে তন্মতানুবর্ত্তী গৌতমমত ব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সকলেই মুক্তি বিষয়ে বাৎসায়ণের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কণাদসম্মত মুক্তি হইতে গৌতমসম্মত মুক্তির পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ নাই। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' "অক্ষপাদদর্শন" প্রবন্ধে মাধবাচার্য্যও মুক্তি-বিষয়ে প্রচলিত ন্যায়মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই মতকে তিনি সেখানে ভট্ট ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতির মত বলিয়া বিচার পূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন"।[২] মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় তাহা ভারতীয় দর্শনের অপরাপর বহু সম্প্রদায়ভুক্তগণও স্বীকার করিয়াছেন। সেইকথা ভাষ্যকার বাৎসায়ণও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন "নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখীভবতীতি

১। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৭শ পৃষ্ঠা—(কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ, ১ম খণ্ড)।
২। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫।

কেচিন্মন্যন্তে"।[১] অর্থাৎ জীবাত্মার মহত্ত্ব যেমন অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ তাহাতে নিত্যসুখও বিদ্যমান রহিয়াছে। সংসারদশায় উহার অনুভূতি হয় না, মোক্ষে মহত্ত্বের ন্যায় সেই নিত্যসুখেরও অনুভূতি হয়। 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে ভাষ্যকার উক্তরূপ বাক্যের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তমতের উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্তিতে যে সুখানুভূতি আছে তাহার পক্ষে ও আপাতদৃষ্টিতে বিপক্ষে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও মত সংগ্রহ করা যায়। আমরা নিম্নে উপনিষদের মত সঙ্কলন করিতেছি।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের 'অষ্টমপ্রপাঠকে'র দ্বাদশ খণ্ডের প্রথমে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জীবাত্মা অশরীর (মুক্ত) হইলে সুখ ও দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভ হইলে তখন মুক্তাত্মার সুখদুঃখ উভয়ই থাকে না, ইহাই ঐ শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিপক্ষবাদিগণ ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের মত সমর্থন করিয়াছেন। আর যাঁহারা মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি আছে সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ঐ শ্রুতির 'প্রিয়' শব্দের অর্থ বৈষয়িক সুখ। তাই মুক্তিতে সুখ থাকে না বলিলে বুঝিতে হইবে যে বৈষয়িক সুখ বা জন্যসুখ থাকে না। মুক্তিতে শরীরাদির অভাবে কোন বৈষয়িক সুখের উৎপত্তি হইতে পারেনা, ইহাই ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। পরন্তু তখন কোন সুখেরই অনুভূতি হয় না ইহা ঐ শ্রুতিবাক্যে বলা হয় নাই, কারণ কতিপয় শ্রুতিবাক্যে মুক্তিতে যে আনন্দের অভিব্যক্তি আছে তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।[২] অতএব মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অনুভূতি আছে ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। তাই আনন্দানুভূতিরূপ মুক্তি অধিকাংশ সম্প্রদায়ের কাছেই সমাদর লাভ করিয়াছে। "বেদাদি শাস্ত্রে নানাস্থানে যখন মুক্তপুরুষের সুখসম্ভোগের কথাও পাওয়া যায়, তখন উহা অবশ্যই স্বীকার্য্য"।[৩]

১। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২র ভাষ্য।

২। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২ র ভাষ্য।

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" ; রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"। তৈত্তিরীয়, উ, ২য় বল্লী, ৭ম অনুচ্ছেদ।

৩। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪।

ন্যায়দার্শনিকগণের মতেও মুক্তি দুই প্রকার মানা হইয়াছে। উদ্যোতকর দুই প্রকার নিঃশ্রেয়সের (মুক্তির) কথা তাহার 'ন্যায়বার্তিক' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, অপরনিঃশ্রেয়স ও পরনিঃশ্রেয়স।[১] উভয়রূপ মুক্তিই তত্ত্বজ্ঞান হইতে লাভ হয়। অপরনিঃশ্রেয়স শরীরবিদ্যমানে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়েই লাভ হয়, আর পরনিঃশ্রেয়স জ্ঞানীর প্রারব্ধভোগান্তে শরীরপাত হইলে লাভ হয়।[২] প্রথমটিকে জীবন্মুক্তি ও দ্বিতীয়টিকে বিদেহমুক্তি বলা যাইতে পারে।

১। "নিঃশ্রেয়সস্য পরাপরভেদাৎ। যত্তাবদপরং নিঃশ্রেয়সং তৎ তত্ত্বজ্ঞানান্তরমেব ভবতি ॥…পরং চ নিঃশ্রেয়সং তত্ত্বজ্ঞানাৎ ক্রমেণ ভবতি"। ন্যায়বার্ত্তিক, (১।১।১ ন্যায়সূত্রের উপর)

২। "উপভোগাদৃপাত্তকর্মাশয়প্রচয়ো ন ক্ষীয়তে"। তাৎপর্য্যটীকা, পৃঃ ৮১।

সপ্তম অধ্যায়।

তন্ত্রমতে মুক্তি।

এদেশে হিন্দু বৌদ্ধাদি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে যেগুলি তন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। হিন্দুতন্ত্র সাধারণতঃ পঞ্চবিধ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। যথা, ১। শৈব, ২। বৈষ্ণব, ৩। শাক্ত, ৪। সৌর এবং ৫। গানপত্য। উপাস্য দেবতার নামভেদেই এই ভেদ হইয়াছে। উহাদের কতিপয়ের আবার একাধিক উপভেদ আছে। যথা বৈষ্ণবতন্ত্র. পাঞ্চরাত্র ও বৈখানস ভেদে দ্বিবিধ। শৈবতন্ত্রের অনেক প্রকার উপভেদ আছে। যথা, শৈব, পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ প্রভৃতি। অন্য দৃষ্টিতে বলা হয় যে শৈবতন্ত্র অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং দ্বৈত ভেদে ত্রিবিধ। এই দৃষ্টিতে আবার বৈষ্ণবতন্ত্রও অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত ভেদে চতুর্বিধ। আমরা নিম্নে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত তন্ত্রমতে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণবতন্ত্রমতে মুক্তি।

বৈষ্ণবতন্ত্র প্রাধান দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যথা, পাঞ্চরাত্রতন্ত্র শাখা ও বৈখানসতন্ত্র শাখা। আমরা নিম্নে ঐ দুই শাখার মতে মুক্তির বর্ণনা করিতেছি।

পাঞ্চরাত্রতন্ত্রমতে মুক্তি।

জয়াখ্যসংহিতা, পৌষ্করসংহিতা ও সাত্বতসংহিতা এই তিনটি পাঞ্চরাত্র-সংহিতা সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। উহারা পাঞ্চরাত্রের রত্নত্রয় নামে খ্যাত। উহাদের মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়। পরবর্ত্তী পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ সমূহেও সেই প্রকার বচন বা সিদ্ধান্ত আছে। ঐ পরবর্ত্তী পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, পরমসংহিতা, ঈশ্বরসংহিতা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা উল্লিখিত সংহিতা সমূহের মতে মুক্তির স্বরূপ কি তাহা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

জয়াখ্যসংহিতার মতে মুক্তি।

'মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্যলাভ করে'—"ব্রহ্মণৈকাত্মতাং যাতি," (ঐ, ৩৷২২)। জয়াখ্যসংহিতা মুক্তিতে জীব ব্রহ্মই হয় এই কথা

বলিয়াছেন। মুক্তজীবকে আর জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ব্রহ্মসম্পত্তিলাভ[১] বা অপুনর্ভবতাই মুক্তি।[২] ঐ সংহিতায় নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ্‌রূপে বুঝান হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতে মুক্তজীবের কোনও ভেদ এবং পৃথক্ ব্যক্তিত্ব থাকে না। "মেঘ হইতে জলবিন্দু ধারায় বিভক্ত হইয়া পতিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে পড়িয়া সব ঐক্যলাভ করে। যেমন বহু ইন্ধন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দগ্ধ হইয়া বিলীন হয় এবং অলক্ষ্য হইয়া যায়, সেইরূপ উপাসকগণ ব্রহ্মে বিলীন হন, তাঁহারা আর পৃথক্ ভাবে লক্ষিত হন না। বহু নদনদী হইতে জল সমুদ্রে পতিত হইলে, সমুদ্রজল হইতে উহাদের ভেদ যেমন লক্ষিত হয় না, পরব্রহ্মে গত যোগিগণেরও সেই প্রকার ভেদ থাকে না"।[৩] পূর্ব্বেও জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ছিল, মোক্ষেও আবার অভিন্ন হয়। সুতরাং মুক্তিকে এই মতেও (উপনিষদের ভাষায়) স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় ভগবানের (ব্রহ্মের) সহিত অভেদ ভাবনার বিধান আছে। যথা, "অহং স ভগবান্ বিষ্ণুরহং নারায়ণো হরিঃ। বাসুদেবোহ্যহং ব্যাপী ভূতাবাসো নিরঞ্জনঃ", (ঐ, ১১।৪১)। কথিত হইয়াছে, সাধক সুদৃঢ়ভাবে অভেদ ধ্যান করিতে করিতে অচিরে তন্ময় অর্থাৎ বিষ্ণুময় হন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১১।৪২)। বিষ্ণুর বিশ্বরূপ কিম্বা অপর যে কোন অভিমত রূপের সাথে অভেদ ধ্যান করা যায়। সদাই আপনাকে বিষ্ণু মনে করিতে হইবে। সুতরাং বিষ্ণুর সহিত অভেদ উপাসনার ফলে জীব বিষ্ণুই হয়। "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" বাক্যে বৃহদারণ্যক্ উপনিষদেও এই কথাই বলা হইয়াছে।

পৌষ্করসংহিতার মতে মুক্তি।

মুক্তিকে কৈবল্য বলা হইয়াছে[৪] এবং কৈবল্যকে "ভগবত্তত্ত্ব" বলা হইয়াছে।[৫] উহাকে ব্রহ্মসম্পত্তি (ব্রহ্মভবন) বলা হইয়াছে।[৬] কোথাও আছে যে মুক্তপুরুষ 'পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন',[৭] 'পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হন'।[৮] মুক্তিকে নির্ব্বাণ[৯] বা পরমনির্ব্বাণও বলা হইয়াছে।[১০] মুক্তপুরুষ ব্রহ্মে ঐকাত্ম্য লাভ করেন—"ব্রহ্মণৈকাত্মতাং ব্রজেৎ," (ঐ, ২৯।৩৭)। ব্রহ্ম হইতে মুক্তপুরুষ

১। জয়াখ্যসংহিতা, ৪।৫১ ২। ঐ, ৪।৫২ ৩। ঐ, ৪।১২১

৪। পৌষ্করসংহিতা, ১৭।৪৫, ২৬।৪৬, ৩২।৪২ ও ৩২।১৩৭

৫। "কৈবল্যং ভগবত্তত্ত্বং"। ঐ, ২৮।২১৬ ৬। ঐ, ১৯।৪৭

৭। "পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি" ঐ, ৩৩।১২৩ আর দ্রষ্টব্য ১৩।১২-১৬

৮। ঐ, ৩১।২৩৩ ৯। ঐ, ২৭।৪, ২৭।১০ ১০। ঐ, ২৭।২২৫

অভিন্ন হন। মুক্তিকে পরমশান্তপদলাভও বলা হইয়াছে।[১] অর্থাৎ মুক্ত ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন—"এবমেকত্বমাপন্নং", (ঐ ৩৩।৭৭)। মুক্ত পরব্রহ্মত্ব লাভ করেন—"পরং ব্রহ্মত্বমায়াতি", (ঐ, ৩০।১৮৪)। কথিত হইয়াছে যে একায়ণ বিপ্রগণ বা একান্তিগণ যাঁহারা ভগবান্ অচ্যুতের ভক্ত, কোন ফল কামনা না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে আজীবন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন এবং অপর কোন দেবতার উপাসনা করেন না, তাঁহারা দেহান্তে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হন—"কর্ত্তব্যত্বেন যে বিষ্ণুং সংযজন্তি ফলং বিনা। প্রাপ্নুবন্তি চ দেহান্তে বাসুদেবত্বম্", (ঐ, ৩৬।২৬২)। আর বলা হইয়াছে, "অন্তে ভূতময়ং দেহং ত্যক্ত্বাস্তি বাসুদেববৎ," (ঐ, ১৯।২০)। মুক্তিকে আত্মসিদ্ধি বা আত্মলাভও বলা হইয়াছে, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৩৩।৮৬; ৩৩।১২৬)। মুক্তিকে স্বরূপপ্রাপ্তিও বলা হইয়াছে।[২]

পৌষ্করসংহিতায় সালোক্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৩০।৭-৮)।

মুক্তির ঐ সকল সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য এই যে, ব্রহ্মই শরীরবন্ধন অঙ্গীকার করিয়া জীব সাজিয়াছিলেন এবং পরে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হন। তাই মুক্তিকে ব্রহ্মভবন, স্বরূপপ্রাপ্তি আত্মলাভ, আত্মসিদ্ধি ও ব্রহ্মসম্পত্তি প্রভৃতি বলা হইয়াছে। মুক্তিতে জীবভাব থাকেনা, তখন জীবত্বের লয় বা নির্ব্বাণ হয়। তাই মুক্তিকে লয় বা নির্ব্বাণ বলা হয়। 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে জগৎপ্রপঞ্চ বাস্তব নহে, মায়া বা ইন্দ্রজাল মাত্র। সুতরাং শরীরও মায়া বা ইন্দ্রজাল মাত্র। অতএব ব্রহ্মের জীবভবন বাস্তব নহে। যেহেতু মুক্তিতে জীবভাবের, তথা জগৎপ্রপঞ্চের বিলয় হয়, সেইহেতু জীবভাববিলয়ভাবনা এবং প্রপঞ্চবিলয়ভাবনা মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ২২।৪৬; ২৭।২৭২; ৩৩।৯০; ২৬।২৯)।

সাত্বতসংহিতার মতে মুক্তি।

'সাত্বতসংহিতা'য় মুক্তিকে নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১৬।৪)। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য লাভ করে, "পঞ্চকঞ্চুকনির্ম্মুক্তং শান্তাত্মনৈকতাং গতম্, (ঐ, ১৯।১১২)। মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়—"ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা," (ঐ, ৬।১১৪)। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত 'পাঞ্চরাত্রসংহিতা' গ্রন্থ ত্রয় মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য লাভ করে বলিয়া প্রচার

১। পৌষ্করসংহিতা, ৩৩।৭৬ ২। ঐ, ৩৩।৯৭

করিয়াছেন। আমরা নিম্নে পরবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রসংহিতা গ্রন্থের মতে মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি।

অহির্বুধ্ন্যসংহিতার মতে মুক্তি।

মুক্তিকে দীপনির্ব্বাণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উহাকে দেহ-সংস্কার নাশ হইলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাকে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিও বলা হইয়া থাকে।[১] তাহাতে মনে হইতে পারে যে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। কিন্তু এই মত উক্ত সংহিতায় স্বীকৃত হয় নাই। এই সংহিতাগ্রন্থমতে মুক্তজীব বহু এবং তাঁহাদের জ্ঞানানন্দময় দেহ আছে।[২] সুতরাং ব্যক্তিত্বও তাঁহাদের আছে। কল্পান্তে লক্ষ্মীর বিষ্ণুতে নিহিত হওয়ার কথা আছে এবং বলা হইয়াছে যে তখনও ভগবান্ তথা লক্ষ্মীর নিতান্ত ঐক্য হয় না। দুই, দুই থাকিয়া যায়।[৩] ইন্ধনের অভাবে অগ্নি যেমন গুপ্ত 'বহ্নিভাবং' প্রাপ্ত হয়, তেমন 'অতিসংশ্লেষাৎ' নারায়ণ ও তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী 'একতত্ত্বমিব' হন, কিন্তু এক হন না, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৪।৭৬)। শক্তিই যখন ভগবান্ হইতে ভিন্ন, তখন মুক্তজীব ভিন্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মুক্তিকে আত্যন্তিক দুঃখনাশ বা পরমানন্দপ্রাপ্তি বলা হয়, (ঐ, ১৩।৯)। মুক্তজীবের কর্ম্মদেহ থাকে না, পরন্তু তাঁহারা যেমন ইচ্ছা তেমন অপ্রাকৃত দেহ গ্রহণ করিতে পারেন, এমন কি এক সময়ে বহুদেহও গ্রহণ করিতে পারেন, সর্ব্বজগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু জগদ্ব্যাপারে তাঁহাদের কোন হাত নাই। মুক্তদিগের মধ্যে কোন ভেদ নাই, পরন্তু পূর্ব্বশ্রদ্ধানুসারে তাঁহাদের বৃত্তির ভেদ হয়, (ঐ, ৬।২৯-৩০)। মুক্তিকে স্বরূপপ্রাপ্তি (ঐ, ১৪।১১); বিষ্ণুপদপ্রবেশ বা বাসুদেবপ্রবেশও বলা হইয়াছে, (ঐ, ১৪।৪০-৪১ ; ১৫।১৭ ইত্যাদি)।

পরমসংহিতার মতে মুক্তি।

পরমসংহিতা বলেন যে জীব যতক্ষণ না মুক্ত হয় ততক্ষণ অবশ্যই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদহেতুর (অজ্ঞান বাসনা প্রভৃতির) অভাবশতঃ জীব ব্রহ্মই হয়—"আমুক্তের্ভেদ এব স্যাদ্ জীবস্য চ পরস্য চ। মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ"। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে মুক্তির পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মের ঐ ভেদ বাস্তব না ঔপাধিক? বাস্তব হইলে, সেই বাস্তব ভেদ আগন্তুক না অনাদি। ঔপাধিক হইলে, উপাধি বাস্তব না মায়িক। উপাধি

১। "দেহসংস্কারনাশেন বৈষ্ণবং শ্রূয়তে পদম্"। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ১৫।৭৫
২। "জ্ঞানানন্দময়াদেহা মুক্তানাং ভবিতাত্মনাম্"। ঐ, ৬।২৪
৩। "দেবাচ্ছক্তিমতো ভিন্না ব্রহ্মণঃ পরমেষ্টিনঃ" ঐ, ৩।২৫

অনাদি না সাদি। এই প্রশ্নগুলির কিছুই ঐ মন্ত্রে ব্যক্ত করা হয় নাই। বাস্তব ভেদ সাদি হইলে ক্রমভেদাভেদবাদ হয়। ক্রমভেদাভেদবাদে বুঝায় ভেদ পূর্ব্বে ছিল না পরে হইয়াছে। এই বাদের সমর্থক ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি। প্রাচীন ঔড়ুলোমি বেদান্তাচার্য্য ক্রমভেদাভেদবাদি ছিলেন মনে হয়। বাস্তব ভেদ অনাদি হইলে বীরশৈব মত হয়। ভেদ অনাদি কাল হইতে আছে এবং মুক্তির পরে অভেদ হইবে। ঔপাধিক ভেদ বাস্তব হইলে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ হয়, আর মায়িক হইলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ হয়। আমরা উল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ হইতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে (জীবের অমুক্ত অবস্থায়) কিরূপ ভেদ বর্ত্তমান থাকে তাহা সঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ঐ মন্ত্র হইতে জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্ন সম্বন্ধই অনুমান করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরসংহিতার মতে মুক্তি।

ঈশ্বরসংহিতার মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মসাযুজ্য বা বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে— "ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ", (ঐ, ১৩।১২৬), "বিষ্ণু সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ", (ঐ, ১২।৫৬)। মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয় বা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় একথাও বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম-সম্পদ্যতে তদা", (ঐ, ৬।৮৮)। কিন্তু রামানুজাদি পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বিগণ (অর্ব্বাচীন পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ) মুক্তজীবের ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ মানেন না। বেঙ্কটনাথও ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি "ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা" বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "অত্র ন স্বরূপৈক্যাদিকং বিবক্ষিতম্"। [১] অর্থাৎ ঐ মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ ঐক্যকে বুঝায় না, শুধুমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিই বুঝায়। তাই তাঁহাদের মতে মুক্তিতে ভেদ থাকে এবং ঐ ভেদের সমর্থন কল্পে পাঞ্চরাত্রতন্ত্রের মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে।

বৈখানসতন্ত্রমতে মুক্তি।

ঋষি মরীচি বলেন, "সংসার বন্ধনরূপ বাসনার নির্ম্মুক্তিই মোক্ষ। এই মোক্ষ উপাসনার ভেদহেতু সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য ভেদে চারি প্রকার। আমোদপ্রাপ্তি সালোক্য, প্রমোদপ্রাপ্তি সামীপ্য, সংমোদপ্রাপ্তি সারূপ্য এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি সাযুজ্য। ইহা (সাযুজ্য) নিত্যানন্দ, অমৃতরসপানবৎ

১। বেঙ্কটনাথ, পাঞ্চরাত্ররক্ষা, ৩য় অধিকার।

সর্ব্বদা তৃপ্তিকর, পরমাত্মার নিত্য নিষেবণ এবং পরজ্যোতি প্রবেশ”—“সংসারবন্ধনবাসনান্মুক্তির্ম্মোক্ষঃ। তদপি সমারাধণবিশেষাচ্চতুর্ব্বিধপদাবাপ্তি সালোক্যং সামীপ্যং সারূপ্যং সাযুজ্যমিতি। আমোদপ্রাপ্তিঃ সালোক্যং, প্রমোদপ্রাপ্তিঃ সামীপ্যং, সংমোদপ্রাপ্তিঃ সারূপ্যং, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিঃ সাযুজ্যমিতি। তচ্চ নিত্যানন্দং অমৃতরসপানবৎ সর্ব্বদা তৃপ্তিকরং পরমাত্মনো নিত্যনিষেবণং পরং জ্যোতিঃ প্রবেশনম্”। মরীচিসংহিতা, (শ্রীবিমানার্চনাকল্প), পৃঃ ৫০৮। তিনি বলেন যে, “মুক্তজীব অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। জীব জীবিতাবস্থাই মুক্ত হইতে পারেন”—“অষ্টাঙ্গযোগমার্গেণ নিত্যমনিমাদ্যৈশ্বর্য্যং চ প্রাপ্নোতি জীবন্মুক্তো ভবেৎ”, (ঐ, পৃঃ ৫১৯)। ঋষি অত্রিকৃত সমূর্ত্তার্চনা-ধিকরণে' (অত্রিসংহিতা) বলা হইয়াছে যে, “মুক্ত সর্ব্বদা অনাময় পরমাত্মা নারায়ণকে যোগের দ্বারা দর্শন করেন”—“মুক্তশ্চ পরমাত্মানং নারায়ণমনাময়ং সদা পশ্যন্তি যোগেন সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ” ॥ অত্রিসংহিতা (সমূর্তার্চনাধিকরণ), পৃঃ ৪৯৩। তিনি আরও বলিয়াছেন যে “জীব অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়”—“অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ”, (ঐ, পৃঃ ৪৯৩)। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি ‘বৈখানসতন্ত্র’ অনুসরণ করেন নাই। তাই বৈখানসতন্ত্র গ্রন্থের জীবন্মুক্তিবাদ তাঁহাদের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। তাঁহারা ‘পাঞ্চরাত্র-তন্ত্রকেই’ অনুসরণ করিয়াছেন।

শৈবতন্ত্রমতে মুক্তি।

কাশ্মীর অদ্বৈত শৈবতন্ত্রমতে মুক্তি।

কাশ্মীর অদ্বৈত শৈবতন্ত্রমতের মুক্তির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এই অদ্বৈত মতকে আশ্রয় করিয়া দুইটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল, স্পন্দশাখা ও প্রত্যভিজ্ঞাশাখা। এই উভয় শাখায় মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই বটে, তথাপি উহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মুক্তির বর্ণনা উপলব্ধি করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উহাদের মতের মুক্তির আলোচনা করা যাইতেছে।

স্পন্দশাখামতে মুক্তি।

‘মুক্তিতে জীব শিব হয় এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব লাভ করে’—“অলেপকো বিশুদ্ধাত্মা সিদ্ধিং প্রাপ্য শিবো ভবেৎ”, (স্বচ্ছন্দতন্ত্র, ১২।১৩৩)। ‘শিবজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই, ইহা যে তত্ত্বত জানে

সে শিবই হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই'—"নাতঃ পরতরং জ্ঞানং শিবাদ-বনিগোচরে। য এবং তত্ত্বতো বেদ স শিবো নাত্রসংশয়ঃ", (শ্রীমালিনীবিজয় তন্ত্র, ২৩।৩৮)। 'জীব যখন মুক্ত হয় তখন সে আমি পরতত্ত্ব, আমাতেই সমস্ত জগৎ অবস্থিত, আমিই অধিষ্ঠাতা ও কর্ত্তা এবং আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত ইহা অনুভব করে'—"অহমেব পরং তত্ত্বং ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ। অধিষ্ঠাতা চ কর্ত্তাচ সর্ব্বস্থাহমবস্থিতঃ", (ঐ, ৯।৫২)। মুক্তিকে শাশ্বতপদপ্রাপ্তি বা পরমপদপ্রাপ্তিও বলা হয়—"তদন্তে শাশ্বতং পদম্", (ঐ, ১।৪৬)। 'মুক্ত শুদ্ধ পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার আর পুনর্ব্বার পশুতাপ্রাপ্ত হইবার আসঙ্কা থাকে না'—"অনেন ক্রমযোগেন সংপ্রাপ্তঃ পরমং পদম্। ন ভূয়ঃ পশুতামেতি শুদ্ধস্বাত্মনি তিষ্ঠতি", (ঐ, ১।৪৭)। 'স্বচ্ছন্দ'তন্ত্রে মুক্তিকে অপুনর্ভবতা বলা হইয়াছে। যাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্তির উপযুক্ত তাঁহারা শিবশক্তিপাতবলে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া পরম নির্ম্মল শিবকে প্রাপ্ত হন, "মুক্তেস্তু ভাজনং যেহত্র অনুধ্যতাঃ (কৃতশক্তিপাতাঃ) শিবেন তু। উর্দ্ধং গচ্ছন্তি তে সর্ব্বে, শিবং পরমনির্ম্মলম্", (স্বচ্ছন্দতন্ত্র, ১১।৬১)। শিবৈক্য প্রাপ্তিকেই উর্দ্ধগতি বলা হইয়াছে—"উর্দ্ধমিতি শিবৈক্যপ্রাপ্তিরেব এষামূর্দ্ধগতি-রিত্যর্থঃ", (ঐ, ১১।৬১ উপর ক্ষেমরাজের টীকা)। মুক্তিতে যে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা স্বচ্ছন্দতন্ত্রের বহুস্থানেই উল্লেখ আছে। 'তন্ত্রবিদ্ গুরুদ্বারা জীবের আত্মা যখন নির্ম্মলীকৃত হয় তখন সেই জীব আর পুনরায় মলতা প্রাপ্ত না হইয়া নির্ম্মল শিবত্বই প্রাপ্ত হয়'—"গুরুণা তন্ত্রবিত্ত্বা হ্যাত্মা বৈনির্মলীকৃতঃ। ন ভূয়ো মলতাং যাতি শিবত্বং যাতি নির্মলম্", (স্বচ্ছন্দ, ১০।৩৭৭)। দীক্ষাদ্বারাই জীব উর্দ্ধগতিরূপ শিবতা প্রাপ্ত হয়—"দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্দ্ধং শৈবং ধামনয়ত্যপি", (স্বচ্ছন্দতন্ত্রে ৬ খণ্ডের পৃঃ ১১২ তে উদ্ধৃত বচন)। সেই জন্যই হয়তো স্বচ্ছন্দে দীক্ষাকেও মোক্ষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—"নাস্তি দীক্ষাসমো মোক্ষঃ"। (ঐ, ১১।১৯৯)।

'ভট্ট শ্রীকল্লটের 'স্পন্দকারিকা'য় উল্লিখিত হইয়াছে যে মুক্ত জীব নিরা-বরণচিদ্রূপ আত্মশক্তির প্রকাশে ঈশ্বর হয়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা—"সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা স্যাদিত্যর্থঃ," উৎপল, স্পন্দপ্রদীপিকা (স্পন্দকারিকার ১।৮ টীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ২০)। মুক্তজীবের সমস্ত ক্ষোভ অর্থাৎ বিকার (দেহেই আমি ইত্যাদি ভাব) দূর হইয়া যাওয়ায় তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন—"যদা ক্ষোভঃ প্রলীয়েত তদা স্যাৎ পরমং পদম্", (স্পন্দকারিকা, ১।৯)। স্বস্বরূপে স্থিতিকেই পরমপদ বলা হইয়াছে—"পরমপদং স্বস্বরূপে স্থিতির্ভবেদিত্যর্থঃ", (স্পন্দ

প্রদীপিকা, পৃঃ ২১)। জীবের স্বরূপ পরমশিবই। অতএব মুক্তজীব শিবই হয়—"অপিত্বাত্মবলস্পর্শাৎ পুরুষ স্তৎসমোভবেৎ"। (স্পন্দকারিকা, ১।৮)। মুক্তাবস্থায় জীবের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ সমূহের উদয় হয়। ঐ লক্ষণ হইল, জ্ঞত্ব ও কর্ত্তৃত্ব। মুক্ত ইচ্ছানুরূপ সকল জানিতে পারেন ও করিতে পারেন—"তদাঽস্যাঽকৃত্রিমো ধর্ম্মো জ্ঞতঃ কর্ত্তৃত্ব-লক্ষণঃ। যতস্তদীপ্সিতং সর্ব্বং জানাতি চ করোতি চ", (স্পন্দকারিকা, ১।১০)। শৈবদীক্ষা প্রাপ্ত জীব কেহ কেহ দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্রেই মুক্ত হন, অপরে যাঁহাদের কিছুটা মল অবশিষ্ট আছে তাঁহারা উহা (মল) উপভোগান্তে মুক্ত হন—"তমারাধ্য ততস্তুষ্টাদ্দীক্ষামাসাদ্য শাঙ্করীম্। তৎক্ষণাদ্বোপভোগাদ্বাদেহপাতাচ্ছিবং ব্রজেৎ", . (শ্রীমালিনীবিজয় তন্ত্র, ১।৪৫)। যাঁহারা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন তাঁহাদিগকে সদ্যোমুক্ত এবং যাঁহারা (প্রারব্ধ কর্ম্ম উপভোগের জন্য) কিছুকাল দেহে অবস্থিত থাকেন তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। তাঁহাকে (শিবকে) বিদিত হইয়া জীবিতাবস্থায়ই জীব মুক্ত হয় এবং শরীরপাতে তাহাকে (জীবকে) আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—"তদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত গত্বা ভূয়ো ন জায়তে", (স্বচ্ছন্দ তন্ত্র, ৪।২৪১)। যোগী (জীবন্মুক্ত) সুখদুঃখের দ্বারা লিপ্ত হন না—"সুখদুঃখয়োবহির্মননম্", (শিবসূত্র, ৩।৩৩)। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ক্ষেমরাজ 'স্পন্দকারিকা' হইতে নিম্নের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ন দুঃখং ন সুখং যত্র ন গ্রাহ্যং গ্রাহকং ন চ। ন চাস্তি মূঢ়ভাবোঽপি তদস্তি পরমার্থতঃ"। অর্থাৎ জীবন্মুক্তের দুঃখ নাই, সুখও নাই, গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবও নাই। তিনি মূঢ়ভাবের অতীত। এই অবস্থাই পরমার্থাবস্থা।। সুখদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া যোগী কেবলী হন। অর্থাৎ সর্ব্বদাই চিন্মাত্রপ্রমাতৃরূপে অবস্থান করেন—"তদ্বিমুক্তস্তু কেবলী", (শিবসূত্র, ৩।৩৪)। যিনি আমি পরমশিবস্বরূপ এই ভাবনায় স্থিত হইয়াছেন তিনি জীবিতকালেই মুক্ত হন—"জীবন্নেব বিমুক্তোঽসৌ যস্যেয়ং ভাবনা স্থিতা", (স্বচ্ছন্দতন্ত্র, ৭।২৫৯)।[১] বন্ধনের কারণ অজ্ঞানের ক্ষয় হইলেই জীব এই জগতকে নিজের ক্রীড়া বলিয়াই দর্শন করে এবং সতত যুক্তভাবেই অবস্থান করে। এইরূপ দৃঢ়স্থিতি সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই জীবন্মুক্ত।[২] আত্মাই বিশ্ব এইরূপ যিনি

১। আর দ্রষ্টব্য স্বচ্ছন্দতন্ত্র, ১০।৩৭২-৭৩

২। "ইতি বা যস্য সংবিত্তি ক্রীড়াত্বেনাখিলং জগৎ। স পশ্যন্ সততং যুক্তো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ স্পন্দকারিকা, ৩।৩; আর দ্রষ্টব্য ঐ শ্লোকের উপর কল্লটের বৃত্তি।

জীবিতাবস্থায় জানেন তিনি জীবন্মুক্ত। (দ্রষ্টব্য স্পন্দকারিকা, ৩৷৩ উপর রামকণ্ঠের বৃত্তি)। জীবিতাবস্থায়ই ঈশ্বরবৎ মুক্তকে জীবন্মুক্ত বলা হয়—"জীবন্নেবেশ্বরবন্মুক্তো নাঽত্র সংশয়ঃ"। (স্পন্দপ্রদীপিকা, পৃঃ ৪০)।

রাজানক ক্ষেমরাজ তাঁহার 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, 'দেহাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়াই চিদানন্দলাভ বশতঃ চিদৈকাত্মপ্রতীতি যখন দৃঢ় হয় তখন ঐ অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা কহে'।[১] তিনি আরও বলেন জীবিতাবস্থায় যে মুক্তি উহাই জীবন্মুক্তি। এই অবস্থায় জীবের নিজস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান জন্মে ও সমস্ত পাশরাশি ছিন্ন (নষ্ট) হইয়া যায়। জীবিতাবস্থায়ও জীব এবং শিব যে অভেদ এই জ্ঞান জন্মে। এই অভেদ জ্ঞানের নামই মুক্তি। আর এই অভেদ জ্ঞানের অভাবই বন্ধন।[২] যে শিবকে নিত্যই ভাবনা করে, সে কালের দ্বারা কখনই কবলিত হয় না এবং মৃত্যুভয়ে কাতর হয় না; পরন্তু জীব শিবই এইরূপ ভাবনা দৃঢ় হওয়ায় সে জীবিতাবস্থায়ই মুক্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষকে যোগী বলা হয়। যোগী স্বচ্ছন্দযোগের দ্বারা স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করেন, তিনি স্বচ্ছন্দপদে নিত্যযুক্ত এবং দেহপাতে স্বচ্ছন্দসমতা (শিবস্বরূপতা) প্রাপ্ত হন।[৩] রামকণ্ঠ 'স্পন্দকারিকা'র বিবৃতিতে বলিয়াছেন, আত্মবেদী কখনই বিকৃতি (জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি) প্রাপ্ত হন না; তিনি সকলই নিজের ক্রীড়া বা বিলাস রূপে দর্শন করেন বলিয়া জীবিতাবস্থায়ই মুক্ত।[৪] আত্মবেদীর জ্ঞত্ব ও কর্ত্তৃত্ব বিকাশ পায়, কারণ জ্ঞত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আত্মার অব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম বা স্বভাব। ক্ষোভাবস্থা আত্মার স্বভাবগত ধর্ম্ম নহে।[৫] 'শ্রীনেত্রতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে, যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ও চক্ষু খুলিয়া সর্ব্বত্রই শিবময় উপলব্ধি করে, সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয় এবং আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না—"নিমেষোন্মেষমাত্রেণ যদি চৈবোপলভ্যতে। ততঃ প্রভৃতি

১। "চিদানন্দলাভে দেহাদিষু চেত্যমানেষপি চিদৈকাত্মপ্রতিপত্তিদাঢ্য জীবন্মুক্তিঃ"। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, ১৬ সূত্র

২। "শিবজীবয়োরভেদ এবোক্তঃ। এতত্তত্ত্বপরিজ্ঞানমেব মুক্তিঃ। এতত্তত্ত্বা-পরিজ্ঞানমেব চ বন্ধ ইতি ভবিষ্যতি"॥ প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, পৃঃ ৩৩

৩। "জীবন্নেব বিমুক্তোঽসৌ যস্যেয়ং ভাবনা সদা। যঃ শিবং ভাবয়েন্নিত্যং ন কালঃ কলয়েত্তু তম্। যোগী স্বচ্ছন্দপদে যুক্তঃ স্বচ্ছন্দসমতাং ব্রজেৎ। স্বচ্ছন্দ-শৈচব স্বচ্ছন্দঃ স্বচ্ছন্দো বিচরেৎ সদা"। স্পন্দনির্ণয়, পৃঃ ৫২

৪। "সর্ব্বংক্রীড়াত্বেনৈব পশ্যন্ জীবন্নেব মুক্তঃ"। স্পন্দকারিকা, ৩.৩ উপর রামকণ্ঠের বিবৃতি, পৃঃ ৮৭

৫। "আত্মনো গত্বকর্ত্তৃত্বলক্ষণাব্যতিরিক্তধর্মতা স্বভাব এব, ন তু ক্ষোভাবস্থা", স্পন্দকারিকা, ১।১০ উপর রামকণ্ঠের বিবৃতি, পৃঃ ৪২

মুক্তোঽসৌ ন পুনর্জ্জন্ম চাপ্নুয়াৎ,” (শ্রীনেত্রতন্ত্র, ৬।৮, ৬।৯)। তৎক্ষনাৎ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, এই জন্মেই, কালান্তরে নহে। দেহ এবং প্রাণ হইতে অবিচ্ছিন্ন না হইয়াও মুক্ত হওয়া যায়। জীবিতাবস্থায় যে মুক্ত হইয়াছে সে এই দেহপাতের পর আর পুনরায় দেহাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না, পরন্তু পরমশিবত্বই প্রাপ্ত হইবে,—“অপিতু পরমশিব এব ভবতি,” (শ্রীনেত্রতন্ত্র, ৬।৯ উপর ক্ষেমরাজ কৃত টীকা, পৃঃ ১৮১)। তাই দেখা যাইতেছে যে জীবন্মুক্তিবাদ স্পন্দশাখার সকল গ্রন্থেই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞা শাখার মতে মুক্তি।

‘প্রত্যভিজ্ঞা’ শব্দের অর্থ ‘এই সেই’। অর্থাৎ জীবই সেই পরমশিব। নিজকে শিবস্বরূপ বলিয়া জানাই এই ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ শব্দের তাৎপর্য্য। শিব নিজের জ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব তাই স্বরূপতঃ শিবই।[১] “শিব এব গৃহীতঃ পশুভাবঃ”—‘শিবই পশু সাজিয়াছেন’। পশু নিজকে শিব বলিয়া উপলব্ধি করিবে তাহাই এই বাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বাতন্ত্র্য বা স্বচ্ছন্দতাই পরমশিবের স্বরূপ। পরম শিবই দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য। তিনিই বেত্তা, তিনিই বেদ্য; তিনিই প্রমাতা এবং তিনিই প্রমেয়। এক বস্তু কিরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এবং প্রমাতা ও প্রমেয় হয় এই প্রশ্নের উত্তরদান কল্পে প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ বলেন, পরমশিব স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমায় নর্মরভসে বা খেলার ঔৎসুক্যে ‘এই জগতকে নিজ বোধগগনে প্রতিবিম্ব মাত্র রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন’—“সর্ব্বমিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিম্বমাত্রম্”, (তন্ত্রসার, ৩ আঃ)। ‘এই স্বরূপপ্রথনই বা স্বস্বরূপের খ্যাতিই মোক্ষ’। অর্থাৎ তিনি আমি, আমিই সেই পরমশিব এই প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ—“মোক্ষো হি নাম নৈবান্যঃ স্বরূপপ্রথনং হি তৎ। স্বরূপং চাত্মনঃ সংবিৎ ....”, (তন্ত্রালোক, ১।১৫৬)। ‘অজ্ঞানই মোক্ষের পরিপন্থী। এই অজ্ঞানরূপ মল অপগত হইলেই আত্মসংবিতের উদয় হয়। এই আত্মসংবিত্ উদয়ই মোক্ষ’—“অজ্ঞানং কিল বন্ধহেতুরুদিতঃ শাস্ত্রে মলং তৎস্মৃতম্। পূর্ণজ্ঞানকলোদয়ে তদখিলং নির্মূলতাং গচ্ছতি। ধ্বস্তাশেষমলাত্মসংবিদুদয়ে মোক্ষশ্চ...”, (তন্ত্রসার, ১আঃ, পৃঃ ৫)।[২] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরমশিব আত্মপ্রচ্ছাদন ক্রীড়ার দ্বারা পশু বা অণু হইয়াছেন। সুতরাং তিনি আপন স্বরূপ স্থগন বা আচ্ছাদন

১। তন্ত্রালোক, ১।৩৩০

২। আরও দ্রষ্টব্য, তন্ত্রালোক, ১।১৫৬ উপর জয়রথের টীকা।

বিনিবৃত্তি পূর্ব্বক স্বরূপ প্রত্যাপত্তির ইচ্ছা না করিলে পশু মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তাঁহার এই ইচ্ছাকেই শক্তিপাত বলে। পশুর তিনটি মল আছে। শেষ মলটি আণবমল। উহা শক্তিপাত ভিন্ন দূর হয় না। পরমশিবের শক্তিপাত নিরপেক্ষ। এই শক্তিপাতের ফলেই অণু স্বস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া পরমশিবত্ব প্রাপ্ত হয়, (তন্ত্রসার, ১১ আঃ)। শিবত্ব প্রাপ্তি হইলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। 'বিদ্যার দ্বারা অভিজ্ঞাপিত ঐশ্বর্য্য যাঁহার, সেই চিদ্‌ঘন জীবই মুক্ত বলিয়া কথিত হয়'—'বিদ্যাভিজ্ঞাপিতৈশ্বর্য্যশ্চিদ্‌ঘনো মুক্ত উচ্যতে," (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা, ৩।২।২)। মুক্তের পুনর্জ্জন্মরূপ বন্ধন নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি দেহে অবস্থিত থাকিয়াও মুক্ত।[১] মুক্তজীবের কোন বিশেষ ধাম বা লোক নাই। মুক্তজীব কোথাও গমন করেন না।[২] এইখানে অদ্বৈততন্ত্র অদ্বৈতবেদান্তের অনুরূপ মতকে সমর্থন করিয়া বৈষ্ণবতন্ত্রমতকে খণ্ডন করিয়াছেন; কারণ বৈষ্ণবতন্ত্রমতে মুক্ত বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে গমন করেন। 'অজ্ঞানগ্রন্থিভেদ পূর্ব্বক স্বশক্তির অভিব্যক্তাই মোক্ষ'।[৩] অভিনবগুপ্ত সম্যক্ জ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য তন্ত্রালোক, ১।২২ এবং ১।২৩৬)। পরে ঐ জ্ঞানকে (আত্মজ্ঞানকে) মোক্ষ বলিয়াছেন।* (দ্রষ্টব্য তন্ত্রালোক, ১।১৬১)। 'গবাদি পশুর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে মুক্তের তাহা নাই; কারণ মুক্ত নির্ব্বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ হওয়ার জন্য মুক্তের শিবের সহিত একত্ব কেহই রোধ করিতে পারে না'।[৪] এখানেও এই তন্ত্রমত অদ্বৈত বেদান্তমতকেই সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু বৈষ্ণবমতকে নহে। কারণ বৈষ্ণবমতে মুক্তের তারতম্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞামতে এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াও মুক্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধজ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন দেহ থাকিতেও মুক্তি

১। "স পুনর্জ্জন্মবন্ধবিরহাৎ দেহেঽপি স্থিতে 'মুক্ত' ইতি"। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা, ৩।২২ উপর অভিনবগুপ্তের 'বিমর্শনী,' পৃঃ ২১৯; আর দ্রষ্টব্য তাঁহার পরমার্থসার, শ্লোক ৬১

২। "মোক্ষস্য নৈব কিঞ্চিৎ ধামাস্তি ন চাপি গমনমন্যত্র"। অভিনবগুপ্ত পরমার্থসার, কারিকা, ৬০।

৩। "অজ্ঞানগ্রন্থিভিদা স্বশক্ত্যভিব্যক্তা মোক্ষঃ"॥ —অভিনবগুপ্ত, পরমার্থসার, কারিকা, ৬০

* স্বরূপং চাত্মনঃ সংবিৎ…", তন্ত্রালোক, ১।১৫৬

৪। "বৈলক্ষণ্যং গবাদীনাং ন তথেঽস্তি কিঞ্চন। মুক্তেষু নির্ব্বিশেষত্বাৎ কেনৈক্যং তত্র বার্যতে"॥ শিবদৃষ্টি, ৬।১২৩

করতলে স্থিত।[১] মুক্ত (জীবন্মুক্ত) বিষয়ভোগ করিলেও পদ্মপত্র যেরূপ জলের দ্বারা ক্লিন্ন হয় না, মুক্তজীবও বিষয় দোষের দ্বারা লিপ্ত হয় না।[২] আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শিব ভিন্ন আর কিছুই নাই, জীব শিবই। তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে বন্ধমোক্ষ কাহার? একমাত্র শিবই যখন আছেন এবং আর কিছুই নাই, তবে বন্ধমোক্ষ শব্দের তাৎপর্য্য কি? অদ্বৈততন্ত্রবাদিগণ তাই বলিয়াছেন, নানাত্ব দৃষ্টি বন্ধমোক্ষের কারণ। যতক্ষণ নানাত্ব বোধ আছে, ততক্ষণ বন্ধমোক্ষ শব্দের প্রয়োগ থাকিবেই।[৩] সকলই শিব, তাই বন্ধমোক্ষ বলিয়া বাস্তবপক্ষে কিছুই নাই।[৪] বন্ধন অজ্ঞানলক্ষণা। আর বন্ধন থাকিলে মুক্তিও আছে। তাই বলা যায় যে বন্ধমোক্ষ উভয়ই অজ্ঞানমূলক।[৫] বাস্তবপক্ষে বন্ধমোক্ষ বলিয়া কোন অবস্থা নাই।[৬] কারণ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমশিবই আছেন, অন্য যাহা কিছু ভাব বা বোধ তাহা অজ্ঞানসম্ভূত। এই বন্ধমোক্ষ ভাব যে অজ্ঞানমূলক তাহা বেদান্তগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে। মোট কথা, অদ্বৈতবেদান্ত ও অদ্বৈততন্ত্র উভয়ই বলেন যে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন এবং আর কিছুই নাই বলিয়া বন্ধমোক্ষ অবস্থা ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে। কোন কোন পুরাণ গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে, এই বন্ধমোক্ষ ভাব গুণতঃ আছে, কিন্তু বস্তুতঃ নাই।[৭] এখানে একথা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে যে, অদ্বৈততন্ত্রের মুক্তি অদ্বৈতবেদান্তের মুক্তির প্রায় অনুরূপ। অদ্বৈততন্ত্রমতে মুক্তিতে জীব পরমশিবে নির্ব্বাণ লাভ করে বা পরমশিবই হইয়া যায়; আর অদ্বৈত-বেদান্তমতেও জীব মুক্তিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে বা ব্রহ্মই হইয়া যায়। তবে অদ্বৈততন্ত্র পরমশিবকে শক্তিবিশিষ্ট বলায়, মুক্তজীবও মুক্তিতে সর্ব্বশক্তি লাভ করে; কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত ব্রহ্মকে নির্গুণ বলায়, মুক্তিতে জীব কোন ঐশ্বর্য্য লাভ না করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায়।

শাক্ততন্ত্রমতে মুক্তি।

অদ্বৈতশৈবদর্শন এবং শাক্তদর্শন দার্শনিক দৃষ্টিতে সমানভাবে অদ্বৈত-দর্শন। শক্তির সহিত শিব সর্ব্বদাই মিলিত। শক্তিই অন্তর্ম্মুখ হইলে

১। "বৌদ্ধাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু বিকল্পোন্মূলনাদ ধ্রুবম্। তদৈব মোক্ষ ইত্যুক্তং ধাত্রা শ্রীমন্নিশাটনে"॥ তন্ত্রালোক, ১।৫০; আর দ্রষ্টব্য ১।৪৪

২। ঐ, ৪।২১৯-২০ ৩। শিবদৃষ্টি, ৬।৯৩ ও ৭।৮৭

৪। "বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে সর্ব্বত্রৈব শিবত্বতঃ"। শিবদৃষ্টি, ৩।৬৮

৫। শিবদৃষ্টি, ৩।৬৮ উপর উৎপলদেবের টীকা।

৬। ঐ, ৩।৭২ ৭। বিষ্ণুপুরাণ, ১১।১১।১-২

হয় শিব এবং শিব বহির্মুখ হইলে হয় শক্তি। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ এই দুইভাবই শাশ্বতভাব। শিবতত্ত্বে শক্তি ভাব গৌণ এবং শিবভাব প্রধান। শক্তিতত্ত্বে শিবভাব গৌণ এবং শক্তিভাব প্রধান। তত্ত্বাতীত দশায় শিব অথবা শক্তি কাহারই প্রধানতা নাই, কারণ উহা দুইয়েরই সাম্যাবস্থা। ইহাই শিবশক্তির সামরস্য। এই সামরস্যকেই শৈবগণ পরমশিব বলেন, আর শাক্তগণ পরাশক্তি বলেন। শাক্তমতে পরাশক্তি হইতে শিব উৎপন্ন হইয়া জগতের উন্মীলন করেন। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে যে তত্ত্ব শিবতত্ত্ব তথা শক্তিতত্ত্ব নামে অভিহিত হয় শাক্তমতে উহাকে কামেশ্বর বা কামেশ্বরী কহে। কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর সামরস্যকেই পরমাত্মা বা পরাশক্তি বলা হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সহিত পরমাত্মার পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই। উহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞান অজ্ঞান সম্ভূত। অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় যাবতীয় পদার্থের সহিত পরমাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধিই মুক্তি—"মোক্ষঃ সর্ব্বাত্মতাসিদ্ধিঃ"। (কৌলোপনিষৎ, ৪)। যে কৌল সাধক সর্ব্বাত্মতারূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 'তিনিই মুক্ত'- "স মুক্তো ভবতি", (ঐ, ৪৫)। আত্মসত্তা, জগৎসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা এই ত্রিবিধ সত্তার 'একত্ব উপলব্ধিই মুক্তি'—"এষ মোক্ষঃ"। (ঐ, ১৩)। আত্মসত্তার নাম অহন্তা ও জগৎসত্তার নাম ইদন্তা। এই উভয় যখন ব্রহ্মসত্তায় বা তত্তায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তখনই জীব মুক্ত হয়। জীব পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ।[১] এই পাঁচ প্রকার বন্ধনের নাশই মুক্তি। কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে 'দেহ থাকা কালেই মুক্তিলাভ হয়' "অত্রৈব মোক্ষঃ" (ঐ, ১৬)। ইহাই জীবন্মুক্তি। 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রে'ও জীবন্মুক্তির সুন্দর বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। (দ্রষ্টব্য মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৫।১৩৫)। শক্তিতত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধি হইতেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। 'শক্তিজ্ঞান বিনা নির্ব্বাণ লাভ হয় না'—"শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে", (নিরুত্তর তন্ত্র)। মুক্তিতে জীব আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত একাকার হইয়া যায়। জীব, আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান উপলব্ধি করতঃ মুক্ত হয়, (মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৬।১১৬)। আমরা উপরে যে জীবন্মুক্তাবস্থার কথা বলিয়াছি উহা শাক্ততন্ত্রমতে ভোগ ও মোক্ষের সাম্যাবস্থা মাত্র। সৌভাগ্যভাস্করধৃত 'রুদ্রযামল' বলিতেছেন, "শ্রীসুন্দরী সাধবপুঙ্গবানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব"। অর্থাৎ শ্রীসুন্দরীর সাধকগণের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই

১। অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি,, আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি, জীবগণের পরস্পর ভেদজ্ঞান, ঈশ্বর হইতে আত্মার ভেদ এবং চৈতন্য ও আত্মার ভেদ।

করতলে স্থিত। 'কুলার্ণবতন্ত্রে'ও উক্ত হইয়াছে যে, "যোগীচেন্নৈব ভোগীস্যাদ্‌ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ। ভোগ যোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং প্রিয়ে"॥ অর্থাৎ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিলে যোগমার্গে মুক্তির আশা ত্যাগ করিতে হয়, মুক্তি প্রার্থনা করিলে ভোগ বর্জ্জন করিতে হয়। শক্তির উপাসনায় ভোগের সহিত মুক্তি লাভ হয়। ইহাই কৌলমার্গের বিশেষতা। কৌলমার্গের সাতটি ভূমি। শেষ দুই ভূমি হইল উন্মনী ও অনবস্থা। এই শেষ (অনবস্থা) ভূমিতে জীব ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। 'উন্মনী উল্লাসে মনের বিষয়বাসনা নিরস্ত হয়। উহা (মন) তখন হৃদয়ে সন্নিরুদ্ধ হয়। যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন পরমপদ লাভ হয়'—"নিরস্ত-বিষয়োসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনোহৃদি। যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্", (সৌভাগ্যভাস্করধৃত 'ত্রিপুরোপনিষদে'র মন্ত্র)। অনবস্থা উল্লাসে মন ও জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। ধ্যাতা ও ধ্যান এই উভয়ই ধ্যেয় পদার্থে বিলীন হয়। তখন সকলই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ইহাই শাক্ততন্ত্রমতে নির্ব্বাণ বা মুক্তি। এই অবস্থা অনুভবগম্য, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।[১]

বীরশৈবমতে মুক্তি।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শৈবগণের মধ্যে আমরা কেবল বীরশৈবদিগের মতে মুক্তির আলোচনা করিতেছি।

শিব শক্তি হইতে ভিন্ন নয় এবং শক্তি শিব হইতে ভিন্ন নয়। শক্তির ক্ষোভমাত্র দ্বারা শিব দুইভাগে বিভক্ত হন, উপাস্যরূপে (লিঙ্গ শিব) এবং উপাসকরূপে (অঙ্গ জীব)। পরমশিব যেরূপ দুইভাগে বিভক্ত হন, সেইরূপ শক্তিও দুইভাগে বিভক্ত হন! লিঙ্গের শক্তির নাম 'কলা' (যাহা প্রবৃত্তি উৎপন্ন করে), আর অঙ্গের শক্তির নাম 'ভক্তি' (যাহা নিবৃত্তি উৎপন্ন করে)। কলাশক্তির দ্বারাই জগৎ পরমশিব হইতে আবির্ভূত হয়, এবং ভক্তিশক্তির দ্বারা এই জগৎ পরমশিবের সহিত একীভূত হইয়া যায়। জীবের স্বাভাবিক ভক্তিশক্তির উন্মেষ হইতে পরমশিবের সহিত যে একভাবাপত্তি তাহাই মুক্তি—"তস্মাদ্ লিঙ্গাঙ্গসংযোগাৎ পরামুক্তির্নবিদ্যতে", (অনুভবসূত্র, ৫।১৬)। অর্থাৎ লিঙ্গ (শিব) এবং অঙ্গের (জীবের) সংযোগ হইতে আর শ্রেষ্ঠ মুক্তি নাই। এই সংযোগ, সাযুজ্যরূপ মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে "সংযোগ

১। "নরা কিমপি জানন্তি স্বাত্মধ্যানপরায়ণাঃ। তদা যৎ পরমং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে॥ স্বয়মেবানুভবন্তি শর্করা-ক্ষীরপানবৎ"। কুলার্ণবতন্ত্র, ৮।৮৭

এব সাযুজ্যরূপমুক্তির্ণ চাপরা"। (অনুভবসূত্র, ৫।১৫)। যখন নিষ্কল, নিরুপাধিক পরলিঙ্গের দর্শন হয় তখন জীবের সকল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থি শতধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সংশয় ও সংকল্প সকল সহস্রধা বিদীর্ণ হয় এবং তখন জীব হিরণ্ময়রূপ নিষ্কল পরব্রহ্মে বিরাজ করে, (অনুভবসূত্র, ৫।৪৮-৫০)। ইহাই শিখা-কর্পূরের যোগবৎ লিঙ্গাঙ্গসংযোগরূপ পরামুক্তি, (ঐ, ৫।৫৬)।

পাশুপততন্ত্রমতে মুক্তি।

এই মতে অন্তিম পদার্থের নাম দুঃখান্ত। দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই মোক্ষ। পশু পাঁচপ্রকার দোষের দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয়। এই দোষকে 'মল' বলে। তাই মলও পাঁচপ্রকার। যথা, মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম্ম, সক্তিহেতু বিষয়াসক্তি, চ্যুতি (রুদ্রতত্ত্ব হইতে চ্যুতি), এবং পশুত্ব (অল্পজ্ঞত্বাদি), (গণকারিকা, ৮)। যোগ ও বিধির অনুষ্ঠান দ্বারা মল সর্ব্বথা নাশ হয়। দুঃখান্ত দুইপ্রকার—অনাত্মক ও সাত্মক। অনাত্মক দুঃখান্তে কেবল আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সাত্মক দুঃখান্তে আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তির সহিত পরমৈশ্বর্য্যও লাভ্ হয়। মুক্তাত্মার পরমৈশ্বর্য্য লাভ বলিতে দৃক্শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উদয় বুঝিতে হইবে। দৃক্শক্তি পাঁচ প্রকার, ১। দর্শন (সূক্ষ্মপদার্থের জ্ঞান), ২। শ্রবণ (অশেষ শব্দের জ্ঞান), ৩। মনন (চিন্তিত সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধি লাভ), ৪। বিজ্ঞান (সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান পরিজ্ঞাত হওয়া), ৫। সর্ব্বজ্ঞত্ব (সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধি)। ক্রিয়াশক্তি তিন প্রকার, ১। মনোজবিত্ব (কার্য্যকে অত্যন্ত শীঘ্র করার সামর্থ্য), ২। কামরূপিত্ব (কর্ম্মাদি না করিয়াও ইপ্সিত রূপ ধারণ করার সামর্থ্য), ৩। বিকরণধর্ম্মিত্ব (ইন্দ্রিয়সহায়তা বিনা সকল পদার্থকে জানা বা করা)। পাতঞ্জলযোগের ফল কৈবল্যলাভ, আর পাশুপতযোগের ফল দুঃখান্তে পরমৈশ্বর্য্যলাভ। অন্যত্র বিধির ফল পুনরাবৃত্তির সহিত স্বর্গলাভ, কিন্তু পাশুপত বিধির ফল পুনরাবৃত্তি রহিত সামীপ্যাদি লাভ। অন্যত্র মোক্ষ দুঃখাত্যন্তিকী নিবৃত্তিরূপ, পরন্তু পাশুপত মতে মোক্ষে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির সহিত পরমৈশ্বর্য্য লাভ হয়। আমরা পাশুপত মতে মুক্তির বর্ণনা 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' উল্লিখিত 'পাশুপতদর্শন' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

শৈব দ্বৈততন্ত্রমতে মুক্তি।

বন্ধন নিবৃত্তির নামই মুক্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বন্ধনকে মল বা পাশ বলা হয়। "মলাদিপাশবিচ্ছিত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়োদ্ভবঃ

মোক্ষঃ," (মোক্ষকারিকা, শ্লোক ৪৪)। 'মলাদিপাশ নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলা হয়'। এই মুক্তিতে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বক্রিয়ার (ঐশ্বর্য্যের) উদ্ভব হয়'—"সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বকর্তৃত্বা-ভিব্যক্তিশ্চ আত্মনাং মোক্ষঃ," (মোক্ষকারিকা, শ্লোক ৪৪ উপর ভট্টরামকণ্ঠের টীকা)। অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বের অভিব্যক্তিই মুক্তি। পশু (জীবাত্মা) পাশবদ্ধ হয় এবং পাশ মুক্ত হয় বলিয়াই 'মুক্তি' শব্দের তাৎপর্য্য আছে বুঝা যায়। পাশ যদি স্বাভাবিক হইত তবে পাশ কখনই দূর হইত না। তাহা হইলে মুক্তি শব্দের কোন অর্থই হয় না। অর্থাৎ পাশ আছে বলিয়াই এবং পাশ ব্যপগত হয় বলিয়াই 'মুক্তি' শব্দের ব্যবহার হয় এবং পাশ নিবৃত্তি হইলেই মুক্তিলাভ হয়।[১] পাশবদ্ধ জীবকেই পশু কহে। তাই এই পশু আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

পশু "স্বরূপতঃ নিত্য, বিভু, চেতন ও অন্যান্য শিবধর্ম্মময় হইলেও সংসারাবস্থায় ঐ সকল ধর্ম্মের অনুভব করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়ারূপা চৈতন্যশক্তি যেমন শিবের আছে, তেমনই জীব বা পশু মাত্রেরই আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, শিবস্বরূপে এই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বরূপা শক্তি সর্ব্বদা অনাবৃত। পশুতেও ইহা সর্ব্বদা আছে বটে, কিন্তু অনাদিকাল হইতেই পাশসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ আছে। মল, কর্ম্ম ও মায়া এই তিন প্রকার পাশের মধ্যে কোন আত্মা এক পাশে আবদ্ধ, কেহ দুই পাশে এবং কেহ তিন পাশেই আবদ্ধ। যে সকল আত্মায় মলাদি ত্রিবিধ পাশেরই বন্ধন রহিয়াছে তাহাদিগকে 'সকল' আত্মা বলে। যাহাদিগের মায়িক কলাদি প্রলয় অবস্থায় উপসংহৃত হইয়াছে অথচ মল ও কর্ম্ম অক্ষীণ রহিয়াছে, তাহাদিগের শাস্ত্রীয় নাম 'প্রলয়াকল'। বিজ্ঞান, যোগ, সন্ন্যাস অথবা ভোগদ্বারা কর্ম্মক্ষয় সিদ্ধ হইলে শুধু মলনামক একটি মাত্র পাশ অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থায় আত্মাকে 'বিজ্ঞানাকল' বলা হয়। এই বিজ্ঞানাকল বা বিজ্ঞানকেবলী আত্মাও মলের পরিপাকগত তারতম্যবশতঃ তিনপ্রকার।[২] তাঁহারা সকলেই মায়াতীত ও সকলেরই কর্ম্মবাসনা কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অধিকার নামক মল কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট

১। "পাশাভাবে পারতন্ত্রং বক্তব্যং কিং নিবন্ধনম্। স্বাভাবিকং চেন্মুক্তেষু মুক্তশব্দো নিবর্ততে" ॥ শ্রীমৃগেন্দ্রাগম, ১।৭।২ ; (পৃষ্ঠা, ১৯৬), "ব্যপগতপাশেহি মুক্তশব্দো লোকে প্রসিদ্ধঃ"। ঐ, ১।৭।২ উপর নারায়ণকণ্ঠের বৃত্তি।

২। বিদ্যাতত্ত্ব নিবাসী মন্ত্র ও বিদ্যা ; ঈশ্বরতত্ত্ববাসী বিদ্যেশ্বর ; সদাশিবতত্ত্বস্থ ভুবনবাসী পশু বা সংস্কার্য্য সদাশিব। (উহাদের বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় "তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা" প্রবন্ধ (উত্তরা ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৪৮)।

রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাঁহারা শিবসাম্যরূপ পূর্ণত্ব (মুক্তি) লাভ করিতে পারেন নাই"।[১] তাঁহারা শিবসাম্য লাভ না করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগকে এক প্রকার মুক্ত বলা হয়। তাঁহাদের অধিকার মল অপগত হইলেই তাঁহারা শিবসাম্যরূপ মুক্তির অধিকারী হইবেন। অধিকারও এক প্রকার মলই। যতদিন পর্য্যন্ত সকল প্রকার মলের নিবৃত্তি না হইবে ততদিন শিবত্বের অভিব্যক্তি হইতে পারে না। শুধু জ্ঞানের দ্বারা এই মলনাশ তন্ত্রশাস্ত্রমতে সম্ভবপর নহে। দ্বৈততন্ত্রমতে মল দ্রব্যাত্মক। সুতরাং চক্ষুর পটলাদি যেরূপ চিকিৎসকের অস্ত্রোপচাররূপ ক্রিয়া ব্যতীত আরোগ্য হয় না, তদ্রূপ দীক্ষাখ্য ঈশ্বর-ব্যাপার ভিন্ন পশুত্ব দূর হইতে পারে না। 'স্বায়ম্ভুবাগমে' আছে, "দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্দ্ধং শৈবং ধাম নয়ত্যপি"। অর্থাৎ দীক্ষার দ্বারাই শিবধাম বা শিবপ্রাপ্তি হয়। প্রকৃত মল (পাশ) আণবপাশ। "যদি আত্মার নিত্য ও ব্যাপক চিৎশক্তি এই আণব পাশের দ্বারা উপরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে সংসারাবস্থায় ভোগ নিষ্পত্তির জন্য কলাদি কর্ত্তৃক স্বকীয় সামর্থ্যের উত্তেজনার আবশ্যকতা হইত না এবং মোক্ষের জন্য পরমেশ্বরের কৃপা বা বলের প্রয়োজন থাকিত না। মল এক হইলেও তাহার শক্তি নানা। এক একটি শক্তির দ্বারা এক একটি আত্মার চিৎক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং মল এক হইলেও এক জনের মল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলের মল নিবৃত্তির প্রসঙ্গ হয় না এবং এক জনের মোক্ষলাভে সকলের মোক্ষপ্রাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এই সকল মলশক্তি আপন আপন রোধ ও অপসারণ ব্যাপারে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু ভগবৎ শক্তির অধীন", (দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরা'য় ভাদ্র ১৩৪৯, পৃঃ ৮২ "তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা" নামক প্রবন্ধ)। তাই দেখা যায় কি অদ্বৈততন্ত্রমতে বা দ্বৈততন্ত্রমতে গুরুকৃপা (পরমশিবের কৃপা) ব্যতীত আণব মলটি অবগত হয় না। সুতরাং গুরুশক্তিপাতই মুক্তির মুখ্য কারণ। আমরা পশু ও তাহার মল সম্বন্ধে অবগত হইয়া এখন দ্বৈততন্ত্রমতে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আর কিছু আলোচনা করিব।

তন্ত্রশাস্ত্রে অবিদ্যাদিকে পাশ বলা হয়। ঐ অবিদ্যাদির অপগমে জীব (পশু) পতি (শিব) সম হয়, কিন্তু পতিই হয় না—"অথাবিদ্যাদয়ঃ পাশাঃ কথ্যন্তে লেশতোঽধুনা। যেষামপায়ে পতয়ো ভবন্তি জগতোঽণবঃ," (শ্রীমৃগেন্দ্রাগম, ১।৭।১, পৃঃ ১৯৪)। মুক্তজীব পতিসম হওয়াতে তাঁহাদের শিবের সমান অন্যের অনধীন স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি হয়,—"যেষামপগমে

১। দ্রষ্টব্য ঐ "তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা" প্রবন্ধের পৃষ্ঠা, ৭৭

পাশত্বান্মুক্তাঃ অণবং আত্মনঃ জগতঃ পতয়ো ভবন্তি॥ তত্র শিববদন্যানধীন-স্বাতন্ত্র্যাভিব্যক্তিঃ মুক্তাত্মনাং পতিসমত্বম্", (শ্রীমৃগেন্দ্রাগম, ১৷৭৷১ উপর ভট্টরামকণ্ঠের বৃত্তি)। পরমশিব অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাদের মুক্ত করেন তাঁহারা সন্তই শিবস্বরূপ হন, আর যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মল অবশিষ্ট থাকে তাঁহারা পতি হন (অর্থাৎ তাঁহারা বিদ্যেশ্বরাদি আধিকারিক পুরুষ হন—"মোক্ষ শিবসাম্যং সদাশিবাদিপদপ্রাপ্তিশ্চ। যত্নুক্তং শ্রীমন্মতঙ্গে," (শ্রীকণ্ঠের রত্নত্রয়, শ্লোক ৮ উপর অঘোরশিবাচার্য্যকৃত টীকা পৃঃ ৪)। সদাশিবাদিপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ তাহাতে অধিকাররূপ ভোগ আছে,—"অত্রচ সদাশিবপদস্য ভোগাধিকারণত্ব শ্রূয়তে। ইত্যাহ"। (দ্রষ্টব্য রত্নত্রয়, শ্লোক ১৪৭ উপর অঘোরশিবাচার্য্যকৃত মুখবন্ধ)। 'রত্নত্রয়' গ্রন্থেও সদাশিবপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষে যে অধিকাররূপ ভোগ আছে তাহা উক্ত হইয়াছে—"ইতি ভোগঃ সমাখ্যাতঃ সদাশিবপদং মহৎ," (ঐ, ১৪৭)। সদাশিবপদপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিতে অধিকাররূপ মল থাকে বলিয়া এই মোক্ষকে পরমোক্ষ বলা যায় না। 'পরমোক্ষ শিব-সমতাকেই কহে'—"পরমোক্ষশ্চ শিবসাম্যরূপঃ," (রত্নত্রয়, শ্লোক ১৪৬ উপর অঘোরশিবাচার্য্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই দেখা গেল মোক্ষ দ্বিবিধ, পর ও অপর, (দ্রষ্টব্য শ্রীমৃগেন্দ্রাগম, ১৷৫৷২)। যাঁহারা শিবসমতা প্রাপ্ত হন তাঁহারা পরমুক্ত, এবং যাঁহারা আধিকারিক পুরুষ হন তাঁহারা অপরমুক্ত। বিদ্যেশ্বরাদি বা সদাশিবাদি প্রভৃতি অপরমুক্ত। তাঁহারা জীবের স্বর্গ, স্থিতি, লয় ও মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারেন না, শিবের ইচ্ছাধীন থাকিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন—"তেঽনন্তেশ-প্রমুখাঃ পতিভাবাৎ প্রেরয়ন্তি মন্ত্রাদীন্। সর্গস্থিতিলয়মুক্তীঃ কুর্ব্বন্তি হরেচ্ছয়া", (তত্ত্বসংগ্রহ, সদ্যোজ্যোতি কৃত, ৪১)। মহাপ্রলয়ে তাঁহাদের অধিকার মল বিরাম হইলে তাঁহারা পরমুক্তি (শিবসমতা) প্রাপ্ত হন। 'পঞ্চকৃত্যা-ধিকারে (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ) তাঁহারা শিবের সমান নহে'—"পঞ্চকৃত্যাধিকারিত্বেঽপি নৈষাং শিবসাম্যমিত্যাহ," (তত্ত্বসংগ্রহ, ৪১ উপর অঘোরশিবাচার্য্যকৃত টীকা)। কারণ তাঁহাদের পঞ্চকৃত্যাধিকার শিবের ইচ্ছাধীন। মুক্তাত্মা (পরমুক্ত) শিবসমতা প্রাপ্ত হন, কারণ তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শিবের গুণ লাভ করেন। মুক্তাত্মা শিবসমতা লাভ করিলেও শিবের সহিত তাঁহাদের কিছু পার্থক্য আছে। 'মুক্তগণ শিবের প্রসাদেই মুক্ত হন, আর শিব এক অনাদিমুক্ত পুরুষ'—"মুক্তাত্মনোঽপি শিবাঃ কিংত্বেতেতৎ প্রসাদতো মুক্তাঃ। সোঽনাদি মুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুঃ", (তত্ত্বপ্রকাশিকা,

রাজাভোজদেব কৃত, ৬)। বিদ্যাদি পদাধিকারিগণ পরমুক্তির অপেক্ষায় মায়ামুক্ত হওয়ায় নির্ম্মল হইয়াছেন বলিয়া আর তাঁহাদের সংসারযোগ সম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহাদের শিবসমতা লাভ করিতে অপেক্ষা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের মুক্তিকে অপরমুক্তি বলা হয়, এবং শিবসমতাকে পরমুক্তি বলা হয়—"বিদ্যা বিদ্যেশত্বং চাপরমুক্তিঃ পরেহ শিবসমতা," (তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ৫১ র টীকা দ্রষ্টব্য)। শিবে ও মুক্তাত্মায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের অপৃথক্‌রূপে (সমানরূপে) উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উভয়েই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বাত্মক গুণ বর্ত্তমান। তবে প্রভেদ এই যে, মুক্তাত্মার ঐসকল গুণ শিবের প্রসাদে লাভ হয়, আর শিবের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব অনাদিসিদ্ধ, (তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ৫২, ৫৩ র উপর অঘোরশিবাচার্য্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। মুক্তাত্মা ও বিদ্যেশ্বরাদি শিবপ্রসাদে সমানই বিমলতা অর্থাৎ জ্ঞত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করেন। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মুক্তাত্মা শিবের দ্বারা পরানুগ্রহরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হন না, আর বিদ্যেশ্বরাদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন, (দ্রষ্টব্য তত্ত্বনির্ণয়, শ্লোক ৫ র উপর অঘোরশিবাচার্য্যকৃত বৃত্তি, পৃঃ ৫)। দ্বৈতবাদী তান্ত্রিকদের মতে দেখা যাইতেছে যে, মুক্ত তিনপ্রকার—অনাদিমুক্ত (পরমশিব), অপরমুক্ত (বিদ্যেশ্বরাদি) ও পরমুক্ত (মুক্তাত্মা)। মুক্তজীবই পরমুক্ত। এই ত্রিবিধ মুক্তের পার্থক্যের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়া থাকিলেও আর দুই একটি কথা বলা সঙ্গত মনে হইতেছে। মুক্তাত্মাদিগের কিছুই করণীয় নাই তাই তাঁহারা শিবত্ব প্রাপ্ত হন (শিবসমান হন), কিন্তু শিবই হন না; আর বিদ্যেশ্বরাদির সর্ব্বানুগ্রহরূপ কার্য্য বিদ্যমান থাকায় তাঁহারা শিবের কিঙ্কর, (দ্রষ্টব্য মৃগেন্দ্রতন্ত্র, ২।১ র উপর নারায়ণকণ্ঠের বৃত্তি, পৃঃ ৫৬)। অপরমুক্তের কিঞ্চিৎ মল অবশিষ্ট থাকে এবং পরমুক্তের সমস্ত মলই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা (পরমুক্ত) অপরমুক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ। দ্বৈততন্ত্রমতে মুক্তাত্মা বহু এবং সেই হেতুই মুক্তিতে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। এখানে দ্বৈতবাদী তান্ত্রিকেরা বৈষ্ণবাচার্য্যদের অনুরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। তবে বৈষ্ণবদের মতে মুক্ত দুইপ্রকার, অনাদিমুক্ত-হরি এবং মুক্তজীব। তান্ত্রিকদের মতে তিন প্রকার মুক্তের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বৈষ্ণবদের মতন সগুণ ব্রহ্মবাদী, কারণ পরমশিব সর্ব্বকর্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বরূপ গুণযুক্ত। বৈষ্ণবদের বিষ্ণু বা হরি কল্যাণগুণযুক্ত। তাই উভয়ের মতেই সগুণ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি মুক্তি।

অষ্টম অধ্যায়

মহাভারতের মতে মুক্তি।

মহাভারতের মতে মুক্তি কি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বিভিন্ন আচার্য্যগণ মুক্তির বহুবিধ পর্য্যায় শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা কতিপয় পর্য্যায় শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

ব্রহ্মভবনই মুক্তি।

ভগবান্ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে বলেন, যাঁহারা (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই) সপ্তদশগুণ (অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীর), পঞ্চকথা (অর্থাৎ স্থূলশরীর) এবং সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত। ইহাই (শাস্ত্রের স্থির) নিশ্চয়।[১] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "মুক্তানাং তু গতির্ব্রহ্মন্ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কল্পিতা"।[২] অর্থাৎ 'হে ব্রহ্মন্! যিনি মুক্তজীবদিগের গতি, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াও কল্পিত হন'। তাঁহার পরের বিবৃতি হইতে জানা যায়, উনি বাসুদেব বা ব্রহ্মই (দ্রষ্টব্য মহাভারত, ১২।৩৪৪।১৮)। সুতরাং মুক্তজীবের গতি ব্রহ্মই তাই বলা যাইতে পারে যে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভবনই মুক্তি। 'দেহী পুণ্যপাপময় দেহ ক্ষয় করিতে করিতে সমস্ত কর্ম্ম সম্যক্‌ভাবে ক্ষয় করিয়া দেহবিহীন হইয়া পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করে। পুণ্যপাপ ক্ষয়ার্থ ই সাংখ্যজ্ঞান বিহিত হইয়াছে। তৎক্ষয়ে ইহার (দেহীর) ব্রহ্মভাবে পরাগতি (বিদ্বান্‌গণ) নিশ্চয় অবলোকন করেন'।[৩] সুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্মভবনেই জীবের পরাগতি হয়। ব্রহ্ম হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ কিছুই নিশ্চয় নাই—"নাস্তি তস্মাৎ পরতরঃ পুরুষাদ্বৈ সনাতনাৎ," (ঐ, ১২।৩৩৯।৩১)। সুতরাং ব্রহ্মের উর্দ্ধে গতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মুক্তিতে জীব যে ব্রহ্ম হয় তাহা অনেকেই বলিয়াছেন। "তদা ব্রহ্মত্বমশ্নুতে", (ঐ, ১২।৩২৬।৩৫)। জীব তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করে। আর কোথায়ও উক্ত হইয়াছে যে মোক্ষে জীব ব্রহ্ম হয়, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১২।১৯৯।১২৩)। সুতরাং ব্রহ্মভবনই বা ব্রহ্মত্ব লাভই মুক্তি।

১। মহাভারত, ১২।৩৩৪।৪০

২। ঐ, ১২।৩৩৪।৪১

৩। ঐ, ১২।২৭৫।৩৭-৩৮

স্বরূপপ্রাপ্তিই মুক্তি।

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্মই দেহোপাধি পরিগ্রহ করতঃ জীব সাজিয়াছেন, এবং তাহাতে বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছেন। সুতরাং ঐ দেহবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে জীবাত্মা যে পুনরায় ব্রহ্ম হইবে তাহা নিশ্চয়ই অতি স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে তাহা না হইলে মুক্তি বলা যায় না। তাই মহর্ষি অসিত বিশেষভাবে মুক্তিকে বুঝাইতে যাইয়া 'পুনঃ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথা কীটভ্রমরের উদাহরণ কেহ কেহ কল্পনা করিয়া বলিতে পারিতেন যে, জীব মুক্তিতেই ব্রহ্ম হয় মাত্র, তৎপূর্ব্বে উহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম ছিল না, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই ছিল। 'পুনঃ' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মহর্ষি ঐ প্রকার কল্পনার সম্ভাবনা নিরস্ত করিয়াছেন। সেই কারণে মুক্তিকে স্বরূপপ্রাপ্তি বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠাও বলা হয় যথা ভীষ্ম বলিয়াছেন, যাঁহাদের মন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা সংসারদোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, জ্ঞানতৃপ্ত সেই সকল মহর্ষিগণ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। জন্মদোষ রহিত হইয়া তাঁহারা 'স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন'—"স্বভাবে পর্য্যবস্থিতাঃ", (মহাভারত, ১১।১৯৫।২৩)।

ব্যক্তিত্বলোপই মুক্তি।

যেহেতু মুক্তিতে জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করে, সেইহেতু তখন জীবত্ব আর থাকে না। তাই বলা হইয়াছে যে, মুক্তিতে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। মহর্ষি পঞ্চশিখ এই বিষয়ে সমুদ্রগত নদীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, "যথার্ণবগতা নদ্যো ব্যক্তীর্জহতি নাম চ। নদাশ্চ তানিযচ্ছন্তি তাদৃশঃ সত্ত্বসংক্ষয়ঃ", (ঐ ১২।২১৯।৪২)। 'যেমন ক্ষুদ্র নদীসমূহ (বৃহৎ) নদে পড়িয়া আপন আপন নাম ও ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করে', জীবের বিনাশও তাদৃশ। নদসমূহ আবার সমুদ্রে পড়িয়া স্বস্ব ব্যক্তিত্ব ও নাম পরিত্যাগ করে। ঐ দৃষ্টান্ত শ্রুতির একাধিক স্থলে পাওয়া যায়, (দ্রষ্টব্য মুণ্ডক উপনিষদ্; ও প্রশ্ন উপনিষদ্)। ভগবান্ নারায়ণঋষি ঐ বিষয়ে জলবিন্দুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রুদ্রের স্তুতিতে তিনি বলিয়াছেন, 'জলবিন্দুসমূহ সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে এবং পুনরায় উহাতে বিলীন হইয়া উহার সহিত (তথা নিজেদের মধ্যেও) ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। ভূতবর্গের প্রভব ও প্রলয় সেইরূপ বলিয়া জানিয়া বিদ্বান্‌গণ তোমার সাযুজ্য লাভ করেন'—"এবং বিদ্বান্ প্রভবং চাপ্যয়ঞ্চ মত্বা ভূতানাং তব সাযুজ্যমেতি", (ঐ, ৭।২০০।৭৫)। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আরও বিশদ্ করিয়া বলিয়াছেন, "আত্মানং ত্বামাত্মনোঽনন্যবোধং বিদ্বানেবং গচ্ছতি

ব্রহ্মশুক্রম্', (মহাভারত, ৭।২০০।৭৮)। 'আপনাকে তুমি বলিয়া জানিয়া, আপনা হইতে তোমার অনন্তবোধ লাভ করিয়া জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হয়'। জলবিন্দুর দৃষ্টান্ত শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, (দ্রষ্টব্য কঠ উপনিষদ্)।

নির্ব্বাণলাভই মুক্তি।

জীবত্বের বিলোপ বুঝাইতে কেহ কেহ মুক্তিকে নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। যথা, রাজর্ষি যযাতি বলিয়াছেন, 'যখন ব্রহ্মসম্পত্তি হয়'—"ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা" "তদাত্মজ্যোতিষঃ সাধোনির্ব্বাণমুপপদ্যতে," (ঐ, ১২।২৬।১৬)। অর্থাৎ 'তখন আত্মজ্যোতিসম্পন্ন সাধুর নির্ব্বাণ উপপন্ন হয়'। 'নির্ব্বাণ' শব্দের প্রয়োগ 'মহাভারতে' অনেক পাওয়া যায়, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১২।১৬৭।৪৬; ১২।১৮৯।১৭ ইত্যাদি)। ভগবান্ আদি নারায়ণ নারদকে বলেন, "নির্ব্বাণং সর্ব্বধর্ম্মানাং নিবৃত্তিঃ পরমাস্মৃতা," (ঐ, ১২।৩৩৯।৬৭)। অর্থাৎ 'নির্ব্বাণই হইল সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে পরমানিবৃত্তি বা মুক্তি'। অধিকন্তু মনে হয় নির্ব্বাণলাভই তদানীন্তনকালে যতিদিগের মুখ্য ধ্যেয় ছিল, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১৩।১৬।১৪-১৫)। কেহ কেহ এই বিষয় অগ্নির নির্ব্বাণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা, 'অনুগীতা'য় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেন, 'অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ এবং অনভিজ্ঞেয় (যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়) আত্মাকে দর্শন করতঃ জীব বিমুক্ত হয়। পঞ্চভূতগণবিহীন, অমূর্ত্তিমান, অহেতুক, অগুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মাকে যিনি প্রাপ্ত হন বা দর্শন করেন তিনি মুক্ত হন। বিচারবলে শারীরিক ও মানসিক সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতঃ জীব ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়', (ঐ, ১৪।১৯।১২)।

নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ এবং অগ্নি নির্ব্বাণের দৃষ্টান্ত হইতে কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, মোক্ষে আত্মার বিনাশ হয়, কিছুই বাকী থাকে না। তাহাতে নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। পরমর্ষি ব্যাস নিরাত্মভবনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শুকদেবকে বলেন, "জ্ঞানদীপেন দীপ্তেন পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি। দৃষ্টা তমাত্মনাঽত্মানং নিরাত্মা ভব সর্ব্ববিৎ", (মহাভারত, ১২।২৪৯।১০)। 'বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রজ্বলিত জ্ঞানদীপের দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দেখেন। (সুতরাং) তুমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করতঃ নিরাত্মা ও সর্ব্ববিৎ হও'। কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, তিনিও এখানে আত্মবিনাশের কথাই বলিয়াছেন। মুক্তি সম্বন্ধে এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "যত্র গত্বা ন বর্ত্ততে"। ভীষ্ম 'ব্রহ্মভূত' ও 'নিরাত্মবান্' হওয়ার কথা বলিয়াছেন,

'অমৃতাচ্চামৃতং প্রাপ্তঃ শান্তীভূতো নিরাত্মবান্। ব্রহ্মভূতঃ স নির্দ্বন্দ্বঃ সুখী শান্তো নিরাময়ঃ" ॥ (মহাভারত, ১২।১৯৯।১২৩)। 'অমৃত হইতেও অমৃতকে প্রাপ্ত হইয়া জীব শান্তীভূত, নিরাত্মবান্, ব্রহ্মভূত, নির্দ্বন্দ্ব, সুখী, শান্ত ও নিরাময় হয়'। ইহাকে ঐ আশঙ্কার সমর্থক বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। এখানে বিচার্য্য এই যে ব্যাসদেব 'নিরাত্মবান্' (ঐ, ১২।১৯৯।১২৩) ও 'নিরাত্মা' (ঐ, ১২।২৪৯।১০) এই শব্দদ্বয়ে তথাকথিত নৈরাত্ম্যবাদকে সমর্থন করিয়াছেন কি? উভয় শ্লোকেই প্রকৃত পক্ষে আত্মার (শুদ্ধাত্মার) অনস্তিত্বকে লক্ষ্য করিয়া পদদ্বয় ব্যবহার করা হয় নাই। উভয়ত্র অহংবুদ্ধি যুক্ত অধ্যস্ত আত্মার নাশকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ উভয় শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয় দেখিলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হয় যে 'নিরাত্মবান্' ও 'নিরাত্মা' পদে তিনি সর্পনির্ম্মোক পরিত্যাগবৎ শুদ্ধাত্মার অধ্যস্ত 'অহং'এর পরিত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা আর দেখিতে পাই ব্যাসদেব বরং শূন্যবাদের নিন্দা করিয়াছেন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১২।২৩৬।৩-৬ এবং উহার উপর নীলকণ্ঠের টীকা)। মহাভারতের মতে আত্মা নিত্য। সুতরাং উহার নাশ হইতেই পারে না। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, "মরণং মানুষো ভাবঃ" (ঐ, ৩৩১২।৫০)। অর্থাৎ জন্মমৃত্যুই মানুষভাব। "ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ", (ঐ, ৩৩১২।৫২)। অর্থাৎ 'ভয়ই মানুষভাব'। মুক্তিতে জন্মমৃত্যুপ্রবাহ বন্ধ হয়, অভয়প্রাপ্তি হয়। সুতরাং মানুষভাব বিনষ্ট হয়। পরন্তু আত্মার নাশ হয় না। উক্ত দোষের সম্ভাবনা নিবারণার্থ কেহ কেহ নির্ব্বাণ সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। যথা, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেন যে, ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্তব্যক্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৬।২৬।৭২ এবং গীতা, ২।৭২; মহাভারত, ৬।২৯।২৪; গীতা, ৫।২৪)। যিনি অন্তঃসুখ, অন্তরারাম এবং অন্তর্জ্যোতিঃ সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, (দ্রষ্টব্য গীতা, ৫।২৫-২৬ ও ঐ, ৬।১৫)। এই সকল বচন হইতে পরিস্কার জানা যায় যে 'নির্ব্বাণ' শব্দে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মভবনকেই তাঁহারা বুঝাইয়াছেন। 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ জীবভাবের নির্ব্বাণ মাত্র বুঝিতে হইবে। সুতরাং উহাতে অবৈদিক নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদের আশঙ্কা নাই।

সংজ্ঞানাশই মুক্তি।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে সংশয়াপন্ন হইয়া মিথিলার রাজা জনদেব জনক মহর্ষি পঞ্চশিখের নিকট এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট

নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। জনক বলেন, (দ্রষ্টব্য ১২।২১৯।২-৪) যদি মোক্ষে সংজ্ঞা * না থাকে—"ন প্রেত্য সংজ্ঞা ভবতি", তবে অজ্ঞানে ও জ্ঞানে পার্থক্য কি? জ্ঞানের দ্বারা কি লাভ হয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা কি ক্ষতি হয়? তখন ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সকলই উচ্ছেদ হয়। তাহাতে প্রমত্ত ও অপ্রমত্তের ভেদ কি? ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির বলেন, (দ্রষ্টব্য ১২।৩০১।৮০), যদি মোক্ষে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে তবে প্রবৃত্তিধর্ম্ম (যাহার ফলে স্বর্গে সুখাদি-ভোগ প্রাপ্তি হয়) মোক্ষপ্রাপক নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হইত। আর যদি বিজ্ঞান না থাকে, তবে মুক্তি মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তি তুল্যই হয়। উহা দুঃখতর বা অযুক্ততর মনে হয়। ভীষ্ম বলেন যে, ঐ প্রশ্ন অতি কঠিন, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগেরও সম্মোহ হইয়া থাকে। যাহা হউক, তিনি ঐ বিষয়ে কপিল-মতানুযায়ী মহাত্মাদিগের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১২।৩০১।৮৫)। মহর্ষি পঞ্চশিখ ও কপিল সাংখ্যবাদী। তাঁহাদের মত আমরা পূর্ব্বেই 'সাংখ্যমতে মুক্তি' অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি।

নির্গুণভবনই মুক্তি।

ব্রহ্ম নির্গুণ এবং নির্ব্বিশেষ। সুতরাং জীবও নির্গুণ এবং নির্ব্বিশেষ হইলেই ব্রহ্ম (মুক্ত) হয়। যথা, ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ নির্গুণ ও সনাতন। সকল পুরুষ সাধনবলে নির্গুণ হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ বিলীন হয়।[1] ঐ এক মহাপুরুষ নির্গুণ ও বিশ্বরূপ। সমস্ত পুরুষ নির্গুণ হইয়া সেই নির্গুণ পুরুষে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করে।[2] যেমন সূর্য্য কিরণসমূহ বিস্তার করতঃ জগদ্‌ব্যাপিত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া পরে কিরণ মণ্ডল বিহীন হইয়া নির্গুণ হয়, তেমন জীব ইহসংসারে মনন পরায়ণ হইয়া নির্ব্বিশেষ হয়, এবং নির্গুণ ও অব্যয় ব্রহ্মে প্রবেশ করে—"সনির্গুণং প্রবিশতি ব্রহ্মচাব্যয়ম্, (মহাভারত, ১২।২০৬।৩১)। নারায়ণ ঋষি বলেন

১। মহাভারত, ১২।৩৫০।২৭

২। ঐ, ১২।৩৫১।১০-১৩

* সংজ্ঞা বলিতে বিশেষ জ্ঞানকেই বুঝায়। জ্ঞানের বিশেষতাই জ্ঞানের মালিন্য। এই বিশেষতার নাশেই শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। মুক্তিতে এই বিশেষ জ্ঞানের অর্থাৎ সংজ্ঞার নাশ হয়; শুদ্ধজ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ হয়। মূর্চ্ছা এবং সুষুপ্তিতে বিশেষ জ্ঞানের সাময়িক বিলোপ হয়, আত্যন্তিক বিলোপ হয় না। মূর্চ্ছান্তে ও সুষুপ্ত্যন্তে জীবের পূর্ব্ব বিশেষ জ্ঞানের সম্পূর্ণ স্মৃতি ফিরিয়া আসে।

যে, জ্ঞানী (সাংখ্যাঃ) বিপ্রপ্রবরগণ এবং ভাগবতগণ ত্রৈগুণ্যহীন হইয়া শীঘ্র পরমাত্মা বা নির্গুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবেশ করেন।[১] ব্রহ্মা বলিয়াছেন, জীব গুণময় দেহেন্দ্রিয়াদি, তথা জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই, পাপপুণ্য কর্ম্ম এবং সত্যানৃত পরিত্যাগ করতঃ নির্গুণ হয়।[২] প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন, "নৈর্গুণ্যাদ্ব্রহ্ম চাপ্নোতি সগুণত্বান্নিবর্ত্ততে। গুণপ্রচারিণী বুদ্ধির্হুতাশন ইবেন্ধনে", (মহাভারত ১২।২০৫।২১)। 'যেমন অগ্নি ইন্ধনাভিমুখে প্রসারিত হয়, তেমন বুদ্ধি গুণাভিমুখে প্রসারিত হয়। বুদ্ধি যখন নির্গুণ হয়, তখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়; আর যখন সগুণ হয়, তখন ব্রহ্ম হইতে নিবর্ত্তিত হয়'।

সার্ব্বাত্ম্যলাভই মুক্তি।

মুক্তজীব ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্মকে সগুণ দৃষ্টিতে বিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মা বা সর্ব্বাত্মাও বলা হয়। মুক্তজীবও সর্ব্বাত্মক হয়। যথা, পরমর্ষি ব্যাস শুকদেবকে বলেন, 'ভূতাত্মা (বা জীব) যখন আমাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন, তখন ব্রহ্ম হন—"ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। যিনি সতত এই প্রকার জানেন যে, আত্মা যতটা তাঁহার আপনাতে আছে, ততটা অপরের মধ্যেও আছে, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন'।[৩] ব্যাসের মতে মুক্তজীব সর্ব্বভূতাত্মভূত হয়।[৪] তাই তিনি বলিয়াছেন, "তেষু বিশ্বমিদং ভূতং সর্ব্বং চ জগদাহিতম্। তেষাং মাহাত্ম্যভাবস্য সদৃশং নাস্তি কিঞ্চন"।[৫] 'এই সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত জগৎ তাঁহাদিগেতে (আত্মজ্ঞপুরুষে) আহিত। তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের সমান আর কিছু নাই'। ব্যাসের শিষ্য মিথিলাধিপতি জনকও সেই প্রকার শুকদেবকে বলেন, "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সম্পশ্যন্নোপলিপ্যতে জলে বারিচরো যথা"।[৬] 'আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে সম্যক্ দর্শন করতঃ জীব, যেমন জলচর পক্ষী জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমন কিছুতেই লিপ্ত হয় না'। দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ "লোকে বিততমাত্মানং লোকাং শ্চাত্মনি পশ্যতি"—[৭] 'আপনাকে সর্ব্বলোকে বিতত এবং লোকসমূহকে আপনাতে দর্শন করে'। মুক্তজীব যে সর্ব্বাত্মভূত হন, তাহা আরও দেখা যায়।[৮] যিনি সর্ব্বভূতাত্মভূত,

১। মহাভারত, ১২।৩৪৪।১৭-১৮
২। ঐ, ১২।৩৫১।১১
৩। ঐ, ১২।২৩৯।২১-২২
৪। ঐ, ১২।২৪৮।১৯
৫। ঐ, ১২।২৩৬।২৪
৬। ঐ, ১২।৩২৬।২৯
৭। ঐ, ১২।২২৯।৫০ ; ৩।২১০।১৪
৮। "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সর্ব্বভূতানি পশ্যতঃ"। মহাভারত, ১২।২৬১।৩২

দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্ বলেন।[১] ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, যিনি প্রাকৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ নিত্য আত্মরতি, মুনি ও সর্ব্বভূতাত্মভূত হন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন।[২] তিনি আরও বলেন যে একান্তধর্ম্মের মতে, "সর্ব্বভূতাত্মভূতাস্তে সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বদর্শিনঃ। ব্রাহ্মণা বেদশাস্ত্রজ্ঞা স্তত্ত্বার্থগত-নিশ্চয়াঃ", (ঐ, ১২।২১৪।৩)। অর্থাৎ বেদশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভূতাত্মভূত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী এবং তত্ত্ববস্তুর নিঃসন্দিগ্ধজ্ঞাতা হন। একান্তধর্ম্মের অন্যতম গ্রন্থ 'গীতায়'ও উক্ত হইয়াছে যে, যোগী (জীবন্মুক্ত) সর্ব্বভূতাত্মভূত হন, (দ্রষ্টব্য গীতা, ৫।৭)। আরও বলা হইয়াছে যে যোগযুক্ত আত্মা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। তিনি আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে অবস্থিত দেখেন, (দ্রষ্টব্য গীতা, ৬।২৯)।

সর্ব্বাত্মতাপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত মহাভারতে বহু পাওয়া যায়। যথা শুকদেব সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বতোমুখ হইয়াছিলেন।[৩] ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার সার্ব্বাত্ম্যানুভূতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, 'আমি মাতা ও পিতা। পুনঃ আমিই পুত্র। আমিই আত্মা। যাহা আছে এবং যাহা নাই, তাহা আমিই। হে ভারত! আমিই স্থবির পিতামহ, পিতা এবং পুত্র। তোমরা সকলে আমাতেই অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে তোমরা আমাতে অবস্থিত নহ এবং আমিও তোমাদিগেতে অবস্থিত নহি ইত্যাদি'।[৪] 'গীতা'তে ভগবান্ কৃষ্ণও ঐ প্রকারে এবং আরও অধিক বিশদ্ ও বিস্তারিতরূপে তাঁহার সার্ব্বাত্ম্যানুভূতি বিবৃত করিয়াছেন।[৫] 'ব্রহ্মগীতা'তে (মহাভারতেরই একটি অংশ) উক্ত হইয়াছে, এই জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। যেমন অগ্নি কাষ্ঠসমূহের সংহারক তেমন আমাকেও সেইরূপ বলিয়া জানিও। স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সর্ব্বত্র আমি আমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানি। এই জ্ঞানই আমার ধন।[৬]

ভীষ্ম, তথা অপরে, সর্ব্বাত্মকরূপে কৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন।[৭] দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণ ঋষিকে সর্ব্বাত্মা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পুরাণ সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদে গীত হয় যে নারায়ণ অজ, শাশ্বত, ধাতা, পাতা ও অনুত্তম অমৃত; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত; তিনি

১। মহাভারত, ১২।২৬৮।৩৩ ২। ঐ, ৩২।২৯৪।৪৬
৩। ঐ, ১২।৩৩৩।২৩ ৪। ঐ, ৫।৪৬।২৮-৩০
৫। 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ময়া ততমিদং সর্ব্বং", ৯।৪
৬। মহাভারত, ১৪।৩৩।২-৪ ৭। ঐ, ১২।৪৭ (ভীষ্ম)

জগতের পিতা, মাতা এবং শাশ্বত গুরু ; লোক নানামূর্ত্তিতে সমাহিত তাঁহারই (ভগবানেরই) যজন করে।[১] এই সর্ব্বভূতরূপী নারায়ণ প্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তজীব সর্ব্বভূতে নিজাত্মরূপেই ভগবানের দর্শনলাভ করতঃ মুক্ত হন। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বাত্মক। মুক্তজীবও মুক্তিতে ভগবানে প্রবেশ করেন বলিয়াই সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী হন। এই কথা উপনিষদ্ ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে বিশেষভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্বাতীতভবনই মুক্তি।

অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে সর্ব্বাত্মভবনই জীবের পরমাবস্থা নহে। তাঁহারা বলেন সগুণভাবেই ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। ঐ ভাবে তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্যজ্ঞান হইলে জীবও সার্ব্বাত্ম্য লাভ করে। পরন্তু ঐ ভাবই ব্রহ্মের পরমাবস্থা বা পরমস্বরূপ নহে। ব্রহ্মস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাতীত ও নির্গুণ। অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে বিশ্বাত্মক ও সগুণ বলিয়া মনে হইয়া থাকে মাত্র। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে সর্ব্বাত্মতা জীবের পরমাবস্থা নহে। তাই ভীষ্মের বচনে সর্ব্বাত্মক হওয়ার পর উত্তম গতি লাভের কথা বলা হইয়াছে। অনু গীতায় কৃষ্ণ তাহা পরিস্কাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মহানাত্মা, মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি মহত্তত্ত্বের পর্য্যায় নাম।[২] উহা সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বশক্তিমান।[৩] জীব সাধনবলে মহত্তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, বিষ্ণু হয়।[৪] অনন্তর জ্ঞানী উহাকেও অতিক্রম করিয়া যায়। "স বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি", 'তিনি বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন'।[৫] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে জীব সর্ব্বাত্মক মহানাত্মাকে পরিত্যাগ করতঃ আপনাকে কেবল ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করতঃ আত্মস্বরূপকে দর্শন করে এবং তাহাতে মোক্ষ লাভ করে।[৬] পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জীব নির্গুণ হইয়াই ব্রহ্ম, সগুণ হইয়া ব্রহ্ম হইতে নিবর্ত্তিত হয়। মহাভারতে বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, পরমজ্ঞানের উদয় হইলে জগৎজ্ঞান থাকে না। সুতরাং তখন সার্ব্বাত্ম্য বোধও থাকিতে পারে না। তাই বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বাতীতভবনই পরম বা শ্রেষ্ঠমুক্তি।

১। মহাভারত, ১২।৩৩৪।২৫-২৭ ২। ঐ, ১৪।৪০।২-৩
৩। ঐ, ১৪।৪০।৪-৫ ৪। ঐ, ১৪।৪০।৬-১২
৫। ঐ, ১৪।৪০।১৩ ৬। ঐ, ১৪।১৯।৪৮-৫১

নবম অধ্যায়

পুরাণের মতে মুক্তি।

অষ্টাদশ পুরাণ বা মহাপুরাণের শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, বিষ্ণুভাগবৎপুরাণ, শিবপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুরাণের অনুরূপ মতই অন্যান্য পুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে বলা যায়। আমরা উপর্য্যুক্ত পুরাণাদির মতে মুক্তির স্বরূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বিষ্ণুভাগবৎপুরাণের মতে মুক্তির কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা না করিয়া "মুক্তি ও ভক্তি" নামক অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইবে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে মুক্তি।

বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং তন্মধ্যে সমধিক প্রাচীন। শাশ্বতব্রহ্মে লয়কে এখানে আত্যন্তিক বিমুক্তি বলা হইয়াছে, (ঐ, ৬৷৮৷১)। এই পুরাণেরই এতদ্‌পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে (পঞ্চম) আত্যন্তিক বিমুক্তির কারণ ও করণ রূপে জীব ও জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে। মুক্ত হইলে জীব যে কৃতকৃত্য হয় তাহাও উক্ত হইয়াছে। কৃতকৃত্যতার ফলে সমস্ত চেষ্টার নিবৃত্তি হয়, (ঐ, ৬৷৭৷৯২)। মুক্তের অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতাবোধরূপ অদ্বৈতাত্মবোধকেই মুক্তি বলা হইয়াছে, (ঐ, ৬৷৭৷৯৩)। জীব ও পরমাত্মার ভেদবুদ্ধির আত্যন্তিক বিনাশেই অদ্বৈতাত্মবোধের উদয় হয়। ফলকথা ভেদজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত এবং অভেদজ্ঞানেই পরমজ্ঞান। এই পরমজ্ঞানই মুক্তি, (ঐ, ৬৷৭৷৯৪)। অভেদাত্মবোধের অপর নামই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সমস্ত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং বাক্য ও মনের অগোচর স্বসংবেদ্য জ্ঞানের স্ফুর্ত্তি হয়, (ঐ, ৬৷৭৷৫৩)। শাশ্বতলয়কেও মুক্তি বলা হইয়াছে। শাশ্বতলয়রূপ মুক্তিকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইলে জীবের সংসারগতি চিরতরে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, (ঐ, ৬৷৭৷২৭)। আমি ও তুমি, গোচরীভূত বিষয়ী ও বিষয়ের পরস্পর অধ্যাসের ফলে এই জগদ্‌ব্যবহার চলিতেছে। এই অধ্যাসের নিবৃত্তিতেই জগদ্‌ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়। মন পূর্ণরূপে নির্ব্বিষয় হইলে তবেই বিষয়ী ও বিষয়ের পরস্পর অধ্যাস নিবৃত্ত হয়। মনের নাশ ও মনের নির্ব্বিষয়ত্ব একই কথা। মুক্তিতে মনোনাশ

হয় অর্থাৎ মন নির্ব্বিষয় হয়। মন নির্ব্বিষয় হইলে বিষয়ী ও বিষয়ের পরস্পর অধ্যাসও তিরোহিত হয়। এই জন্য মনকে বন্ধন ও মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে। বিষয়ীকে বদ্ধ ও নির্ব্বিষয়ীকে মুক্ত বলা হইয়াছে, (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।২৮)। মুক্ত পুরুষগণ অদ্বৈতাত্মবোধসম্পন্ন হন বলিয়া তাঁহাদিগকে তত্ত্বদর্শী বলা হয়। দ্বৈতবোধ নিরস্ত না হইলে তত্ত্বদর্শন হয় না, (ঐ, ২।১৪।৩১)। আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বভূতাত্মবোধসম্পন্ন হন, (ঐ, ২।১৩।৩৮)। মুক্তির কারণ পরমজ্ঞানকে এক ও অদ্বিতীয় পরমশুদ্ধ সৎতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, (ঐ, ২।১২।৪২-৪৩)। মোক্ষাবস্থা অনির্ব্বচনীয়, কার্য্যকারণাতীত। মুক্তি, মুক্তির কারণ ও জ্ঞান তত্ত্বতঃ এক। জগৎ, জীব এবং ঈশ্বর তত্ত্বতঃ এক, (ঐ, ১।২২।৮৫)। উহাই বিষ্ণু, উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। উহা শুদ্ধ, অক্ষয়, সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত, সর্ব্বদ্বন্দ্ববিরহিত, বাক্য ও মনের অগোচর, স্বসংবেদ্য, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ, (ঐ, ২।২২।৪৭-৫২ ও ১।১৪।৩৯-৪৩)। জীব ও জগৎ পরমতত্ত্ব হইতে অভিন্ন। এই তত্ত্ব বিষ্ণু-পুরাণে বহুধা স্বীকৃত হইয়াছে, (ঐ ১।১৯।৮৪-৮৬)। জ্ঞানের এই চরমাবস্থায় উপনীত হইলেই জীব সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে, (ঐ, ১।১৯।৭-৮)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিষ্ণুপুরাণের মতে অদ্বৈতাত্মবোধই পরমজ্ঞান বা মোক্ষ। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বিষ্ণুপুরাণকে অদ্বৈতবাদীগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরাণের মতে মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে। তিনি বলেন, 'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে পরমার্থ সত্য বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ এক পদার্থ (জীব) কখনই অন্যপদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া যাইতে পারে না'—"পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ"॥ (বিষ্ণুপুরাণ, ২।১৪।২৭)। এই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইবার জন্য তিনি বিষ্ণুপুরাণের আরও বহু মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৬।৭।৩০; ২।১৪।২৭ ব্যাখ্যা শ্রীভাষ্য, ১।১।১য়ে উদ্ধৃত) যদিও ঐ মন্ত্রের (২।১৪।২৭) অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে।[১]

শিবপুরাণের মতে মুক্তি

জ্ঞাতা, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন সমস্ত জগতই শিবস্বরূপ,—"জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং সর্ব্বং শিবমিদং জগৎ", (শিবপুরাণ, ১।৭৮।২)। ব্রহ্মাদি হইতে জগৎপ্রপঞ্চ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমস্তই শিবস্বরূপ,

---

১। দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের পৃঃ ৪১ পাদটীকা।

(শিবপুরাণ, ১৭৮।৩)। এই শিবস্বরূপতা প্রাপ্তিই মুক্তি, (ঐ, ১৭৮।২৫)। জীব যখন আমি কর্ত্তা এই অহংবুদ্ধি মুক্ত হয়, তখন সে (জীব) সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়,—"অহংকারতয়া জীবস্তন্মুক্তেঃ শঙ্কর স্বয়ম্", (ঐ, ১৭৮।২০)। যেরূপ একখণ্ড স্বুবর্ণ তাম্রাদির সহিত যুক্ত হওয়ায় অল্প মূল্য হয়, সেইরূপ জীব অহংকার যুক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। পুনরায় ঐ স্বুবর্ণখণ্ড পাকাদিদ্বারা শোধিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মূল্যবান হয়, জীবও সেইরূপ অহংকার মুক্ত হইলে শিবস্বরূপতা লাভ করে, (ঐ, ১৭৮।২১-২২)। জীব অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানবান হইলে (অহংকার মুক্ত হওয়ায়) শিবতা প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দর্পণে আপনারই স্বরূপ দেখা যায়, সেইরূপ শিবকেও সর্ব্বব্যাপিরূপে দর্শনকরতঃ জীব জীবন্মুক্ত হয় এবং দেহপাতে শিবে লয় প্রাপ্ত হয়, (ঐ, ৭৮।২৬-২৭)। জ্ঞানী ব্যক্তি শুভকে লাভ করিয়া হর্ষযুক্ত হন না, এবং অশুভকে লাভ করিয়াও কুপিত হন না। জ্ঞানীব্যক্তির (জীবন্মুক্তের) সুখদুঃখের সমজ্ঞান হয়। তিনি আত্মযোগদ্বারা তত্ত্ব বিচার করতঃ যথেচ্ছ বিচরণ করেন। যখন শিবে তিনি লীন হইবেন তখন শরীররূপ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, (ঐ, ১৭৮।২৭-২৯)। দেখা গেল শিবপুরাণে মুক্তিকে দুইপ্রকার বলা হইয়াছে, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। জ্ঞানবানের (জীবন্মুক্তের) কোন কর্ত্তব্য থাকে না এবং তিনি কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। জ্ঞানীগণের বিধি, নিষেধ, দোষ, বিকল্পনা প্রভৃতি কিছুই নাই। যেরূপ জলস্থিত পদ্ম জলের সহিত লিপ্ত থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। বিহিতকর্ম্মের অকরণে ও অবিহিত কর্ম্মের করণে জীবন্মুক্তের দোষ হয় না, (ঐ, ১।২৬।২০-২১)। শিবপুরাণে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব লোপ পায় একথাও বলা হইয়াছে। 'নদীসকল যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করতঃ সমুদ্রের সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ মুক্তপুরুষও পিতামহাদি বিভাগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শিবই হইয়া যায়'—"শিবো ভবেদ্‌যতিঃ", (ঐ, ৩।১২।১৩০)। মুক্তজীব শিবের সমানৈশ্বর্য্য লাভ করেন। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিই শিবের ঐশ্বর্য্য। মুক্তজীব নির্ম্মল আত্মস্বরূপে বিরাজ করেন এবং শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, (ঐ, ২।১৬।২২-২৩)। শিবপুরাণের মতে শিবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একই।

অগ্নি, কূর্ম্ম, গরুড়, বায়ু ব্রহ্ম ও পুরাণ প্রভৃতির মতে মুক্তি।

অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে, যে জীব ব্রহ্মভাবনার দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে সে

সমস্ত জগৎজ্ঞান নষ্ট করিয়া ব্রহ্ম হয়—"ভাবশুদ্ধশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্ত্বা ব্রহ্ম-ভবেন্নর", (অগ্নিপুরাণ, ১৬১।৩০)। মুক্তজীবকে আর পুনরায় জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। জলে জল নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ এক হইয়া যায়, মুক্তজীবও সেইরূপ শিবের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হয়, (ঐ, ৩১১।২৫)। কূর্ম্মপুরাণেও মুক্তিতে যে জীব ব্রহ্ম হয় সেকথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, —"ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা." (ঐ, উপরিভাগ, ২।৩১)। ব্রহ্মের সহিত একীভূত মুক্তজীবকে কেবলীও বলা হয়—"একীভূতঃ পরেণাসৌ তদ্ভবতি কেবলঃ," (ঐ, উপরিভাগ, ২।৩২)। মুক্তিকে ক্ষেমপ্রাপ্তিও বলা হইয়াছে, (ঐ, উপরিভাগ, ২।৩৩)। মুক্তজীব অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য (জগৎ) হইতে মুক্ত হয়, (অগ্নিপুরাণ, ৩৮২।৩৬)। কূর্ম্মপুরাণে মুক্তজীবের যে ব্যক্তিত্ব লোপ হয় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—"নিস্কলেনৈকতাং ব্রজেৎ", (ঐ, উপরিভাগ, ২।৩৭)। মুক্তজীবের যে ব্যক্তিত্ব লোপ হয় এবং মুক্তজীব ব্রহ্ম হয় সেকথা গরুড়পুরাণেও বলা হইয়াছে, (ঐ, পূর্ব্বখণ্ড, ২৩০।৩১-৩৪)। বায়ুপুরাণে মুক্তি তিন প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা, জ্ঞানপ্রভাবে বিষয়বিয়োগজনিত এক প্রকার মোক্ষ লাভ হয়। রাগক্ষয়হেতু লিঙ্গাভাব হয়, তজ্জন্য কেবলত্ব, নিরঞ্জনত্ব, এবং তন্নিমিত্ত শুদ্ধত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব জন্মে, ইহাই দ্বিতীয় প্রকার মোক্ষ। আর তৃষ্ণাক্ষয়হেতু যে মোক্ষ তাহাই তৃতীয় প্রকার বলিয়া কথিত হয়, (ঐ, ১০২।৭৯-৮০)। ব্রহ্মপুরাণে অন্যান্য পুরাণের মতই জীবন্মুক্তিবাদকে স্বীকার করা হইয়াছে। 'আশা পিশাচীবৎ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অখিল সুখকে দগ্ধ করে। 'আমি পূর্ণ' ইত্যাকার অসিদ্বারা উহাকে ছেদন করিয়া জীব জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়,' (ব্রহ্মপুরাণ, ১৩৯।১৭)।

দশম অধ্যায়

ধৰ্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মসংহিতায় মুক্তি

ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে মুক্তি

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বোধায়ণধর্ম্মসূত্র ও আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের মতই উল্লেখ করিব। অমৃত হওয়াকেই আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে মুক্তি বলা হইয়াছে। সমস্ত প্রাণিবর্গই আত্মার পুর (ঘর)। সেই গুহাশয়, অহন্যমান, পাপরহিত, অচল ও প্রাণী-গুহাবাসী ব্রহ্মকেই যাঁহারা নিজের আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।[১] আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মৃত্যুরহিতাবস্থার নামই অমৃত। জন্ম, মৃত্যুর উপলক্ষণাত্মক শব্দ, তাই জন্মমৃত্যুরহিতাবস্থাকেই 'অমৃত' শব্দে বুঝায়। জন্মমৃত্যু চিরতরে নিরোধ হইলে জীবকে আর দুঃখ পাইতে হয় না। ঋষি আপস্তম্ব মুক্তিতে জীব অমৃত হয় বলায় বুঝা গেল যে, মুক্তি জন্মমৃত্যু ও দুঃখরহিতাবস্থাই। মুক্তিতে জীব সর্ব্বগামী হয়।[২] অর্থাৎ মুক্তজীব সর্ব্বভূতে আত্মসত্তার উপলব্ধি করে, ইহাই 'সর্ব্বগামী' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। ক্ষেমপ্রাপ্তিকেও মুক্তি বলা হইয়াছে।[৩] ক্ষেম শব্দের অর্থ পরম মঙ্গল বা মোক্ষ। সুতরাং বলা যায় যে পরম মঙ্গল লাভ করাই মুক্তি। 'ক্ষেমকে পণ্ডিতগণই প্রাপ্ত হন'—"ক্ষেমং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ"। এই উল্লেখ হইতে বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিত (জ্ঞানী) ব্যক্তিই পরম মঙ্গলাবস্থালাভের একমাত্র অধিকারী, অপর কেহ নহে। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সর্ব্বত্র দর্শন করতঃ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হইয়া ব্রহ্মে বিরাজ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মই হন।[৪] সুতরাং আপস্তম্বের মতে অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্মভবনই মুক্তি। মুক্তাবস্থা এই মতে গৌতম ও কণাদ সম্মত দুঃখরহিত সুখানুভূতিশূন্য অবস্থা নহে। মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখবিনাশ হয় ইহা এই মতেও গ্রাহ্য, কিন্তু সুখানুভূতি যে থাকে না তাহা আপস্তম্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন মুক্তিতে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি থাকে।[৫] বেদান্তমতে যে বলা হইয়াছে মুক্তিতে আনন্দানুভূতি থাকে এই মত

১। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ১।২২।৪

২। ঐ, ১।২৩।৬

৩। "ক্ষেমং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ", ঐ, ১।২৩।৩

৪। "আত্মানং চৈব সর্ব্বত্র যঃ পশ্যেৎ স বৈ ব্রহ্মা নাকপৃষ্ঠে বিরাজতি"। ঐ, ১।২৩।৭

৫। "···যঃ পশ্যেৎ স মোদেত বিষ্টপে," ঐ, ১।২৩।৮

তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছে দেখা যায়। আপস্তম্বসূত্রে মুক্তিকে শান্তি, অমৃত, ক্ষেম, মোক্ষ ও ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আচার্য্য বোধায়ণ বলেন, ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) বা মুক্তজীব কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না বা ক্ষয়প্রাপ্তও হন না, তাঁহার আত্মা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া বেদবিৎ হন এবং সেইহেতু তিনি কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত বা পাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হন না।[১] উপরের মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, মুক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানই তাঁহার দ্বারা হউক না কেন, সে সকল কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহাই আচার্য্য বোধায়ণের মত। মুক্ত ব্যক্তির যদি কর্ম্মানুষ্ঠান থাকে মানা হয় তবে জীবন্মুক্তিবাদও ধর্ম্মসূত্রের মতে স্বীকৃত হইল বলিতে হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জীবন্মুক্ত কর্ম্মের দ্বারাও লিপ্ত হন না এবং পাপের দ্বারাও স্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বদাই নির্লেপ ভাবে অবস্থান করেন। আপস্তম্বের পূর্ব্বাচার্য্যগণও মনে করিতেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিধিনিষেধের অতীত, তাঁহার কিছুই করণীয় বা অকরণীয় নাই।[২] অতএব বলা যাইতে পারে যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিধিনিষেধের বহির্ভূত। তিনি সত্য-মিথ্যা, সুখদুঃখ, স্বাধ্যায় ও অধ্যয়ন, ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ও পরলোকে স্বর্গাদির আকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া আত্ম-উপাসনায় তৎপর থাকিবেন।[৩] ঐ পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত আপস্তম্ব পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানে শুভাশুভ নাশ হয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই আত্মজ্ঞানীর (জীবন্মুক্তের) জন্য বিধি ও নিষেধের উল্লেখ আছে— "তচ্ছাস্ত্রৈর্বিপ্রতিষিদ্ধম্", (ঐ, ২।২১।১৫)। জীবন্মুক্তের দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তাহা তাঁহার পূর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানলব্ধ স্বভাব বশেই হয়। সুতরাং বলা যায় না যে, জীবন্মুক্ত স্বৈরাচারী হন। জীবিতাবস্থায়ই জ্ঞানী দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভ করেন—"বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণমিহৈব ন দুঃখমুপলভেত," আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২।২১।১৬)। আত্মজ্ঞানের দ্বারা ক্ষেম প্রাপ্তি হয়, এইখানেই হয়, কারণ জ্ঞানীমাত্রেরই দুঃখবোধ থাকে না। জ্ঞানীর দুঃখবোধ যেরূপ ইহলোকে থাকে না, সেইরূপ দেহপাতের পরেও দুঃখভয় থাকে না, (দ্রষ্টব্য ঐ, ২।২১।১৭)।

১। বোধায়ণ ধর্ম্মসূত্র, ২।৬।৩৩
২। "সর্ব্বতঃ পরিমোক্ষমেকে," আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২।২১।১২
৩। "...পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ," ঐ, ২।২১।১৩

ধর্ম্মসংহিতার মতে মুক্তি

আমরা ধর্ম্মসংহিতার মতে মুক্তির চর্চ্চা করিতে যাইয়া হারীত, দক্ষ, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতা প্রভৃতিতে উল্লিখিত মুক্তিরই বর্ণনা করিব।

হারীতসংহিতার মতে মুক্তি

মুক্তিকে পরমস্থানপ্রাপ্তি বলা হয়। পরমস্থানপ্রাপ্ত হইলে জীবকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তজীবের চিরদিনের জন্যই জন্মমৃত্যু বন্ধ হইয়া যায়—"প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে," (ঐ, ৬।২২)। সমস্ত সংসারবন্ধনের নিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে। মুক্তিতে জীব অমৃতস্বরূপ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। অমৃতস্বরূপ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তিই মুক্তি—"সন্মুচ্য সংসার-সমস্তবন্ধনাৎ, স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্," (ঐ, ৬।২৩)। হারীত-সংহিতা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদকে মুক্তির সাধন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মুক্তি জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়ের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাশ্বত ব্রহ্ম-প্রাপ্তিকেও মুক্তি বলা হইয়াছে, (ঐ, ৭।১১)। মুক্তিতে দেহদ্বয়কে ত্যাগ করতঃ জীব শীঘ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। দেহদ্বয় হইতে মুক্ত হইলেও জীবের কখন বিনাশ হয় না—"দেহদ্বয়ং বিহায়াশু মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ। ন তথা ক্ষীণ দেহস্য বিনাশো বিদ্যতে ক্বচিৎ", (ঐ, ৭।১২)। তাই এখানে বৌদ্ধধর্ম্মমতের শূন্যে পর্য্যাবসানরূপ মুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। মুক্তিকে পরমগতিলাভ বলা হয়—"তেযান্তি পরমাং গতিম্", (ঐ, ৭।১৮)। দেহান্তে অনন্ত সত্যসুখস্বরূপ সনাতন বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিই মুক্তি, (ঐ, ৭।২১)।

দক্ষসংহিতার মতে মুক্তি

মুক্তিতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয় ইহাই দক্ষের মত।[১] স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে পদ তাহা অশাশ্বত বা ক্ষয়শীল কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে পদ তাহা শাশ্বত, ধ্রুব ও অক্ষয়—"চতুর্ণাং সন্নিকর্ষেণ পদং যত্তদশাশ্বতং। দ্বয়োস্তু সন্নিকর্ষেণ শাশ্বতং ধ্রুবমক্ষয়ম্", (ঐ, ৭।২২)। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্নিকর্ষরূপ শাশ্বত, ধ্রুব ও অক্ষয় পদপ্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তিকে তাই ব্রহ্ম বলা হয়, কারণ একমাত্র ব্রহ্মই শাশ্বত, ধ্রুব ও অক্ষয়। একমাত্র জ্ঞানীই (মুক্তই) ব্রহ্মের স্বরূপের আস্বাদ প্রাপ্ত হন। জন্মাবধি যে অন্ধ সে যেরূপ ঘট দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানীর পক্ষেও

১। দক্ষসংহিতা, ৭।১১

ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। ব্রহ্ম বা মুক্তি কি তাহা জ্ঞানীই উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যকে তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না, (দক্ষসংহিতা, ৭।২৪)।

গৌতমসংহিতার মতে মুক্তি

আটপ্রকার আত্মগুণ প্রাণীমাত্রেরই আছে। যথা, দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলবিধান, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা। যাহার উক্ত আটপ্রকার গুণ নাই সে কখনও ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করিতে পারে না এবং যাহার উক্ত প্রকার গুণ আছে সে ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয়। তাই এই সংহিতার মতে সাযুজ্য বা সলোকতা প্রাপ্তিই মুক্তি, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৮।৮)।

মনুসংহিতার মতে মুক্তি

সম্যক্ দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয় না, আর সম্যক্ দর্শন-বিহীন (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারশূন্য) জীব এই জন্মমরণরূপ সংসারকে প্রাপ্ত হয়— "সম্যগ্ দর্শনসম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ন নিবধ্যতে। দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে" ॥ (মনুসংহিতা, ৬।৭৪)। মেধাতিথি এই মন্ত্রের "কর্ম্মভির্ননি-বধ্যতে" শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, জ্ঞানী "সংসারংনানুবর্ত্ততে"। অর্থাৎ জ্ঞানীর পুনরায় সংসারাগমন হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই গমনাগমনের চিরতরে নাশই মুক্তি। মনুসংহিতায়ও ঐ কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। "কর্ম্মভির্ননিবধ্যতে"—'কর্ম্মের দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয় না', ইহাতে বুঝা যায় না যে জ্ঞানী কোন কর্ম্মই করেন না। জ্ঞানী অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন বলিয়াই উহাদ্বারা তাঁহার বন্ধনগ্রস্ত হইবার ভয় থাকে না, ইহাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। আরও বলা সঙ্গত মনে হইতেছে যে, জ্ঞানীর অন্য কোন কর্ম্ম না থাকিলেও দেহারম্ভক পাপপুণ্য (প্রারব্ধকর্ম্ম) থাকে এবং উহা ভোগ বিনা নষ্ট হয় না। তাই কর্ম্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না বলিলে ইহাও বলা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না যে, জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মও থাকে না। জ্ঞানীকেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কামতাহেতু অন্যকোন কর্ম্ম সঞ্চয়ের অভাব বশতঃ এই দেহ পাত হইলে পুনরায় তাঁহাকে সংসারে অনুবর্ত্তন করিতে হইবে না। এই অপুনর্ভবতাই মুক্তি। মুক্তি এই দেহে অবস্থান কালেই লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মত্বলাভের নাম মুক্তি। ইহা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মত্বলাভ ইহলোকে ইহশরীরে বর্তমান থাকিয়াই হয়।

এই কথা মনুসংহিতায়ও বহুস্থানে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—"ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। (মনুসংহিতা, ১২।১২০)। 'ইহলোকে জীবিত থাকিয়াই জীব ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হয়'। অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে, "সাধয়ন্তীহ তৎপদম্"[১]—'ইহলোকেই তাঁহার পদ (ব্রহ্মপদ) লাভ হয়'। কুল্লুকভট্ট এই মন্ত্রের টীকায় বলিয়াছেন, "ইহলোকে তৎপদং ব্রহ্মাত্যন্তিকলয়লক্ষণং প্রাপ্নুবন্তি"। অর্থাৎ ইহলোকেই ব্রহ্মাত্যন্তিকলয়লক্ষণরূপ তাঁহার পদ (ব্রহ্মপদ) লাভ হয়। এই ব্রহ্মপদলাভই মুক্তি। ব্রহ্মপদলাভরূপ মুক্তিতে সমস্ত পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়।[২] মুক্তিকে স্বারাজ্যলাভ বলা হইয়াছে।[৩] পরমাত্মবৎ স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ হওয়াই স্বারাজ্যলাভ।[৪] স্বারাজ্যলাভ আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি একই কথা।[৫] এই স্বারাজ্যলাভই মোক্ষ।[৬] মুক্তিকে সিদ্ধিপ্রাপ্তিও বলা হইয়াছে, (দ্রষ্টব্য ঐ, ১৭।১১ উপর মেধাতিথির ভাষ্য)। মুক্তিকে পরমাগতি-লাভ, পরমপদলাভ ইত্যাদির দ্বারাও বুঝান হইয়াছে, দ্রষ্টব্য ঐ, ১২।১১৬ ও ১২।১২৫)।' আমরা পূর্ব্বে জীবন্মুক্তের কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। এখানে ঐ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবুদ্ধিদ্বারা সমস্তই দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার কাছে শত্রুভাব ও মিত্রভাব নাই, (দ্রষ্টব্য ঐ, ৬।৪৪)। 'তিনি জীবন বা মরণ উভয়ের কোনটিই কামনা করেন না। ভৃত্য যেমন ভৃতি পরিশোধের জন্য প্রভুর নির্দ্দেশের অপেক্ষা করে, নিজের ইচ্ছায় কিছুই করে না, মুক্ত ব্যক্তিও ঐরূপ কালের প্রতীক্ষায় থাকেন, নিজে কোন অবস্থা লাভালাভের ইচ্ছা পোষণ করেন না'—"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকোযথা"। (মনুসংহিতা, ৬।৪৫)। আমরা বলিব যে, মনের নাশ হইলেই যখন মুক্তিলাভ হয় তখন জন্মমরণের ইচ্ছা কেন, কোন ইচ্ছাই জীবন্মুক্তের থাকিতে পারে না।

যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি সংহিতার মতে মুক্তি

'যোগী সমস্ত সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং তিনি কোন বেদনাকেই প্রাপ্ত হন না'- "যোগীমুক্তশ্চ সর্ব্বাসাং যো ন চাপ্নোতি বেদনাম্"। (যাজ্ঞবল্ক্য

১। মনুসংহিতা, ৬।৭৫
২। "সবিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধি গচ্ছতি"। মনুসংহিতা, ৬।৮৫
৩। "স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি," ঐ, ১২।৯১
৪। ঐ, ১২।৯১ উপর মেধাতিথির ভাষ্য।
৫। "স্বারাজ্যং ব্রহ্মত্বং লভতে," ঐ, ১২।৯১ র কুল্লুকভট্টের টীকা।
৬। ঐ, ১২।৯১ র কুল্লুকভট্টের টীকা।

সংহিতা, অধ্যাত্ম প্রকরণ, ১৪৩)। যোগীর যখন সমস্ত সুখদুঃখ ও বেদনা নাই, তখন তিনিই মুক্ত পুরুষ, কারণ এই সুখদুঃখ শূন্যাবস্থার নামই মুক্তি। যাঁহার পরমতত্ত্বের সহিত যোগ বা মিলন হইয়াছে তিনি যোগী। পরমতত্ত্বের দর্শন হইলে সমস্ত কর্ম্ম ও বাসনা ধ্বংস হইয়া যায়, ইহা উপনিষদ্ ও গীতা-শাস্ত্রে বহুধা উক্ত হইয়াছে। তাই যোগীর বাসনার নাশ হওয়ায় তাঁহাকে সুখদুঃখ বা বেদনা কিছুই পাইতে হয় না, ইহা সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রই এক কথায় স্বীকার করিয়াছেন। এই যোগসিদ্ধ পুরুষ এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্বকেই প্রাপ্ত হন—"সিদ্ধে যোগে ত্যজন্‌দেহমমৃতত্বায় কল্পতে", (ঐ, অধ্যাত্মপ্রকরণ, ২০৩)। এই অমৃতত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মতে দেখা যাইতেছে যে, সুখদুঃখ হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়া যোগী একবার মুক্ত হন এবং দেহপাতের পর অমৃতত্ব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়া আর একবার মুক্ত হন। প্রথমটিকে জীবন্মুক্তাবস্থা ও দ্বিতীয়টিকে বিদেহমুক্তাবস্থা বলা হয়।

বশিষ্ঠসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, মুক্তব্যক্তি ভিক্ষালাভ না করিলেও বিষণ্ণ হন না বা লাভ করিলেও আনন্দিত হন না। তিনি প্রাণধারণ উপযোগী মাত্র আহার গ্রহণ করেন এবং বিষয়সঙ্গ করেন না। তিনি কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহাদিতে নিঃশঙ্ক। তাই তিনিই যথার্থ মোক্ষবেত্তা।[১] মোক্ষলাভ না করিলে উপর্য্যুক্ত ভাবে চিত্তের সমতা লাভ হয় না। আর এই সকল গুণ লাভ না করিয়া মোক্ষ কি তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না। তাই মোক্ষবিদ্‌ই মোক্ষ কি বুঝিবেন, অন্যের পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব নহে।[২]

১। "... ..ষস্যবৈ মোক্ষবিত্তমঃ", বশিষ্ঠ সংহিতা, দশম অধ্যায়।

২। দক্ষসংহিতা, ৭।২৪

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম্মমতে মুক্তি বা নির্ব্বাণ

প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগ হইতেই 'নির্ব্বাণ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় জীবের পরমার্থ, এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ফাদার চালম্যান দেখাইয়াছেন যে, নির্ব্বাণ শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ মহাভারতেও রহিয়াছে।[১] এই শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল নেতিবাচক বা অভাবব্যঞ্জক। কালক্রমে ইহা অস্তিবাচক বা ভাবব্যঞ্জক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা নির্‌+'বা' ধাতু হইতে এই শব্দের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। পাণিণির "নির্বাণোঽবাতেঃ" (৮।২।৫০)—'নির্ব্বাণ বায়ুরহিতাবস্থা' সূত্র হইতে 'বাত' (বা বাতাস) সম্পর্কে 'নির্বাত' শব্দের 'ত' 'ন' য়ে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং নির্ব্বাণ শব্দের ধাতুগত অর্থ সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মতে বায়ুপ্রবাহের বিরতি।[২] অর্থের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া শব্দটি (নির্ব্বাণ) প্রদীপের নিভিয়া যাওয়া বুঝায়। দার্শনিক দৃষ্টিতে নির্ব্বাণ অর্থ প্রাণবায়ুপ্রবাহের বিরতি, জীবনদীপের চিরতরে নিভিয়া যাওয়া। পালি ভাষায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, 'চিত্তের মুক্তি প্রদীপ নির্ব্বাণবৎ। ধীরগণ (পণ্ডিতগণ) নির্ব্বাণ লাভ করেন, যেমন প্রদীপ'। 'অভিধর্ম্মমহাবিভাষ' নামক হীনযানীদের একখানি দার্শনিক অভিধান কেবলমাত্র হুয়েং সংয়ের চীন ভাষান্তরে বর্ত্তমান আছে। উহাতে নির্ব্বাণ শব্দের নিম্নোদ্ধৃত চতুর্বিধ ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

ক। 'বান' অর্থ 'জন্মান্তরের পথ', এবং 'নির্' অর্থ 'পরিত্যাগ করিয়া, অথবা 'উহা হইতে দূরে থাকিয়া'। সুতরাং 'নির্ব্বাণ' অর্থ জন্মান্তরের সকল পথ চিরতরে পরিত্যাগ করা'।

খ। 'বান' অর্থ 'দুর্গন্ধ,। 'নির্' অর্থ 'না'। নির্‌+বান=বিরক্তি-কর কর্ম্মপরম্পরার দুর্গন্ধ হইতে মুক্তি।

গ। 'বান'='নিবিড় বন'। নির্‌='স্থায়ী নিষ্কৃতি'। নির্‌+বান=লোভ, অসূয়া ও মূঢ়তারূপ অগ্নিত্রয় ও সৃষ্টি, স্থিতি, লয় রূপ বস্তুর অবস্থাত্রয় ও স্কন্ধরূপ নিবিড় বন হইতে স্থায়ী নিষ্কৃতি।

১। See Y. Sogen, System of Buddhistic Thought, p. 31

২। ভট্টোজী দীক্ষিত পাণিণির (৮।২।৫০) সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন। যথা, "নির্ব্বাণঃ অগ্নিঃ"; 'নির্ব্বাণঃ মুনিঃ"; "নির্ব্বাণঃ বাতঃ"।

ঘ। 'বান' = বয়ন'। 'নির্' = না'। সুতরাং নির্ + বান = সেই অবস্থা, যাহাতে বিরক্তিকর কর্ম্মসূত্রের অভাব হয় এবং জন্মমৃত্যুরূপ বসন বয়ন করা হয় না।[১]

নেতিবাচক বা অভাববাচক অর্থে নির্ব্বাণ হইল কামনা, অসূয়া ও মূঢ়তারূপ অগ্নিত্রয়ের অবসান। অর্থাৎ ইহা সকল স্বার্থবুদ্ধির সম্যক্‌নাশ করিয়া দুঃখ দূর করে এবং জন্মমৃত্যুর চক্রাবর্ত্তন হইতে পরানিষ্কৃতি সাধন করে।

ভাবব্যঞ্জক বা অস্তিবাচক অর্থে উদারতা, প্রেম এবং প্রজ্ঞারূপ শীলত্রয়ের অভ্যাসই হইল নির্ব্বাণ। অর্থাৎ পরহিতৈষণা, পবিত্র হৃদয়ে শান্তির অনুশীলন ও অজ্ঞানাদি বন্ধননিরাকরণই নির্ব্বাণ। প্রকৃতপক্ষে উহারা নির্ব্বাণের সাধন বলিয়াই উহাদিগকেও নির্ব্বাণ বলা হয়। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে নির্ব্বাণের ভাবব্যঞ্জক স্বরূপ অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

'জ্ঞানী আর্য্যশ্রাবক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হন না, উহাতে আনন্দ পান না এবং উহাতে ডুবিয়াও থাকেন না। ঐ জন্য তাঁহার তৃষ্ণার নিরোধ (উপশম) হয়। তৃষ্ণানিরোধের জন্য উপাদানের* নিরোধ হয়। উপাদানের নিরোধে 'ভব'র ** নিরোধ হয়। 'ভব'র নিরোধ হওয়াতে জন্ম নিরোধ (বন্ধ) হয়। পুনর্জ্জন্মের অভাবে মৃত্যু, শোক, ক্রন্দন, ও উৎপীড়ন প্রভৃতি দুঃখ ধ্বংস হয়। এই প্রকার নিরোধ হওয়ার নামই নির্ব্বাণ***।[২]

'নির্ব্বাণ সুখস্বরূপ। নির্ব্বাণ যে সুখস্বরূপ তাহা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুভব করেন এবং অপরেও (যাঁহারা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন নাই) অনুভব করেন। যেমন কোন এক ব্যক্তির হস্তপদাদি কাটিয়া ফেলিলে ঐ ব্যক্তির ক্রন্দন শ্রবণে অপর ব্যক্তিরাও হস্তপদাদির কর্ত্তনে যে দুঃখ তাহা অনুভব করেন, সেইরূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সন্তোষ ও প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন নাই, তিনিও বুঝিতে পারেন যে নির্ব্বাণ সুখস্বরূপ'।[৩]

'যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, ঐরূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও কোন ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না বলিয়া, উহাকে

---

1 See Y. Sogen : System of Buddhistic Thought, p. 31-33.

২। মিলিন্দ প্রশ্ন, ৩।১।৬

৩। মিলিন্দ প্রশ্ন ৩।১।৮

* উপাদান = দুরন্ত আকাঙ্খা।

** ভব = পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্ম।

*** এই নির্ব্বাণ পরিনির্ব্বাণ নহে। ইহা সোপাধিশেষ (স্কন্ধোপাধি থাকে) নির্ব্বাণ।

আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্ব্বাণ অবস্থায় ব্যক্তিত্বের সর্ব্বথা লোপ হইয়া থাকে' *।[১] 'সংসারে প্রায় সমস্ত বস্তুই কর্ম্মের, হেতুর অথবা ঋতুর কারণ বশতঃ উৎপন্ন হয় ; কিন্তু সংসারে এমন দুইটি বস্তু আছে যাহা কর্ম্মের, হেতুর বা ঋতুর কারণ বশতঃ উৎপন্ন হয় না। ঐ দুইটি, আকাশ এবং নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকারের মার্গ আছে সত্য বটে ; কিন্তু নির্ব্বাণকে উৎপন্ন করে এমন কোন হেতু নাই। নির্ব্বাণ উৎপাদ্য বস্তু নহে, এইজন্য উহার কোন হেতুর উল্লেখ করা হয় না এবং ঐ হেতুকে কেহ দেখাইয়া দিতেও পারে না। তাই নির্ব্বাণ হেতু-শূন্য বস্তু। নির্ব্বাণ বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের পরে বিদ্যমান। নির্ব্বাণকে কেহ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না, নাসিকা দ্বারা তাহার ঘ্রাণ লইতে পারে না, জিহ্বার দ্বারা স্বাদ লইতে পারে না এবং শরীরের দ্বারাও স্পর্শ করিতে পারে না। নির্ব্বাণকে মনের দ্বারা জানিতে পারা যায়। অর্হৎ পদকে প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষু বিশুদ্ধ, প্রণীত, ঋজু এবং আবরণ ও সাংসারিক কামনারহিত মনের দ্বারা নির্ব্বাণকে দর্শন করেন। অর্হৎ পদকে পাইয়া আর্য্যশ্রাবক বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বাণকে দর্শন করেন'।[২] মহারাজ মিলিন্দ নির্ব্বাণ যে সুখই, সুখস্বরূপই তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইয়া নাগসেনকে বলেন যে নির্ব্বাণে কিছু না কিছু দুঃখ আছে। তিনি বলেন, মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবান্‌কে (বুদ্ধকে) নিন্দা করিয়া কি বলেন নাই, "শ্রমণ গৌতম লোকের প্রাণ বাহির করিয়া দেন"।[৩] এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মিলিন্দ বলেন, নির্ব্বাণে কিছু না কিছু দুঃখ আছে। উত্তরে নাগসেন বলেন, নির্ব্বাণ সুখই, সুখস্বরূপই। নির্ব্বাণে যে দুঃখ আছে মনে করা হয়, যথার্থতঃ নির্ব্বাণে উহা (দুঃখ) নাই। নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিতে এবং খোঁজ করিতে দুঃখ করিতে হয় বটে, কিন্তু নির্ব্বাণে দুঃখ কিছুমাত্রই নাই। যেরূপ রাজা রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য বহু দুঃখ করেন, বহু দুঃখের পর তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং পরে সুখ ভোগ করেন। রাজ্য প্রাপ্তির জন্য (প্রাপ্তির পূর্ব্বে) দুঃখ করিতে হয় ; কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তিতে সুখ ভোগই হয়, সেইরূপ নির্ব্বাণেও হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য শরীর ও মনের তপস্যার প্রয়োজন অবশ্যই হয়। ভোজনে সংযম অবলম্বনতা, নিদ্রাকে অভিভূত করা,

১। মিলিন্দ প্রশ্ন, ৩।২।১৮

২। ঐ, ৩।২।১৮ (ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপের হিন্দি ভাষান্তর পৃ: ৩২৯-৩৩৩ দ্রষ্টব্য)।

৩। মজ্‌ঝিম নিকায়, 'মাগন্দিয় সুত্ত', ৭৫

* এখানে নির্ব্বাণ শব্দে পরিনির্ব্বাণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়কে জয় করা, প্রিয়জনদের প্রতি মায়া ছিন্ন করা প্রভৃতিতে বহু কষ্টই হইয়া থাকে সত্য বটে, কিন্তু নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, উহা সুখস্বরূপই। যেরূপ শত্রুকে দমন করার পরে রাজার রাজ্যসুখ হয়, সেইরূপ নির্ব্বাণেও হইয়া থাকে। তাই নির্ব্বাণ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু'।[১] 'নির্ব্বাণের রূপ, স্থান, কাল ইত্যাদি উপমার দ্বারা, ব্যাখ্যার দ্বারা, তর্কের দ্বারা এবং কারণ দেখাইয়া নির্ণয় করা যায় না। যেরূপ অরূপকায়িক দেবতা থাকা সত্ত্বেও উহার রূপ, স্থান, কাল ইত্যাদি উপমার দ্বারা, ব্যাখ্যার দ্বারা, তর্কের দ্বারা ও কারণ দেখাইয়া নির্ণয় করা যায় না, ঐরূপ নির্ব্বাণকে কেহ বুঝাইতে পারেন না। নির্ব্বাণের উৎপত্তিও নাই, কেহ উৎপন্ন করিতেও পারেন না। নির্ব্বাণ *শান্ত, সুখ। বুদ্ধের উপদেশানুসারে যথার্থ রাস্তায় চলিয়া সকল সংসারকে অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও অনাত্মারূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হয়। বিঘ্ন রহিত হইলে, নিরূপদ্রব হইলে, অভয় প্রাপ্ত হইলে, কুশল লাভ করিলে, শান্ত হইলে, সুখপ্রাপ্তি হইলে, প্রসন্ন হইলে, নম্র হইলে, শুদ্ধ হইলে এবং শীল পালন করিলে, নির্ব্বাণের সাক্ষাৎকার হয়'।[২] 'চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং পরিণায়ক রত্ন, এই সাত রত্ন চক্রবর্ত্তী রাজার আছে'।[৩] এই সকল রত্নপ্রাপ্তির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। উহাদের প্রাপ্তির জন্য ব্রত পালন করিলেই রাজা উহাদিগকে প্রাপ্ত হন। ঐরূপ নির্ব্বাণের অবস্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনকে বশ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র নির্ব্বাণের সাক্ষাৎকার হইতে পারে।[৪]

মিলিন্দ প্রশ্ন হইতে নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হইল। এখন আমরা বুদ্ধধর্ম্মের দুই শাখার (মহাযান ও হীনযান) মতে নির্ব্বাণ কি তাহারই সাধারণ ভাবে আলোচনা করিব।

মহাযানমতে নির্ব্বাণ

মহাকবি অশ্বঘোষ বলেন, নির্ব্বাণ কোথায় বা কোনদিকে আছে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না। "দীপোযথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্। দিশং ন কিঞ্চিদ্ বিদিশং ন কিঞ্চিৎ স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতিশান্তিম্॥

১। মিলিন্দ প্রশ্ন (ভিক্ষুজগদীশ কাশ্যপের হিন্দি অনুবাদ পৃঃ ৩৮৪-৮৭ দ্রষ্টব্য)।
২। মিলিন্দ প্রশ্ন (ভিক্ষুজগদীশ কাশ্যপের হিন্দি অনুবাদ, পৃঃ ৩৮৭-৩৯৭ দ্রষ্টব্য)।
৩। দ্রষ্টব্য দীঘ্‌ঘনিকায়, চক্রবর্ত্তী সূত্র। *"নির্ব্বাণঃ শান্তঃ", মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
৪। মিলিন্দ প্রশ্ন (ভিক্ষুজগদীশ কাশ্যপের হিন্দি অনুবাদ, পৃঃ ৪০২ দ্রষ্টব্য)।

তথা কৃতী নিবৃ তিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্। দিশং ন কিঞ্চিৎ বিদিশং ন কিঞ্চিদ্ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্" ॥[১] অর্থাৎ নির্ব্বাপিত দীপ পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, কোন দিকেও যায় না বা কোন বিদিকেও যায় না। স্নেহ (তৈল) ক্ষয় হইলে কেবল শান্তিকে প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ জ্ঞানী পুরুষ কোথায়ও যান না, পৃথিবীতেও না, অন্তরীক্ষেও না, কোন বিদিকেও যান না বা কোন দিকেও যান না। কেবল ক্লেশ ক্ষয় হইয়া গেলে তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। গমনাগমন বন্ধ হওয়াই শান্তি। নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনর্জ্জন্ম নিরস্ত হইয়া যায়।[২] জন্ম নিরস্ত হওয়ায় মৃত্যুও স্বভাবতঃ নিরস্ত হয়। ইহাই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এইভাবে অজ্ঞতা নিরাকৃত হইলে মন (আলয় বিজ্ঞান) আর অহং বুদ্ধি বশে বিক্ষুব্ধ হয় না। মন বিক্ষুব্ধ না হইলে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধ দুর হইয়া যায়। যখন এই ভাবে বিভ্রান্তির মূল, প্রসার ও তাহার ফল চিত্তসংক্ষোভ পরম্পরা দুরীকৃত হয়, তখনই নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে; এবং সেই বিচিত্র স্বয়ং প্রবৃত্ত চেষ্টার অভিব্যক্তি লাভ হইল বলা যায়"।[৩] উহার আধারে সুজুকি মন্তব্য করিয়াছেন, 'লক্ষ্য করিতে হইবে নির্ব্বাণকে যেরূপ নিষ্ক্রিয়তা বা শূন্যতার নামান্তর মনে করা হয়, ইহা তাহা নয়'। অশ্বঘোষের মতানুসারে উহা অহং বুদ্ধির অবসান আত্মবুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি, 'তথতা'র যথাযথ জ্ঞান অথবা জগতের ঐক্য বোধ।[৪]

আচার্য্য নাগার্জ্জুন বলেন, "যঃ সংসার তন্নির্ব্বাণম্"। সংসার আর নির্ব্বাণ একই। পরমার্থতঃ সংসার যেরূপ নাই, নির্ব্বাণও সেইরূপ নাই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সংসার যেরূপ লক্ষণ শূন্য, নির্ব্বাণও সেইরূপ লক্ষণ শূন্য। তাই উভয়ই এক। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন, জগতের স্বভাবই নির্ব্বাণ। অর্থাৎ নির্ব্বাণ অর্থ নিঃসারতা। নির্ব্বাণ অবস্থায় জ্ঞানও নাই, প্রতীতিও নাই। স্বয়ং বুদ্ধও মায়া মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।[৫] নির্ব্বাণ মনুষ্য শব্দবাচ্য বা জ্ঞানগম্য নয় বলিয়াই উহাকে বুঝাইতে যাইয়া তিনি (নাগার্জ্জুন) অভাবাত্মক

১। অশ্বঘোষ, সৌন্দরনন্দ, ১৬।২৮, ২৬

২। করুণায়মানা জায়ন্তে মৃত্যুভয়বিমোহিতাঃ। নির্ব্বাণে স্থাপনীয়াস্তৎ পুনর্জ্জন্ম-নিবর্ত্তকে" ॥ অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত, ১৫।৩০

৩। T. Suzuki, Awakening of Faith in the Mahāyāna, P. 87

৪। ঐ, (foot note) P. 87

৫। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয়দর্শনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, নির্ব্বাণ অপ্রতীত, অসম্প্রাপ্ত, অনুচ্ছিন্ন, অশাশ্বত, অনিরুদ্ধ ও অনুৎপন্ন।[১] 'মাধ্যমিককারিকা'র বৃত্তিকার আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি নির্ব্বাণকে শূন্যতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নির্ব্বাণকে সর্ব্ব প্রপঞ্চের মতনই শূন্য বলিতে হয়।[২] নির্ব্বাণকে শূন্যতা বলিবার কারণ এই যে, যখনই কেহ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন তখনই তাঁহার নিকট হইতে আত্মা ও জগৎ উভয়ই অস্তমিত হয়। আত্মা ও জগৎ ততক্ষণ, যতক্ষণ না অবিদ্যা বিদূরিত হয়। অবিদ্যার আবরণ অপসারিত হইলে তখন সংসার সংঘটনকারী উপাদান শিথিল হইয়া পড়ে। তখন জগৎ ও আত্মা উভয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাই নির্ব্বাণ। এই অবস্থার কোনই ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না এবং মনুষ্যের কোন ভাষা নাই বা জ্ঞান নাই যাহার দ্বারা এই নির্ব্বাণকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।[৩] তাই নির্ব্বাণের সহিত শূন্যতার তুলনা করা হইয়াছে। এই নির্ব্বাণকে ভাব বা অভাব কিছুই বলা চলে না। 'রত্নাবতী' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে ভাবাভাবরূপ পরামর্শক্ষয়কেই নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে—"ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা। ভাবাভাবপরামর্শক্ষয়ো নির্ব্বাণমুচ্যতে"। (রত্নাবতী)। জগতের এবং আত্মার ধর্ম্ম হইতেছে ভাব এবং অভাব। ভবসন্ততির অভাবই নির্ব্বাণ, "নির্ব্বাণকালে বোচ্ছেদঃ প্রসঙ্গাদ্‌ ভবসন্ততেঃ"। (নাগার্জ্জুন, মাধ্যমিকসূত্র, পৃষ্ঠা ১৫৩)। সুতরাং উহাকে ভাবাভাব কিছুই বলা চলে না। নির্ব্বাণ অনির্ব্বচনীয়। তৃষ্ণার বিপ্রহান দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ হয়—"তৃষ্ণয়া বিপ্রহানেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে"। (রত্নমেঘ)। 'রত্নকূটস্মৃত্রে' বুদ্ধ নিজে বলিয়াছেন যে, রাগ (আসক্তি), দ্বেষ ও মোহ (অজ্ঞান) ক্ষয় হইলেই পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়—"রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণম্‌" ॥ (রত্নকূটসূত্র)। শান্তিদেব তাঁহার 'বোধিচর্য্যাবতার' গ্রন্থে সর্ব্বত্যাগকেই নির্ব্বাণ বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্যাগশ্চ নির্ব্বাণং নির্ব্বাণার্থি চমে মনঃ"। (বোধিচর্য্যাবতার)। শ্রীযুক্ত মাউঙ্গতিন বলেন, হীনতার চিরমুক্তিই নির্ব্বাণ।[৪] ভিন্ন দৃষ্টিতে সংসারের সাথে তুলনা করিলে

১। মাধ্যমিককারিকা, ২৫।৩

২। "তস্মাৎ শূন্যতৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চবৃত্তিলক্ষণত্বাৎ নির্ব্বাণমিত্যুচ্যতে"। চন্দ্রকীর্ত্তি, মাধ্যমিকবৃত্তি, পৃঃ ১২৫

৩। "অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা। শ্রূয়তে যস্য তচ্চাপি সমারোপাদনক্ষরঃ" ॥ মাধ্যমিককারিকা, পৃঃ ৯৪

৪। Mr. Maung Tin says, it is "final release from the lower nature' See Attahasālinī, p. 409 (Expositor vol. II, p. 518)

ইহা স্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, নির্ব্বাণ ধ্রুব, শুভ ও সুখই।[১] 'সুমঙ্গলবিলাসিনী' গ্রন্থে নির্ব্বাণকে একটি পরম সুখদায়ক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২] 'মিলিন্দ প্রশ্নে' যে নির্ব্বাণকে সুখস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণই নির্ব্বাণের দুইটি স্তর আছে বলিয়া মনে করেন। প্রথমটি 'সোপাধিশেষ' (স্কন্ধউপাধি থাকে) নির্ব্বাণ, দ্বিতীয়টি 'অনুপাধিশেষ' (কোন উপাধি থাকে না) নির্ব্বাণ। এই দ্বিবিধ নির্ব্বাণকে কখন কখন 'নির্ব্বাণ' ও 'পরিনির্ব্বাণ' শব্দ দ্বারাও বুঝান হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ অবস্থায় কামনা, শোক, দুঃখ, প্রভৃতির নির্ব্বাণ হইয়াছে, কিন্তু দেহ অবশেষ আছে। এই অবস্থার নাম ক্লেশনির্ব্বাণাবস্থা। পরিনির্ব্বাণে কিছুই থাকে না। তাই এই অবস্থাটিকে ক্লেশ ও স্কন্ধনির্ব্বাণাবস্থা বলে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ পরিনির্ব্বাণে যে চেতন সত্বার নাশ হয় তাহা মনে করিতেন না। তাই 'সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থে এই অবস্থাকে মলশূন্য চেতন সত্বার ধারা প্রবাহমাত্র বলা হইয়াছে। 'মিলিন্দ প্রশ্নে' এই অবস্থাকে শান্তি, স্থৈর্য্য, আনন্দ, সুখ ও পবিত্রতাপূর্ণ একটি অবস্থা মাত্র বলা হইয়াছে।[৩] আবার ঐ গ্রন্থে এরূপও বলা হইয়াছে যে পরিনির্ব্বাণের পর ভগবান্ বুদ্ধ আর নাই। তাঁহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না। শুধু মাত্র তাঁহার উপদেশ বাণীর মধ্যেই তাঁহাকে মিলিবে।[৪] ইহাতে মনে হয় পরিনির্ব্বাণের পর জীবের কিছুই অবশেষ থাকে না। মহাযান মতে উপর্য্যুক্ত দুই প্রকার নির্ব্বাণের সহিত আর এক প্রকার নির্ব্বাণের কথা বলা হইয়াছে। উহাকে অপ্রতিষ্ঠিত নির্ব্বাণ কহে। পরার্থসাধনের জন্যই এই নির্ব্বাণের কল্পনা করা হইয়াছে। এইখানেই হীনযান ও মহাযানের মতে নির্ব্বাণের ভেদ। পরে এই ভেদের বিষয় আর কিছু বলিতে ইচ্ছা রহিল।

মহাযান সম্প্রদায়ের দুই শাখা—বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ। এই দুই শাখায় নির্ব্বাণের স্বরূপসম্বন্ধে যে কোন মতভেদ আছে মনে হয় না। উপর্য্যুক্ত নির্ব্বাণের স্বরূপই উভয় শাখায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

১। 'Nibbāna' an article by Rev. Nārada in B. C. Law edited Buddhistic Studies, ch. xx. p. 568

২। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭

৩। মিলিন্দ প্রশ্ন, ২।৪।২১

৪। ঐ, ৩।৫।৬

হীনযানমতে নির্ব্বাণ

মহাযান সম্প্রদায়ের মতে নির্ব্বাণের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা হইতে হীনযান সম্প্রদায়ের মতের নির্ব্বাণে যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে তাহা নহে।[১] তথাপি হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থে নির্ব্বাণকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা নিয়ে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মানব তিন প্রকার দুঃখদ্বারা উৎপীড়িত হয়। ১। দুঃখ দুঃখতা (অর্থাৎ ভৌতিক এবং মানসিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন ক্লেশ)। ২। সংস্কার দুঃখতা (অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল জাগতিক বস্তু হইতে উৎপন্ন ক্লেশ)। ৩। বিপরিণাম দুঃখতা (অর্থাৎ সুখ দুঃখরূপে পরিণত হওয়ায় উৎপন্ন ক্লেশ)। যতক্ষণ মানব কামধাতু, রূপধাতু এবং অরূপধাতুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই তিন প্রকার দুঃখের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পায় না। এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় হইল আর্য্যসত্যের জ্ঞান, সাংসারিক পদার্থের অনিত্যতা উপলব্ধি ও অনাত্মতত্ত্বজ্ঞান। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন ও জগতের সমস্ত পদার্থে আত্মার অস্তিত্ব নাই এই জ্ঞান স্থির হইলেই ভিক্ষু উক্ত ক্লেশের হাত হইতে সর্ব্বকালের জন্য মুক্তি প্রাপ্ত হন। 'ধর্ম্মপদ' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের বিনাশ ও দুঃখ বিনাশের পন্থা এই চারিটির জ্ঞানই হইল পরমার্থ জ্ঞান।[২] মানুষের এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের আশ্রয় লওয়া উচিত। এবং উক্ত জ্ঞানের অনুসরণ করিয়াই মনুষ্য সকল দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে,—"এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি", (ধম্মপদ, বুদ্ধবগ্‌গো, পৃঃ ৫৭)। সর্ব্ব দুঃখের উপরমই নির্ব্বাণ বা মুক্তি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। নিঃশেষ রূপে ক্লেশের নাশ হইলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে অর্হতাবস্থা কহে। অর্হৎকে ক্রিয়মান কর্ম্মের ফল স্পর্শ করিতে পারে না—"অনবসেসকিলেসপহানেন অরহানাম হোতি খীনাসবো"। (পরমত্‌থজোতিকা)। এই অবস্থায় কোন ভোগ নাই এবং ইন্দ্রিয়জ সুখ নাই।[৩] যদি কেহ কখনও বিষপান করিয়া থাকেন,

---

১। The exposition of the term Nirvāna as given in the works of Northern School, does not materially differ from that given in those of the Southern School. See 'Nirvāna' an article by Sri Satish Chandra Vidyabhusan in the Journal (Part I) of the Buddhist Text—1868. p. 27

২। এইরূপ উক্তি যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যেও দৃষ্ট হয়।

৩। বিশুদ্ধিমার্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩

তবে তিনি যেমন বিষনিবারক ঔষধ সেবনে ইচ্ছুক হন, তেমনটিই ভিক্ষু জাগতিক জীবনে কাতর হইয়া অমৃতস্বরূপ অর্হতাবস্থার জন্য প্রার্থী হন।[১] যিনি ধ্যান ও জ্ঞানকে লাভ করিয়াছেন তিনিই এই অর্হতাবস্থারূপ নির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন।[২] 'ধৈর্য্য পরম তপস্যা, তিতিক্ষা পরম (যথার্থ) নির্ব্বাণ'—"খণ্ডী পরমং তপো তিতিক্খা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা", (ধম্মপদ, বুদ্ধ-বগ্‌গো, পৃঃ ৫৫)। আসক্তি (রাগ) হইতে আর অধিক অগ্নি নাই, দ্বেষ হইতে আর পাপ (কলি) নাই, স্কন্ধাদি (পঞ্চস্কন্ধ) হইতে আর অসহ্য দুঃখ নাই, শান্তি (সন্তি) পরম সুখ। ক্ষুধাই পরম রোগ, সংস্কারই পরম দুঃখ। এই সকল যথার্থ রূপে জ্ঞাত হইলে জীব পরম সুখস্বরূপ নির্ব্বাণে প্রবেশ করে, (ধম্মপদ, সুখবগ্‌গো, পৃঃ ৫৯)। যেরূপ লোকে কুমুদকে জল হইতে নিজ অঙ্গুলীর দ্বারা তুলিয়া লয়, সেইরূপ আমারাও অহঙ্কারকে তুলিয়া (নাশ করিয়া) ফেলিব। ইহাই নির্ব্বাণের মার্গ, (ধম্মপদ, মগ্‌গবগ্‌গো, পৃঃ ৮০)। 'হে ভিক্ষু! তোমার নৌকার জল সেচ করিয়া হাল্কা কর। যখনই তুমি রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতিকে ছিন্ন করিতে পারিবে, তখনই তুমি নির্ব্বাণে প্রবেশ করিবে—' "সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং সিত্তাতে লউমেস্‌সতি। ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বনমেহিসি", (ধম্মপদ ভিক্খুবগ্‌গো পৃঃ ১০২)। উপর্য্যুক্ত অর্হতাবস্থাকে সোপাধিশেষ নির্ব্বাণ, সংক্ষেপে নির্ব্বাণ ও বেদান্তের ভাষায় জীবন্মুক্তি কহে। আর পরিনির্ব্বাণকে অনুপাধিশেষনির্ব্বাণ বা বেদান্তের ভাষায় বিদেহমুক্তি কহে। এই অবস্থাকে দিগ্‌ঘনিকায় (২।১৫) ও মজ্‌ঝিমনিকায় গ্রন্থে (৭২) দীপশিখা নিভিয়া যাওয়ারূপ অবস্থা বলা হইয়াছে। 'বিশুদ্ধিমার্গে' পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার) নিরোধকেই পরিনির্ব্বাণ বলা হইয়াছে, (বিশুদ্ধিমার্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬১১)। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আত্মা বলিয়া যাহা মনে করা হয় তাহা পঞ্চস্কন্ধের সংঘাত ব্যতীত কিছুই নহে। তৃষ্ণা ও কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে এই পঞ্চস্কন্ধ একত্রিত হইয়া যে আত্মারূপ ধারাস্রোত চলিতেছিল তাহা কালে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই পরিনির্ব্বাণ। এই পঞ্চস্কন্ধের সংঘাতরূপ আত্মাকেই অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকরা বুদ্ধ্যাদি সম্মিলিত আত্মা অর্থাৎ অধ্যস্ত অহং পদার্থ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরিনির্ব্বাণ বা বিদেহমুক্তিতে এই অধ্যস্ত অহং পদার্থেরই (আত্মার) নাশ হয়, পরমাত্মার নাশ হয় না।

হীনযান সম্প্রদায় দুই শাখায় (বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক) বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের মতে নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

১। বিশুদ্ধিমার্গ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৬৬ ২। ঐ, পৃঃ ২

বৈভাষিকমতে নির্ব্বাণ

বৈভাষিকেরা নির্ব্বাণকে প্রতিসংখ্যা নিরোধ কহে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাসহায়ে সাংসারিক সাস্রব ধর্ম্ম তথা সংস্কারের যখন অন্ত হয় তখন উহাকে নির্ব্বাণ কহে।[১] নির্ব্বাণ নিত্য, অসংস্কৃত ধর্ম্ম, স্বতন্ত্র সত্তা, ভাব বস্তু, পৃথক্ ভূত সত্য পদার্থ।[২] এই বিষয়ে সকল বৈভাষিকদের একমত দেখা যায় না। তিব্বতীয় পরম্পরায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে কোন কোন বৈভাষিক নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর চেতনার সর্ব্বথা নিরোধ হয় মানিয়া থাকেন। এখানে চেতনা শব্দে ক্লেশ-উৎপাদক সাস্রব সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত চেতনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সাস্রবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এইরূপ কোন চেতনা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পরও বিদ্যমান থাকে মানা হইত। তবে সামান্য ভাবে সকল বৈভাষিকগণই নির্ব্বাণকে অভাবাত্মক বলিয়াছেন। সংঘভদ্রের 'তর্কজ্বালা' গ্রন্থ হইকে প্রতীত হয় যে মধ্যভারতে বৈভাষিকদের এমন এক সম্প্রদায় ছিল যাঁহারা 'তথতা'নামক চতুর্থ অসংস্কৃত ধর্ম্ম মানিতেন। এই 'তথতা' বৈভাষিকদের অভাব পদার্থের সমান। বৈভাষিকদের মতে নির্ব্বাণ ক্লেশাভাবরূপ হইলেও ইহা (নির্ব্বাণ) সত্তাত্মক পদার্থ। বৈভাষিকগণ বৈশেষিকদের অনুরূপ অভাবকে পদার্থ বলিয়া মানেন। ভাব পদার্থের তুল্য অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। বৈভাষিকদের মতে নির্ব্বাণ ধাতু দুইপ্রকারের, সোপাধিশেষ এবং নিরুপাধিশেষ। 'জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রে' এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। এই দুই প্রকার নির্ব্বাণকে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি বলা হইয়াছে।

সৌত্রান্তিকমতে নির্ব্বাণ

সৌত্রান্তিকমতে বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয়ে ভৌতিক জীবনের চরম নিরোধকে নির্ব্বাণ কহে। এই অবস্থায় ভৌতিক সত্তা কোন প্রকারেই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এই জন্যই নির্ব্বাণকে ভৌতিক সত্তার অভাব বলা হয়। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর সূক্ষ্ম চেতনা বিদ্যমান থাকে বলিয়া সৌত্রান্তিকগণ মনে করেন। কিন্তু ভোটদেশ পরম্পরায় জানা যায় যে সৌত্রান্তিকদের এমন এক উপশাখা ছিল যাঁহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অর্হতের ভৌতিক সত্তারই কেবল নিরোধ হয় মনে করিতেন না, পরন্তু চেতনারও বিনাশ হয় মানিতেন। এই উপশাখার মতে

১। দ্রষ্টব্য যশোমিত্র, অভিধর্ম্মকোশ ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৬

২। ঐ, পৃঃ ১৭

নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই উঁহাদের মতে নির্ব্বাণ নিতান্তই অভাবাত্মক।

মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়দ্বয়ের মৌলিক পার্থক্য

অসংগ তাঁহার 'মহাযানসূত্রালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, 'যাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের নির্ব্বাণের জন্যই উৎসুক থাকেন তাঁহারা হীনযানী, আর যাঁহারা সকলের নির্ব্বাণের জন্যই উৎসুক তাঁহারা মহাযানী'। অসংগ উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিতেছেন, "নিঃস্নেহানাং শ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধানাং সর্ব্বদুঃখোপশমে নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিতং মনঃ। বোধিসত্ত্বানাং তু করুণাবিষ্টত্বাৎ নির্ব্বাণেঽপি মনঃ ন প্রতিষ্ঠিতং"।। (মহাযানসূত্রালঙ্কার, পৃঃ ১২৬-১২৭)। অর্থাৎ শ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধ স্নেহশূন্য, কারণ তিনি সকল দুঃখোপশমে (পরি) নির্ব্বাণের জন্যই নিজের চিত্তকে নিয়োজিত করেন, অপরের কথা চিন্তাও করেন না। আর বোধিসত্ত্ব করুণাযুক্ত হওয়ার দরুণ অপরকে বাদ দিয়া নিজের জন্য (পরি) নির্ব্বাণও আকাঙ্খা করেন না। বোধিসত্ত্বের এই অবস্থাটিকে অপ্রতিষ্ঠিত নির্ব্বাণাবস্থাও কহে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অপর দুঃখশোকাকুল জীবকে বাদ দিয়া নিজের পরিনির্ব্বাণ কামনাও থাকে না। শ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধের আদর্শটি হীনযানীরা গ্রহণ করিয়াছেন এবং বোধিসত্ত্বের আদর্শটি মহাযানীরা গ্রহণ করিয়াছেন।[১] বোধিসত্ত্বযানে প্রতিষ্ঠিত হইলে চিত্ত কিরূপ ভাবাপন্ন হয় সেই সম্বন্ধে বলা হইতেছে, 'হে সুভূতি! বোধিসত্ত্বযানে প্রকৃষ্টরূপে স্থিত হইলে এইরূপ চিত্ত উৎপাদন করা কর্ত্তব্য যাহাতে আমার দ্বারা সকল জীব অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণধাতুতে প্রবেশ করিতে পারে'—"ইহ হি সুভূতে বোধিসত্ত্বযানসংপ্রস্থিতেন এবং চিত্তমুৎপাদয়িতব্যং সর্ব্বে সত্ত্বা ময়া অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণধাতৌ পরিনির্ব্বাপয়িতব্যাঃ"। (বজ্রচ্ছেদিকা)। মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়দ্বয়ের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত এই প্রকার বিবরণ রহিয়াছে।[২]

১। "Arhat and the Pratyeka Buddha are inactive and unpassionate. They concentrate on their own spiritual uplift. But those who have the capacity for undergoing greater suffering in life are Bodhisattvas. They are active in order to be of help to the world'. P. C. Bagchi : Discourses on Buddhism in the Viswa Bhāratī quarterly, p. 254. vol. XIV Feb-April 1949.

২। Also see Hara Prosad Sastri : A Short Note of the Mahāyāna and Hīnayāna schools (in the Journal and Text, Part, II, 1894 Buddhist Text Society).

'হীনযান সম্প্রদায় এত নিন্দিত কেন ? ইহার কারণ এই যে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল একটিমাত্র আত্মার সংযমন, শান্তি এবং নির্ব্বাণ। তাঁহারা সমস্ত শীলের আচরণ করেন মাত্র নিজ নিজ আত্মার সংযমন, শান্তি এবং নির্ব্বাণের জন্য। ইহা কি মহাযান মতে করুণাবিষ্ট বোধিসত্ত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে? তাঁহার উদ্দেশ্য হইবে নিজকে তথতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্ত জীবকে তথতায় প্রতিষ্ঠিত করা, এবং এইভাবে অসংখ্য জীবের নির্ব্বাণ সংঘটিত করা'। 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'কার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'হীনযান সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত, আর মহাযান উদার ও বিশ্বোদারভাবে প্রণোদিত। মহাযানের উদ্দেশ্য হইল অপর জনগণকেও নির্ব্বাণের পথে পরিচালিত করা। মহাযানমতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেই জগতের দুঃখ সম্পর্কেও জ্ঞানী অজ্ঞ থাকিতে পারেন না এবং সেইহেতু জগতের অগণিত দুঃখপীড়িত জনগণকে সাহায্য না করিয়া নিজে নির্ব্বাণ (পরিনির্ব্বাণ) লাভ করিতে চাহেন না। এই জন্য মহাযানী দুর্ভেদ্য বর্ম্মে সংরক্ষিত বলিয়া কথিত হন। দুঃখ নিরাকরণই তাঁহার ব্রত হয়। তবে মহাযান হীনযানের নির্ব্বাণের প্রত্যয়কে একেবারে উপেক্ষা করেন না, কিন্তু ইহাকে নিকৃষ্টতর বলিয়া মনে করেন। মহাযান সম্প্রদায়ের সর্ব্বজ্ঞ, তথাগত, ও লোকনাথ অসংখ্য জীবকে প্রত্যেকবোধি দান করিয়া থাকেন। নিজের পরিনির্ব্বাণ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হইয়া তিনি (মহাযান মতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জ্ঞানী) অপরের উপচিকীর্ষাহেতু পরিনির্ব্বাণ লাভে বিলম্ব করেন। অগণিত কল্পে অনেক লোকনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিরবধি স্থানে অনেক সর্ব্বজ্ঞ এখনও প্রকাশিত আছেন এবং নিরবধি অনাগত কালে বহু তথাগত প্রকাশিত হইবেন। ইঁহারা তত্ত্বপ্রচারের দ্বারা অগণিত জীবের নির্ব্বাণ বিধান করিয়াছিলেন, করিতেছেন ও করিবেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে আচার্য্য অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় মহাত্মা কেহই নয়। ইনি যতদিন পর্য্যন্ত একটি জীবও নির্ব্বাণ লাভে বঞ্চিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত পরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন'। মহাযান সম্প্রদায়ের উচ্চতম দার্শনিক দৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছে এই চরিত্রটির আবির্ভাবে। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত মানব সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধীশক্তির প্রকাশরূপে এই চরিত্রটি বিদ্বৎজন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেছে। এই স্তরের দার্শনিক উন্নত মতবাদের পরিচয় হীনযানের কোথায়ও নাই।

নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে কতিপয় আধুনিক দার্শনিকগণের মত

আমরা পূর্ব্বোক্ত অভিমত হইতে ইহা বুঝিয়াছি যে নির্ব্বাণ অর্থ নিভিয়া যাওয়া বা শীতল হওয়া।[১] প্রথম অর্থে নির্ব্বাণকে অভাবাত্মক অবস্থা বলিয়া মনে হয় এবং দ্বিতীয় অর্থে নির্ব্বাণকে অভাবাত্মক না বুঝাইয়া কোন কিছু অস্তমিত হওয়ার পরের অবস্থা মাত্র বলিয়া বুঝা যায়। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ মিথ্যা কামনার উচ্ছেদকেই নির্ব্বাণ বলিয়াছেন ; কিন্তু উহাকে সর্ব্ব অস্তিত্বের ধ্বংসাবস্থা বলেন নাই'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা নির্ব্বাণকে কামনারূপ অগ্নির, বিদ্বেষের ও অজ্ঞানের বিনাশ বলিয়াই বুঝি'।[২] ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন যে, অধ্যাপক পুঁসে পালি গ্রন্থ হইতে নির্ব্বাণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোথায়ও নির্ব্বাণকে আনন্দাবস্থা, কোথায়ও ধ্বংস, কোথায়ও অপরিজ্ঞাতাবস্থা, আবার কোথায়ও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ডক্টর দাশগুপ্ত মনে করেন যে, নির্ব্বাণকে জাগতিক ভাষা বা জ্ঞানদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই এইরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করা হইয়াছে। তাই তাঁহার মতে নির্ব্বাণকে ভাব বা অভাব অবস্থা কিছুই বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। কল্পনাজালের ক্ষয় হওয়ার নামই নির্ব্বাণ এইমাত্র শুধু বলা যাইতে পারে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, মোক্ষমূলার ও চিল্‌ডার মনে করেন না যে, বৌদ্ধ গ্রন্থে এমন একটিও উক্তি আছে যাহা হইতে নির্ব্বাণের অর্থ ধ্বংস বা আত্যন্তিক বিনাশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।[৩] কিন্তু শ্রীমতী রিস্‌-ডেভিড বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের একমাত্র অর্থ ধ্বংস।[৪] ওলডেনবার্গও ঐ মতের সমর্থক।[৫] চাল্‌কে বলেন বৌদ্ধধর্ম্মের দুঃখবিমুক্তাবস্থা (নির্ব্বাণ) অভাবাত্মক অবস্থা মাত্র। এই অবস্থাকে ভাবাত্মক বা এই অবস্থায় কোনরূপ

১। Radhakrishnan : Indian Philosophy, vol. I. p. 447

২। Ibid, p. 447

৩। Ibid, p. 449 and see T. W. Rhys Davids : Buddhism, p. 115 for Prof. Max Muller's interpretation of Nirvāna.

৪। See Enc. Brit. for her article on Buddhism.

৫। Buddha, p. 273

আনন্দ আছে তাহা বলা যায় না।[১] পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ মতই বুদ্ধের বাণীকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বুদ্ধ নিজে নির্ব্বাণের স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া উহা মনুষ্যজ্ঞানগম্য বস্তু নয় জানিয়াও উহাকে বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়া অভাব অর্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি কোন ভাববাচক শব্দের দ্বারা নির্ব্বাণকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে তাহা যথার্থরূপে অতীন্দ্রিয়, মনুষ্যজ্ঞানাগম্য নির্ব্বাণকে বুঝাইতে সমর্থ হইবে না। নির্ব্বাণ কাহাকে বলে তাহা কোন দিনই যে শব্দবাচ্য হইবে তাহা মনে করা যাইতে পারে না। আবার কেহ কেহ নির্ব্বাণ যে শুধু অভাবের নামমাত্র তাহাও মানিয়া লন নাই।[২] আমরা উপরে চতুর্বিধ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এই চতুর্বিধ বৌদ্ধেরাই নির্ব্বাণকে (মুক্তিকে) সাধারণ ভাবে রাগাদিজ্ঞানপ্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, "রাগাদি-জ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা। চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্তিতা"। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন, শ্লোক, ৪৪)।

১। Buddhist Essays, p. 48

২। See an article by Rev. Nārada in Buddhistic Studies edited by B. C. Law, p. 568

দ্বাদশ অধ্যায়

জৈনধর্ম্মমতে মুক্তি বা নির্ব্বাণ

'উত্তরাধ্যয়ন' সূত্রে বিবৃত হইয়াছে যে (পার্শ্বনাথ তীর্থঙ্করের অনুযায়ী শ্রমণ) কেশী (মহাবীর তীর্থঙ্করের অনুযায়ী শ্রমণ) গৌতমকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শারীরিক ও মানসিক দুঃখসমূহদ্বারা বধ্যমান প্রাণীদিগের জন্য কোন স্থানকে "ক্ষেম, শিব এবং অনাবাধ" মনে করেন? (দ্রষ্টব্য ঐ, ২৩।৮০)। গৌতম উত্তর করেন, "লোকাগ্রে এক ধ্রুব স্থান আছে, যথায় জরা, মৃত্যু, ব্যাধিসমূহ এবং বেদনাসমূহ নাই। ঐ স্থান দুরারোহ"। (দ্রষ্টব্য ঐ, ২৩।৮১)। "নিব্বাণং তি অবাহং তি সিদ্ধী লোগগ্‌গং এব য। খেমং সিবং অণাবাহং জং চরন্তি মহেসিণো"।। (দ্রষ্টব্য ঐ, ২৩।৮৩)। 'ঐ স্থান নির্ব্বাণ' ও 'অবাধ' নামে অভিহিত হয়। উহাই 'সিদ্ধি' এবং 'লোকাগ্র', উহা ক্ষেম, শিব এবং অনাবাধ। মহর্ষিগণ ঐ স্থানে গমন করেন'। "তং ঠানং সাসয়ং বাসং লোয়গ্‌গম্মি দুরারুহং। জং সংপত্তা ন সোয়ন্তি ভবোহন্ত করা মুনী"।। (ঐ, ২৩।৮৪)। 'সেই স্থান শাশ্বত বাস (অর্থাৎ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না)। উহা লোকাগ্রে (লোকাকাশ ও অলোকাকাশের মধ্যে) স্থিত। উহা দুরারোহ। ভববিনাশকারী মুনিগণ উহা প্রাপ্ত হইয়া শোক করেন না'। "নিম্মমে নিরহংকারে বীয়রাগো অনাসবো। সংপত্তো কেবলং নাণং সাসয়ং পরিনিব্বুন"।। (ঐ, ৩৫।২১)। 'কেবলজ্ঞানসম্পন্ন (ব্যক্তি) নির্ম্মম, নিরহংকার,বীতরাগ, অনাস্রব, এবং শাশ্বত পরিনিবৃত্ত' (হইয়া বিচরণ করেন)। "জন্মজরাময়মরণ, শোকদুঃখভয় হইতে পরিমুক্তাবস্থাই নির্ব্বাণ। উহা প্রতিদ্বন্দ্বরহিত সুখস্বরূপ এবং অবিনশ্বরস্বরূপও বটে"—"জন্মজরাময়মরণৈঃ শোকৈর্দুঃখৈর্ভয়ৈশ্চ পরিমুক্তম্। নির্ব্বাণং শুদ্ধসুখং নিঃশ্রেয়সমিষ্যতে নিত্যম্"। (রত্নকরণ্ডক শ্রাবকাচার, ৫।১০, পৃঃ ৯২)। "পরমাত্মনি জীবাত্মলয়ঃ সেতি ত্রিদণ্ডিনঃ। লয়ো লিঙ্গব্যয়োঽত্রেষ্টো জীবনাশশ্চ নেষ্যতে"। (দ্বাত্রিংশদ্বাত্রিংশিকা, ৩১।৮)।[১] 'পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়কে ত্রিদণ্ডিগণ মুক্তি বলেন। এইখানে 'লয়' শব্দের অর্থে যদি 'লিঙ্গব্যয়' অর্থাৎ সুখদুঃখাবচ্ছেদক শরীররূপী লিঙ্গের বা উপাধির ব্যয় হয় অর্থাৎ 'নামকর্ম্মক্ষয়' হয় বুঝায়, তবে তাহা আমাদেরও ইষ্ট। তবে উহার অর্থ যদি 'জীবনাশ' হয়, তাহা আমাদের ইষ্ট নহে'। উহাতে (ঐ গ্রন্থে, ৩১।১২,১৭) আরও আছে যে জৈনমতের মুক্তি সাংখ্য ও

১। অভিধানরাজেন্দ্রে ৫ম ভাগে ৩১৫-৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোক।

বেদান্ত সম্মত মুক্তি হইতে ভিন্ন।[১] জৈনমতে মুক্তির সহিত সাংখ্য বেদান্ত মতে মুক্তির তুলনামূলক আলোচনা কিছু পরে করা হইবে। সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক স্বর্গের অতি উচ্চে লোকাকাশের ও অলোকাকাশের সীমাস্থলে 'ঈষৎ-প্রাগ্‌ভার' নামে ছত্রাকার এক স্থান আছে। মুক্তজীব সেইখানে থাকে। উহাই সিদ্ধশীলা। সাধারণতঃ জৈনধর্ম্মের মোক্ষ এবং নির্ব্বাণ সমানার্থক শব্দ বলিয়া মানা হয়; কিন্তু কখন কখন *নির্ব্বাণকে **মোক্ষ হইতে পরবর্ত্তী অবস্থা বলা হয়—"নাদর্শনিনো জ্ঞানং জ্ঞানেন বিনা ন ভবন্তি চারিত্রগুণাঃ। অগুণিনো নাস্তি মোক্ষঃ নাস্ত্যহমোক্ষস্য নির্ব্বাণম্।" (উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ২৮।৩০ র সংস্কৃত ছায়া)।

জৈনদর্শনমতে জীব সকল দুঃখের অন্ত করিতে পারে। এই দুঃখান্তকেই নির্ব্বাণ বলা হয়। "জীবাঃ সিদ্ধন্তি বুধ্যন্তে মুচ্যন্তে পরিনির্ব্বান্তি সর্ব্বদুঃখানামন্তং কুর্ব্বন্তি"। (ঐ, ২৯।১ র সংস্কৃত ছায়া)। 'জীব (যাঁহারা মুক্ত হন তাঁহারা) সিদ্ধিলাভ করেন, জ্ঞানলাভ করেন, পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন এবং সকল দুঃখের অন্ত করেন'। এখানে 'জীবাঃ মুচ্যন্তে' শব্দে সকল জীব মুক্ত হয় বলিলে ভুল বুঝা হইবে। এখানে 'জীবাঃ' শব্দে মুক্তিযোগ্য জীবের কথাই বলা হইয়াছে। জীব দ্বিবিধ, মুক্তিযোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য। যাহারা মুক্তির অযোগ্য তাহারা নিত্যবদ্ধ নামে অভিহিত হয়। যাহারা মুক্তির যোগ্য তাহাদেরও সকলে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না, কারণ তাহা হইলে একদিন মুক্তিযোগ্য শ্রেণীর অভাব হইবে। জৈনাগমে নিত্যবদ্ধ জীবের সদ্‌ভাব স্বীকৃত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখানে আরও কিছু ঐ সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। 'ভগবতীসূত্রে' ভগবান্ মহাবীর ও ইন্দ্রভূতি গৌতমের মধ্যে নিম্নপ্রকার প্রশ্নোত্তর আছে। "গৌতম, হে ভগবন্! জীব অন্তক্রিয়া করে কি? ['অন্ত' শব্দের অর্থ 'অবসান'। তাহার ক্রিয়া 'অন্তক্রিয়া'। অর্থাৎ যে শেষ ক্রিয়াদ্বারা সমস্ত কর্ম্মের অন্ত হয়, তাহা অন্তক্রিয়া। যে ক্রিয়াদ্বারা কৃৎস্ন কর্ম্মক্ষয় হয় তাহাকে অন্তক্রিয়া বলে। আর কৃৎস্ন কর্ম্মক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। "কৃৎস্নকর্ম্মক্ষয়াম্মোক্ষ" ইতি, (প্রজ্ঞাপনাসূত্র, ১৫ অধ্যায়)। "কৃৎস্নকর্ম্মক্ষয়লক্ষণায়াং মোক্ষপ্রাপ্তৌ," (ভগবতী সূত্র, ১।২।১০৭ প্রশ্নোত্তর)]। মহাবীর। হে গৌতম! কেহ কেহ করে, আর কেহ কেহ করে না, (ভগবতীসূত্র, ১।২।১০৭ প্রশ্নোত্তর)। এই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর 'প্রজ্ঞাপনাসূত্রে'র 'অন্তক্রিয়া'

১। অভিধানরাজেন্দ্রে ৫ম ভাগে ৩১৫-৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোক।

* নির্ব্বাণ—সিদ্ধশীলায় গমন। **মোক্ষ—কর্ম্ম হইতে মুক্তি।

নামক বিংশতিতম পদ হইতে জ্ঞাতব্য। 'ভগবতীসূত্রে'র টীকাকার অভয়দেব স্থরি বলিয়াছেন, 'অন্তক্রিয়া' শব্দের অর্থ "কৃৎস্নকর্ম্মক্ষয়লক্ষণামুক্তি প্রাপ্তি"। উল্লিখিত 'প্রজ্ঞাপনাসূত্র' এই—"হে ভগবন্! জীব অন্তক্রিয়া করে কি? হে গৌতম! কেহ কেহ করে, আর কেহ কেহ করে না"। তাহাতে জানা যায় যে, কোন কোন সংসারী জীব কখনও মোক্ষলাভ করে না; স্থতরাং সংসারে নিত্য আবদ্ধ থাকে। কোন কোন নারক জীবও অন্তক্রিয়া করে না; স্থতরাং নিত্য নরকে বাস করে। এখানে মুক্তিযোগ্য জীব সম্বন্ধে আরও তুই একটি কথা বলিব। ডক্টর গ্লসেনাপ্ (Glasenapp) মনে করেন যে, সমস্ত ভব্য (মুক্তিযোগ্য) জীবই অল্প বা অধিককাল পরে মুক্তি লাভ করে।[১] কিন্তু তাহা সত্য নহে, কারণ তাহা হইলে কোন না কোন দিন এমন আসিবে যখন মুক্তিযোগ্য জীবেরও অভাব হইবে। জৈনদর্শন এই কথা স্বীকার করেন না। আর গ্লসেনাপও পরে এইকথা স্বীকার করিয়াছেন।[২] স্থতরাং তাঁহার মতেও সমস্ত ভব্যজীব মুক্তিলাভ করে না। তাই দেখা যাইতেছে যে ডক্টর গ্লসেনাপের গ্রন্থে আত্মবিরোধ আছে। ভাগবতধর্ম্ম মতে বদ্ধজীব সকলেরই মুক্তিলাভের অধিকার আছে। ভগবানকে আশ্রয় করতঃ সকলেরই মুক্তি লাভ হইতে পারে। জাতি, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি কিছুই তাহার প্রতিবন্ধক হয় না। 'গীতা'ও এই কথাই বলিয়াছেন।[৩] পুরাণাদিতেও তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। পক্ষান্তরে জৈনধর্ম্মমতে সকলেরই মুক্তিলাভে অধিকার নাই। আচার্য্য মধ্বও এইরূপ মতবাদের সমর্থক ছিলেন।[৪] এমন কি জৈন মতে মুক্তিযোগ্য ব্যক্তিদের সকলের আবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, বস্তুতঃ মুক্তি হইবে না। দিগম্বর জৈনমতে স্ত্রী এবং শূদ্র মোক্ষলাভ করিতে পারে না। গৃহস্থ যে মুক্ত হইতে পারে না, তাহা শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর উভয়েই মানেন। উভয় মতেই অনন্তগুণবান পরমাত্মার স্বরূপপ্রাপ্তিই চরম লাভ। উহাই মুক্তি।

জৈনদর্শন মতে মুক্তজীব পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হয় না; স্থতরাং মুক্তি অবিনাশী বা নিত্য। (দ্রষ্টব্য বিশেষাবশ্যক, গাথা, ১৮৪০)। "স (মুক্তোজীবঃ) পুনরপি ন বধ্যতে, বন্ধকারণাভাবাৎ...ইতি"। (ঐ, ১৮৪০ গাথার টীকা)। "ন তস্য মুক্তস্য পুনরপি ভবপ্রসূতির্জায়তে..."। (ঐ, ১৮৪১ গাথার টীকা)।

১। Dr. Glasenapp : Doctrine of Karma in Jaina Philosophy, p 68

২। Ibid, p. 76

৩। গীতা, ৯।৩২

৪। দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের মধ্বের মতে মুক্তি, পৃঃ ৫৯

"কালে কল্পশতেঽপি চ গতে শিবানাং ন বিক্রিয়ালক্ষ্যা। উৎপাতোঽপি যদি স্যাৎ ত্রিলোকসংভ্রান্তিকরণপটুঃ"।। (রত্নকরণ্ডকশ্রাবকাচার, ৫।১২, পৃঃ ৯৩)। অর্থাৎ জগতের যদি ধ্বংসও হয় তথাপি মুক্তের তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ মুক্তপুরুষ নিত্য পরমাত্মরূপে স্থিত। মুক্ত মনকে ত্রিলোক হইতে আবর্ত্তন করিয়া আত্মাভিমুখী করিতে পটু বলিয়াই তাঁহার বিক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। "নিধুয় কম্মং ন *পবংচুবেই, **অক্খক্খত্র বা সগডং তিবেমি", (কৃতাঙ্গসূত্র, ৭।৩০, পৃঃ ১৬৪)। অর্থাৎ অক্ষক্ষয়ে শকট যেরূপ চলিতে পারে না, মুক্তেরও সেইরূপ কর্ম্ম নির্ধৌত হইয়া যাওয়ার দরুণ তিনি আর জাতি-জরামরণরোগশোকাদিরূপ সংসারপ্রপঞ্চকে প্রাপ্ত হন না। তাই মুক্তের অবস্থার চ্যুতি নাই। সুতরাং মুক্তি নিত্য।

মুক্তজীবাত্মা অসর্ব্বগত, চেতন এবং সক্রিয়। উহার কর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ নহে, পরন্তু ভোক্তৃত্বভ্রষ্টৃত্বাদি উপপন্ন হয় না। (দ্রষ্টব্য বিশেষাবশ্যক, গাথা, ১৮৪৫)। মুক্ত, সিদ্ধ, বুদ্ধ, পারগত, পরংপারগত, উন্মুক্তকর্ম্মকবচ, অজর, অমর ও অসংগ এই সকল মুক্তির পর্য্যায়বাচী শব্দ। কৃতকৃত্য বলিয়া তিনি (মুক্ত) 'সিদ্ধ'। কেবলজ্ঞান ও কেবলদর্শনদ্বারা বিশ্বাবগমহেতু 'বুদ্ধ'। ভবার্ণবের পারে গত বলিয়া 'পারগত'। পুণ্যবীজসম্যকত্বজ্ঞানচরণক্রমপ্রতিপন্নত্বাৎ পরম্পরয়া গতাঃ" বলিয়া 'পরংপারগত'। সকলকর্ম্মবীজবিযুক্তত্বহেতু 'উন্মুক্তকর্ম্মকবচ'। বয়সের অভাবহেতু 'অজর'। আয়ুর অভাবহেতু 'অমর'। "অসঙ্গাশ্চ সকল-ক্লেশাভাবাৎ"। সিদ্ধ "নিস্তীর্ণসর্ব্বদুঃখ," "জাতিজরামরণবন্ধনবিমুক্ত" ও "অব্যাবাধ"। সিদ্ধ "সদাকাল সৌখ্য অনুভব করেন"। সিদ্ধ অকায়, অসঙ্গ (বাহ্যাভ্যন্তরসঙ্গরহিত) এবং অরুহ (অর্থাৎ সংসারে জন্ম হয় না)। "দগ্ধে বীজে যথাঽত্যন্তে প্রাদুর্ভবতি নাঙ্কুরঃ। কর্ম্মবীজে তথা দগ্ধে ন রোহতি ভবাঙ্কুরঃ"।। (বিশেষাবশ্যকগাথা)। অর্থাৎ বীজ বিশেষভাবে ভর্জিত (ভৃষ্ট) হইলে যেরূপ অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয় না, সেইরূপ সিদ্ধের কর্ম্মবীজ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আর জন্মগ্রহণ করেন না। সিদ্ধদিগের একত্রিশ গুণ থাকে। 'উত্তরাধ্যয়নসূত্রে' বিবৃত হইয়াছে যে, জীব দ্বিবিধ, সিদ্ধ এবং সংসারস্থ। সিদ্ধ (মুক্ত) অনেকবিধ বলিয়া উক্ত হয়। (ঐ, ৩৬।৪৮)। যথা স্ত্রী-সিদ্ধ, পুরুষ-সিদ্ধ, নপুংসক-সিদ্ধ, স্বলিঙ্গ-সিদ্ধ, পরলিঙ্গ-সিদ্ধ এবং গৃহলিঙ্গ-সিদ্ব। (ঐ, ৩৬।৪৯)। সিদ্ধদিগের এই ভেদ উপাধিকৃত, স্বাভাবিক নহে। স্বলিঙ্গ অর্থাৎ জৈন্য সম্প্রদায়ের লিঙ্গধারী। পরলিঙ্গ অর্থাৎ অপর কোন

---

* পবংচুবেই = প্রপঞ্চর্যাতি। ** অক্খক্খত্র = অক্ষস্য ক্ষয়ে।

সম্প্রদায়ের লিঙ্গধারী। কোন কোন সূত্রে সিদ্ধগণের পঞ্চদশ প্রকার ভেদের কথা আছে। উপরের ছয় প্রকার ভেদের অন্তর্গত করিয়াই পঞ্চদশ প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ঐ ভেদ সশরীর সিদ্ধের (অর্থাৎ জীবন্মুক্তের)। অথবা যেই অন্তিমদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীব সিদ্ধ হয় সেই অন্তিমদেহের ভেদ অনুসারে সিদ্ধের ভেদ করা হইয়া থাকে। যাঁহারা স্ত্রীদেহ হইতে সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা স্ত্রী-সিদ্ধ। সেই প্রকার পুরুষদেহ হইতে সিদ্ধ পুরুষ-সিদ্ধ, নপুংসক দেহ হইতে সিদ্ধ নপুংসক-সিদ্ধ। যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম হইতে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা গৃহলিঙ্গ-সিদ্ধ। প্রকৃত সিদ্ধগণ অকায়। জীব ইহসংসারে শরীর পরিত্যাগ করিয়া লোকের অগ্রভাগে গমন করতঃ সিদ্ধ হয় এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। (উত্তরাধ্যয়নসূত্র ৩৬।৫৬)। সুতরাং শরীরপাতের পর উহাদের উপর্য্যুক্ত ভেদ হইতে পারে না। পরের সূত্র হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। উহাতে আছে, সিদ্ধ উৎকৃষ্ট, জঘন্য ও মধ্যম অবগাহনা হইতেও পারেন; উর্দ্ধ, অধ বা তির্য্যক লোকে হইতে পারেন; সমুদ্র, জল, প্রভৃতিতে হইতে পারেন। (ঐ, ৩৬।৫০)। অর্থাৎ যে কোন স্থানের জীব সিদ্ধগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। "অরূপিণো জীবঘনাঃ জ্ঞানদর্শন সংজ্ঞিতাঃ। অতুলং সুখং সম্প্রাপ্তা উপমা যস্য নাস্তি তু"।। (ঐ, ৩৬।৬৬)। 'সিদ্ধজীব রূপ-রহিত, জ্ঞান ও দর্শন স্বরূপ, এবং অতুলনীয় সুখ সম্প্রাপ্ত'। সিদ্ধ অশরীর। সুতরাং জ্ঞানের করণ (বাহ্য কিম্বা অন্তঃ) উহার নাই। তথাপি তাঁহার দর্শন ও জ্ঞান হয়। "অশরীরা জীবঘনা উপযুক্তা দর্শনে চ জ্ঞানে চ"। (ঔপপাতিকসূত্র, ৩।১১)। তিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ, (ঐ, ৩।১২)। সিদ্ধ নিরুপম সুখলাভ করেন। মনুষ্যদিগের কিম্বা দেবতাদিগের মধ্যে তেমন সুখ নাই। সেই হেতু উহা নিরুপম।

মুক্তজীব অকায় এবং অমূর্ত্ত। নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্ত্তী (দিগম্বর সম্প্রদায়ের) লিখিয়াছেন যে, "সিদ্ধগণ (বিদেহসিদ্ধগণ) নিষ্কর্ম্মা (কর্ম্মরহিত), অষ্টগুণ সম্পন্ন, চরমদেহ হইতে কিঞ্চিৎ ছোট।[১] নিত্য, উৎপাদ ও ব্যয়সংযুক্ত (কখনও শক্তির অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানাদির প্রয়োগ করেন এবং কখনও করেন না), এবং লোকাগ্রে স্থিত"। (দ্রষ্টব্য দ্রব্যসংগ্রহ, গাথা ১৪)। অষ্টগুণ = সম্যকত্ব, জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য, সূক্ষ্ম, অবগাহন, অগুরুলঘু, অব্যাবাধ। যদি সর্ব্বথা গুরু হয়, তবে লৌহপিণ্ডের ন্যায় ক্রমাগত অধঃপতন হইত; আর পক্ষান্তরে যদি সর্ব্বথা লঘু হয় তবে বাতাহত অর্কতুলার ন্যায় সর্ব্বদা

১। 2/3 of that which they had had during their last existence.

চলিতে থাকিত। সুতরাং সিদ্ধ অগুরুলঘু অর্থাৎ নির্গতি। নেমিচন্দ্র আরও বলেন, "নষ্টাষ্টকর্ম্মদেহঃ লোকালোকস্য জ্ঞায়কঃ দ্রষ্টা। পুরুষাকারঃ আত্মা সিদ্ধঃ"॥ (দ্রব্যসংগ্রহ, গাথা, ৫১)। অর্থাৎ যে পুরুষাকার (স্ত্রী নহে) আত্মার অষ্টকর্ম্মদেহ নষ্ট হইয়াছে, লোকালোকের জ্ঞায়ক ও দ্রষ্টা, তিনিই সিদ্ধ। টীকাকার ব্রহ্মদেব বলেন, 'নিশ্চয়নয়ে' (নিশ্চয় যুক্তিতে) সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়, অকায়, অমূর্ত ও নিরাকার; পরন্তু ভূতপূর্ব্বব্যবহারনয়ে (যে দেহ হইতে সিদ্ধ হইয়াছে সেইদেহ বিচারে) পুরুষাকার (পুরুষ, স্ত্রী নহে), কিঞ্চিদূনচরম-শরীরাকার।[১] "এবং সর্ব্বকালতৃপ্তাঃ অতুলং নির্ব্বাণমুপগতা সিদ্ধাঃ। শাশ্বতমব্যাবাধং তিষ্ঠন্তি সুখিনঃ সুখং প্রাপ্তাঃ"।। (ঔপপাতিকসূত্র, ৩।১৯)। "সিদ্ধা ইতি চ বুদ্ধা ইতি চ পারগতা ইতি চ পরম্পরাগতা ইতি চ। উন্মুক্ত-কর্ম্মকবচা অজরা অমরা অসঙ্গা চ"।। (ঐ, ৩।২০)। কৃতকৃত্য বলিয়া তিনি 'সিদ্ধ'। কেবল জ্ঞানদ্বারা সমস্ত বিশ্বের অববোধ হয় বলিয়া তিনি 'বুদ্ধ'। ভবার্ণবের পরপারে গমনহেতু 'পারগত'। "নিস্তীর্ণসর্ব্বদুঃখাঃ জাতিজরা-মরণবন্ধনবিমুক্তাঃ। অব্যাবাধং সৌখ্যং অনুভবন্তি শাশ্বতং সিদ্ধাঃ"।। (ঐ, ৩।২১)। "অতুলসুখসাগরগতাঃ অব্যাবাধং অনৌপমং প্রাপ্তাঃ। সর্ব্বমনাগতমদ্ধং তিষ্ঠন্তি সুখিনঃ সুখং প্রাপ্তাঃ"। (ঐ, ৩।২২)। আচারাংগসূত্রে (১।৫।৬ উদ্দেশ) উল্লিখিত হইয়াছে যে, সিদ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করিতে শব্দ সমর্থ নহে। তর্ক তথায় থাকে না। মতি তথায় অবগাহন করে না। ঐখানে কেবল সম্পূর্ণ জ্ঞানময় আত্মা আছে। "তিনি (সিদ্ধ) দীর্ঘ নহে, হ্রস্ব নহে, বৃত্ত নহে, চতুরস্র নহে, পরিমণ্ডল নহে, আয়ত নহে, কৃষ্ণ নহে, নীল নহে, লোহিত নহে, হরিত নহে, শুক্ল নহে। সুগন্ধ নহে, দুর্গন্ধ নহে, তিক্ত নহে, কটু নহে; কষায় নহে, অম্ল নহে, মধুর নহে। কর্কশ নহে, মসৃণ নহে, গুরু নহে, লঘু নহে, শীত নহে, উষ্ণ নহে, স্নিগ্ধ নহে, রুক্ষ নহে। স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, অন্যথা নহে অর্থাৎ নপুংসক নহে। তাঁহার রূপ নাই, গন্ধ নাই, রস নাই, ও স্পর্শ নাই"। (আচারাংগসূত্র, ১।৫।৬ উদ্দেশ)।

জৈনশাস্ত্রে জীবন্মুক্তি মানা হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে, জীব সাধন-বলে "পঞ্চবিধ জ্ঞানাবরণীয়, নববিধ দর্শনাবরণীয় ও পঞ্চবিধ আন্তরায়িক এই সমস্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম যুগপৎ ক্ষয় করে। তৎপশ্চাৎ অনুত্তর, অনন্ত, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ, নিরাবরণ, বিতিমির, বিশুদ্ধ এবং লোকালোকপ্রভাব (লোকের ও অলোকের প্রকাশক), কেবলবরজ্ঞানদর্শন (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেবলজ্ঞান ও কেবলদর্শন) সমুৎপন্ন

১। 2/3 of that from which he attains salvation.

করে"। (উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ২৯।৭১)। কেবলজ্ঞান এবং কেবলদর্শন প্রাপ্তির পরেও মনুষ্য জীবিত থাকে। কেননা কথিত হইয়াছে যে, অনন্তর "যাবৎ সযোগী (অর্থাৎ মন, বানী ও কায়াতে যুক্ত) হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ঈর্যাপতিক কর্ম্মনিবন্ধন (কর্ম্মবন্ধন) থাকে। ঈর্যাপতিক কর্ম্মের সুখস্পর্শ তুই সময় (কিছুক্ষণ) স্থিতিবান হয় (থাকে)।·· কালে অকর্ম্মা (অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মরহিত) হয়"। (ঐ)। কেবলজ্ঞানের অনন্তর যাবৎ আয়ু (কর্ম্মভোগ) পালন করতঃ শেষ তুই মুহূর্ত্ত আয়ু অবশেষ থাকিতে যোগনিরোধ (অর্থাৎ মন, বাণী ও কায়ের ব্যাপারের নিরোধ) করিতে উদ্যত হইয়া ক্রিয়াতিপাত নামক শুক্লধ্যান করতঃ প্রথমে মনোযোগ নিরোধ করিবে, বাক্‌যোগ নিরোধ করিবে ও কায়যোগ নিরোধ করিবে। পরে আনাপান (শ্বাস-প্রশ্বাস) নিরোধ করিবে" ইত্যাদি। (উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ১৯।৭২)। এইরূপে দেখা যায়, কেবলজ্ঞানলাভের পরেও শরীর কিছুকাল থাকিতে পারে। জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় এবং অন্তরায় এই ত্রিবিধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হয়। জৈনদর্শনমতে কর্ম্ম আটপ্রকার। যথা, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয়, অন্তরায় (যাহা বাঞ্ছিত কর্ম্মকরণে বাধা দেয়) আয়ু, নাম, গোত্র এবং বেদনীয় (সুখদুঃখবেদনের কারণ)। জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মের অভাবে অনন্তজ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞতা, দর্শনাবরণীয় কর্ম্মের অভাবে অনন্তদর্শন বা সর্ব্বদর্শিতা, অন্তরায় কর্ম্মের অভাবে অনন্তবীর্য্য লাভ হয়। দর্শন-মোহনীয় কর্ম্মের অভাবে শুদ্ধসম্যকত্ব এবং চারিত্র মোহনীয় কর্ম্মের অভাবে শুদ্ধ চরিত্র লাভ হয়। ঐ সমস্ত কর্ম্মের অভাবে অনন্তসুখ লাভ হয়। পরন্তু অপর চারিকর্ম্মের অবশেষ থাকা হেতু সংসারে তিনি (যোগী) থাকেন। উহাই জীবন্মুক্তি। তীর্থঙ্করগণ জীবন্মুক্ত। "সর্ব্বং ততো জানাতি পশ্যতি চ অমোহন ভবতি নিরন্তরায়ঃ। অনাশ্রবো ধ্যান-সমাধিযুক্তঃ আয়ুঃ ক্ষয়েঃ মোক্ষমুপৈতি শুদ্ধম্" ॥ (উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ৩২।১০৯)। "স তস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ দুঃখাদ্ মুক্তঃ যদ্ বাধতে সততং জন্তুমেনং। দীর্ঘাময়-বিপ্রমুক্তঃ প্রশস্তঃ ততো ভবত্যনন্তসুখী কৃতার্থঃ" ॥ (ঐ, ৩২।১১০)। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত সকল জানেন, সকল দর্শন করিতে পারেন, মোহশূন্য হন এবং তাঁহার অন্তরায় ধ্বংস হয়। তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সঞ্চয় হয় না, তিনি ধ্যান ও সমাধি-যুক্ত থাকেন এবং আয়ুক্ষয় হইলে প্রতিদ্বন্দ্বরহিত সুখস্বরূপ মুক্তিকে প্রাপ্ত হন। তিনি তখন যে সকল দুঃখ জীবগণকে সতত বন্ধনগ্রস্ত করিয়া রাখে সেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হন। তিনি ভবরোগ হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া সুখী ও কৃতার্থ হন। জৈনদর্শনের মতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ গুণস্থানে জীব কেবলজ্ঞান এবং কেবলদর্শন লাভ করে। তৎপরে, অর্থাৎ উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া

জীব মুক্ত হয়। ঐ দুই গুণস্থানের মোটামুটি পার্থক্য এই যে, ত্রয়োদশ গুণস্থানে সাত যোগ থাকে। 'যোগ' শব্দের অর্থ মন, বচন ও কায়ের প্রবৃত্তি বা ব্যাপার। উহারাই ক্রিয়া ও বন্ধনের হেতু। চতুর্দ্দশ গুণস্থানে ঐ যোগ থাকে না, সুতরাং ক্রিয়া থাকে না, বন্ধনের হেতুও থাকে না। ত্রয়োদশ গুণস্থানে শ্বেতলেশ্যা আছে, চতুর্দ্দশ গুণস্থানে লেশ্যা নাই। কথিত হয় যে, চতুর্দ্দশ গুণস্থানে জীব অতি অল্প সময়, এক মুহূর্ত্তের অংশ মাত্র সময় থাকে। ঐ দুই গুণস্থানকে যথাক্রমে 'সযোগকেবলী' ও 'অযোগকেবলী' গুণস্থান বলা হয়। ত্রয়োদশ গুণস্থানের ব্যক্তি তীর্থঙ্কর। আর চতুর্দ্দশ গুণস্থানের ব্যক্তি জগতের সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

জৈনদর্শন সম্যক্ দ্বৈতবাদী ; তন্মতে চেতন আত্মা এবং অচেতন আত্মার ভেদ সম্যক্ এবং শাশ্বত। জৈনদর্শন পরমাত্মাকেও সগুণ বলিয়াছেন। জৈনদর্শনের মতে গুণবিহীন দ্রব্য থাকিতে পারে না। যেমন দ্রব্য ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না, তেমন গুণরহিত দ্রব্যও বস্তুতঃ থাকিতে পারে না। অবশ্য আলোচনা কালে দ্রব্য হইতে পৃথক্‌রূপে গুণের সদ্‌ভাবের উল্লেখ করা যায়। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের পৃথক্ সদ্‌ভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যই গুণযুক্ত বা সগুণ। অতএব পরমতত্ত্বও সগুণ। তাই জৈন-দর্শনমতে পরমাত্মা সগুণ এবং তাঁহার অনন্তগুণ আছে। জৈনদর্শন মনে করেন যে, অদ্বৈতবেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম কথার কথা মাত্র, বাস্তব হইতে পারে না। জৈনদর্শনমতে পরমাত্মা বহু, এক নহে। কেননা, জীবাত্মার পরম বিকাশ ভূমিই পরমাত্মা ; জীবাত্মা যেমন বদ্ধদশায় বহু, তেমন মুক্তদশায়ও বহু। অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণ মনে করেন যে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়, পরমাত্মা ঐ ব্রহ্মেরই নামান্তর। সুতরাং তন্মতেও মুক্তজীব পরমাত্মা হয়। কেবল এইমাত্র অংশে অদ্বৈতবেদান্তমতকে এবং জৈনমতকে সমান বলা যাইতে পারে। পরন্তু অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একই ; সমস্ত মুক্তজীবই পরমাত্মা হয়, আর জৈনমতে মুক্তিতেও জীব ভিন্ন ভিন্ন থাকে। সুতরাং পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন এবং বহু। জৈনদর্শনমতে সমস্ত পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকারে সমান নহে। সাংখ্য মতেও আত্মা কি বদ্ধ, কি মুক্ত বহু। তন্মতে সমস্ত আত্মা নির্গুণ এবং অনন্ত ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সমান। পরন্তু জৈনমতে সমস্ত পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী হইলেও আকারে সমান নহে।

জৈনগণ মনে করেন যে একমাত্র তাঁহারাই মুক্তির অধিকারী, অপরে নহে। কুন্দকুন্দাচার্য্য বলিয়াছেন, যে জৈনসূত্র অনুসারে চলে সেই

জন্মমৃত্যু নাশ করে। যেমন সূতারহিত সূচী বিনষ্ট হয়, সূতাযুক্ত সূচী বিনষ্ট হয় না; তেমন যে ব্যক্তি সসূত্র (জৈনসূত্রযুক্ত) সে বিনষ্ট হয় না, সে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে এবং সংসারকে নাশ করে। (সূত্রপাহুড়, ৩-৪ শ্লোক)। "হরি হর তুল্যো বি নরো সগ্‌গং গচ্ছেই এই ভব কোড়ী। তহবিণ পাবই সিদ্ধিং সংসারত্থো পুণো ভণিদো" ॥ (ঐ, ৮)। 'মনুষ্য যদি হরির কিম্বা হরের তুল্যও হয়, সে স্বর্গেই গমন করে। কোটি কোটিবার জন্ম লইয়াও (সে স্বর্গে গমন করে)। তথাপি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, পুনঃ সংসারস্থ হয়'। (জৈনশাস্ত্রে) ইহা কথিত হইয়াছে। কুন্দকুন্দের মতে জৈনদর্শন ব্যতীত অপরদর্শন মিথ্যাদর্শন এবং তত্রোক্ত মার্গ মলিন। (চারিত্রপাহুড়, ১৭)। জিন কর্ত্তৃক আখ্যাত মার্গই "সন্‌মার্গ"। উহা উত্তম মার্গ। অপর সমস্তমার্গ "উন্‌মার্গ"। তদনুযায়িগণ কুপ্রবচন (পাষণ্ডী)। (উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ২৩।৬৩)। যাহারা মিথ্যাদর্শনরক্ত তাহারা সনিদান (সকামকর্ম্মকারী) এবং হিংসা-পরায়ণ; সেই সকল মনুষ্যের বোধি দুর্লভ। (ঐ, ৩৬।২৫৮)। পক্ষান্তরে যাঁহারা সম্যক্‌দর্শনরক্ত (জৈনদর্শনরক্ত) তাঁহারা অনিদান (নিষ্কামকর্ম্মকারী) এবং শুক্ললেশ্যায় প্রতিষ্ঠিত। উঁহাদের বোধি সুলভ। (ঐ, ৩৬।২৫৯)। সুতরাং জৈনদের মতে একমাত্র জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণই নির্ব্বাণের অধিকারী; কিন্তু অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণ নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিত হইলেও জৈনদর্শনের দৃষ্টিতে তাঁহারা অমুক্ত বা বদ্ধ। এইরূপ মতবাদ বিচারের দৃষ্টিতে উদার মনোভাব বর্জ্জিত ও অসমীচীন মনে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

ইহশরীরে বর্ত্তমান থাকিতেই, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জীব ব্রহ্মাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। অথর্ববেদের জনৈক ঋষি তাহা পরিস্কারভাবে বলিয়াছেন, "পরিদ্যাবাপৃথিবী সদ্য অয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য"। অর্থাৎ '(আমি) সদ্যই (অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সমকালেই) দ্যাবাপৃথিবীকে সর্ব্বতঃ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ঋতের প্রথমোৎপন্নের (হিরণ্যগর্ভের) ন্যায় অবস্থিত আছি'। অতএব বলিতে হয় জীব ইহসংসারে ইহশরীরে বর্ত্তমান থাকিতেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। ইহসংসারে এবং ইহশরীরে মুক্তিলাভ করাকেই জীবন্মুক্তি কহে। আচার্য্য গৌড়পাদ জীবন্মুক্তের অবস্থার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ। অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা"।। (গৌড়পাদকারিকা, ৩।৪২)। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থায় চিত্ত লীন হয় না, আবার বিক্ষিপ্তও হয় না, নিঃস্পন্দ থাকে, এবং তাহাতে কোন বস্তুর আভাস অর্থাৎ আকৃতি থাকে না, তখন তাহা ব্রহ্ম-নিষ্পন্ন হয়'। মন্ত্রে যে "ন লীয়তে" শব্দের উল্লেখ আছে উহাতে মনে করা যাইতে পারে যে জীবন্মুক্তাবস্থায় চিত্ত লীন না হওয়াতে জীবের বাসনাদি-যুক্ত থাকাই সঙ্গত মনে হয়। আর বাসনাদিযুক্ত থাকিলে মুক্তি লাভ হইল কি করিয়া বলা যাইতে পরে ? লয় ও বিক্ষেপ অবস্থায় যোগ বা সমাধি হয় না। (দ্রষ্টব্য যোগসূত্র, ১।১ র ব্যাসভাষ্য)। সমাধিলাভ না হইলে মুক্তিপ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা এই সন্দেহের দূরীকরণার্থে বলিব জীবন্মুক্তাবস্থায় চিত্ত থাকে বটে, কিন্তু উহাতে তরঙ্গ বা বাসনাদি কিছুই তখন থাকে না বলিয়া উহা মুক্তিতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে উপর্য্যুক্ত প্রকার (গৌড়পাদ বর্ণিতমতে) যখন চিত্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তখন জীব ব্রহ্মরূপে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম হয় বা মুক্ত হয়। শঙ্কর "নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা" মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "যদৈবং লক্ষণং চিত্তং তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্মস্বরূপেন নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতি"। তাই দেখা গেল চিত্তের লয় না হইলেও ব্রহ্মনিষ্পন্ন হওয়া যায়। যতক্ষণ চিত্ত আছে ততক্ষণই শরীর আছে বুঝিতে হইবে। তাই শরীর থাকাকালীন ব্রহ্মনিষ্পন্ন হওয়া যায়। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা। আচার্য্য শঙ্কর

জীবন্মুক্তিবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন আমরা উহাদের ভিতর কতিপয় শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিতেছি। এবং সেই সকল শ্রুতিবাক্যের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"।[১] 'তাঁহাকে (পুরুষকে) এই প্রকারে জানিয়া (জীব) ইহশরীরে থাকিতেই অমৃত হয়'। "এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য"।[২] 'হে সৌম্য ! গুহানিহিত ইহাকে (ব্রহ্মকে) যে জীব জানে, সে জীবিতাবস্থায়ই অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে'। আমরা এই অবিদ্যা-গ্রন্থির বিনাশকেই মুক্তি বলিয়া আসিয়াছি। ইহলোকেই যখন অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন মুক্তিও ইহলোকেই লাভ হয় বলিতে হইবে। ইহলোকে মুক্তিলাভই জীবন্মুক্তি। শ্রুতিতে আরও আছে, "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি"।[৩] '(তিনি এই দেহেই) দেবতা হইয়া (দেহপাতের পর) দেবতাতে লয়প্রাপ্ত হন'। "যদাসর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"।[৪] 'যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা হইতে প্রকৃষ্টরূপে (জীব) মুক্ত হয়, তখনই মর্ত্যজীব অমৃত হয়, এইখানেই (অর্থাৎ এই দেহেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়')। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি। এই দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলাতে জীবন্মুক্ত অবস্থাকেই বুঝাইতেছে। "ইহৈব সন্তোঽথবিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতি বিনষ্টিঃ"।[৫] 'এখানে (ইহলোকে ইহশরীরে) থাকিতেই আমরা তাঁহাকে জানিব। যদি তাঁহাকে ঐরূপে জানিতে না পারি, তবে মহান্ সর্ব্বনাশ হইবে'। এখানে দেখা যাইতেছে যে ইহজীবনে মুক্তিলাভ করাই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কারণ পরজীবনে মুক্তি লাভের নিশ্চয়তা কি ? উপর্য্যুক্ত মন্ত্রে যে বলা হইয়াছে ইহজীবনে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে মহা অনিষ্ট হইবে, উহার অর্থ ইহাই মনে হয় যে, জীবকে ভবিষ্যৎ জীবনে ব্রহ্মলাভ করিব বলিয়া বসিয়া না থাকিয়া ইহজীবনেই পরমার্থ তত্ত্ব লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। আরও বলা হইয়াছে, "স এবং বিদ্বান্ ছন্দোময়ো দেবতাময়ো ব্রহ্মময়োঽমৃতময়ো সম্ভূয় দেবতা অপ্যেতি য এবং বেদ। যো বৈ তদ্বেদ যথা ছন্দোময়ো দেবতাময়ো ব্রহ্মময়োঽমৃতময়ঃ সম্ভূয় দেবতা

১। তৈত্তি আ, ৩।১২।১৭ ; ৩।১৩।২

২। মুণ্ডক, উ, ১।২।১০

৩। শত ব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।১০।৪, ৭, ১০ ইত্যাদি ; বৃহ, উ, ৪।১।২, ৩, ৪ ইত্যাদি।

৪। শত ব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৯ ; বৃহ, উ, ৪।৪।৭ ; কঠ, উ, ৬।১৫

৫। বৃহ, উ, ৪।৪।১৪

অপ্যেতি তৎসুবিদিতমধ্যাত্মম্”।[১] অর্থাৎ ‘তত্ত্ববিদ্ এই দেহেই সম্যক্ ছন্দোময়, দেবতাময়, ব্রহ্মময় এবং অমৃতময় হইয়া দেহপাতের পর দেবতাতে লয় হয়’। যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্মের “অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে”।[২] ‘জীব (ধ্যানধারণাদিরূপ) অনুষ্ঠান করিয়া অশোক হয় এবং বিমুক্ত হইয়া পুনরায় বিমুক্ত হয়’। এখানে দুইবার বিমুক্তি লাভের উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, ইহশরীরে বর্ত্তমান থাকিতেই জীব অবিদ্যাকামকর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অশোক হয়। উহা জীবন্মুক্তি। অতঃপর দেহবন্ধন হইতেও বিমুক্ত হয়, আর শরীর গ্রহণ করে না। উহা বিদেহমুক্তি। “পরন্তু সেই জ্ঞানী পুরুষ যদিও দেহবানের ন্যায়ই (দেহীর মতন) দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি এখানেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন ; তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁহার পরিচ্ছিন্ন অব্রহ্মভাবের হেতুভূত কামনাসমূহ বিদ্যমান থাকে না, সেইহেতু ইহজন্মেই তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রবুদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না ; কেন না জ্ঞানীর যে, মৃত্যুর পর অন্যভাব প্রাপ্তি তাহা বাস্তবিক পক্ষে জীবদবস্থা হইতে কোনও স্বতন্ত্র অবস্থা নহে, পরন্তু অজ্ঞলোকের মৃত্যুর পর যেরূপ দেহান্তরসম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাঁহার সেরূপ হয় না ; এই জন্যই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন বলা হইয়া থাকে”।[৩] ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন বলাতে বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানী জীব জীবন্মুক্ত হইয়া বিদেহ মুক্তপদ প্রাপ্ত হন। “অনাত্মবিষয়াঃ কামা অবিদ্যালক্ষণা মৃত্যেব ইত্যেতদুক্তং ভবতি। অতো-মৃত্যুবিয়োগে বিদ্বান্ জীবন্নেব অমৃতো ভবতি। অত্র অস্মিন্নেব শরীরে বর্ত্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষং প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ, অতঃ মোক্ষো ন দেশান্তর-গমনাদি অপেক্ষতে··”। (দ্রষ্টব্য বৃহদারণ্যক্, উ, ৪।৪।৭।১র শঙ্করভাষ্য)। ‘অবিদ্যামূলক অনাত্মবিষয়ক যে কামনা তাহাই মৃত্যু ; অতএব সেই অবিদ্যারূপ মৃত্যু বিনাশ হওয়ায় জ্ঞানীপুরুষ জীবিতাবস্থায়ই অমৃত হইয়া থাকেন। এখানে (অর্থাৎ এই শরীর মধ্যে) বর্ত্তমান থাকিয়াই ব্রহ্ম ভোগ করেন (লাভ করেন), ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষকে প্রাপ্ত হন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে মোক্ষে কখনও দেশান্তর গমনের অপেক্ষা থাকে না, অর্থাৎ দেশান্তরে যাইয়া যে মোক্ষ লাভ করিতে হইবে এরূপ কথা হইতেই পারে না’। যিনি আত্মরতি,

১। ঐত, ব্রা, ২।৪০ ; ১।২২

২। কঠ, উ, ৫।১

৩। বৃহ, উ, ৪।৪।৬ (৬) র শঙ্করভাষ্যের শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের বঙ্গানুবাদ।

আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ তিনি জীবিতকালেই স্বারাজ্যে অভিষিক্ত থাকেন, দেহপাতেও স্বরাটই (মুক্তই) হন—"স এবংলক্ষণো বিদ্বান্ জীবন্নেব স্বারাজ্যেঽভিষিক্তঃ, পতিতেঽপি দেহে স্বরাডেব ভবতি"। (দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৫।২ র শঙ্করভাষ্য)। আরও বলা হইয়াছে, "কুলালচক্র সবেগে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইলে মধ্যপথে বাধাপ্রাপ্ত না হইলে, উহার ঘূর্ণন বেগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকিবে। অকর্তৃব্রহ্মাত্মজ্ঞানও মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত করিয়া কর্ম্মোচ্ছেদ করিলেও চক্র দৃষ্টান্তে বহুকাল প্রবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার শীঘ্র অপগত হয় না, অধিকন্তু কিয়ৎ পরিমিত কাল তাহার অনুবর্ত্তন থাকিয়া যায়। তাই জ্ঞান হইলেও জ্ঞানীর কিয়ৎ পরিমিত কাল শরীর ধারণ সংঘটন হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে কিছুকাল শরীর ধারণ হয় কি, হয় না, ইহা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভব সিদ্ধ"। (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫ উপর শঙ্করভাষ্যের শ্রীযুক্ত কালীবরবেদান্ত-বাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)।

আচার্য্য শঙ্করের 'গীতাভাষ্যে' ও 'প্রকরণগ্রন্থে' জীবিতাবস্থায়ই যে মুক্তি লাভ হয় তাহার উল্লেখ বহুই দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "জীবন্ত এব জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং বিষ্ণোর্মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং মিত্যর্থঃ"। (গীতা ২।৫১ ; ৫।২৪,২৬ শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)। 'জ্ঞানী জীবিতাবস্থায়ই জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দেহ পাতের পর বিষ্ণুর সর্ব্বোপদ্রবরহিত অনাময় পরম মোক্ষপদ (নির্ব্বাণমুক্তি বা বিদেহমুক্তি) প্রাপ্ত হন'। শ্রীধরস্বামীও বলেন, "স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ"। (দ্রষ্টব্য গীতা ৫।২৮ উপর শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকা)। 'ঐরূপ ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মুক্ত'। আচার্য্য নিম্বার্ক তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার না করিলেও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে যে উহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্বার্কমতে মুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাই-য়াছি।[১] শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বলদেব উপাধ্যায় নিম্বার্ক মতে জীবন্মুক্তি মান্য নহে এই কথা বলিয়াছেন।[২] কিন্তু নিম্বার্কের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যদৃষ্টে আমাদের মনে হয় যে নিম্বার্ক পরে জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার না করিলেও ভাষ্যপ্রণয়নের সময় পর্য্যন্ত উহা স্বীকার করিতেন। পরবর্ত্তী আর আর উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থেও জীবন্মুক্তি বাদ সমর্থিত হইয়াছে, "সদ্য এব বিমুচ্যতে", (বরাহোপনিষৎ, ২।১৪)। (জ্ঞানী) 'সদ্যই মুক্ত হন'। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।৭ র নিম্বার্কভাষ্য ; আর দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের পৃঃ ৫৫

২। ভারতীয়দর্শন (হিন্দি), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫১৩

সুখী ও আমি দুঃখী এইরূপ বোধই চিত্তের ধর্ম্ম। উহারা দুঃখদায়ক বলিয়া উহারা পুরুষের বন্ধন। উহাদের নিরোধই জীবন্মুক্তি। পুরুষের প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে উপাধিমুক্ত আকাশের ন্যায় বিদেহমুক্তি লাভ হয়'। (দ্রষ্টব্য মুক্তিকোপনিষৎ, ২।২) এইরূপ মহোপনিষৎ, তেজবিন্দু, নারদপরিব্রাজক প্রভৃতি বহু পরবর্ত্তী উপনিষদ্ সমূহে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে।

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ণ জীবন্মুক্তিবাদ যে সমর্থন করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষ্যদৃষ্টে মনে হয়। "তৎপ্রসংখ্যানাদধ্যাত্মবিষয়োঽহঙ্কারো নিবর্ত্ততে। সোঽয়মধ্যাত্ম বহিশ্চ বিবিক্তচিত্তো বিহরন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে"। (ন্যায়সূত্র, ৪।২।২ উপর ভাষ্য)। 'সেই শরীরাদির প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত অধ্যাত্মবিষয়ক অহংকার নিবৃত্ত হয়। যাঁহার অহংকার নিবৃত্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্ত চিত্তে বিচরণ করায় মুক্ত বলিয়া কথিত হন'। ঐরূপ আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্ত চিত্তে বিচরণ করার কথা উল্লেখ করায় ভাষ্যকার যে জীবন্মুক্তিবাদ সমর্থন করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

সাংখ্যমতেও জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার্য্য। যাঁহারা সম্প্রজ্ঞাত যোগের সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মধ্যবিবেকী বলা হয়। মধ্য-বিবেক উপস্থিত হইলে জ্ঞানীর আত্মার সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের বলে তাঁহার শরীর বিদ্যমান থাকায় সুখদুঃখাদি দগ্ধ সূত্রের ন্যায় কিছুকালের জন্য অনুবর্তিত হয়। এই মধ্যবিবেক সম্পন্ন পুরুষই জীবন্মুক্ত। "জীবন্মুক্তশ্চ," (সাংখ্যদর্শন, ৭৮)। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ তত্ত্বের উপদেষ্টা হইতে পারেন না বলিয়া তত্ত্বদর্শীর (জীবন্মুক্তের) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। "উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ"। (সাংখ্যদর্শন, ৭৯)। এই সূত্রের পর আরও চারিটি সূত্রের দ্বারা ঐ গ্রন্থে জীবন্মুক্তের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে।[১] পাতঞ্জলযোগদর্শনে বলা হইয়াছে, "ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ"।[২] 'তারপর ক্লেশ ও কর্ম্মনিবৃত্তি হয়'। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "ক্লেশকর্ম্ম নিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি"।[৩] 'ক্লেশ ও কর্ম্ম নিবৃত্ত হওয়াতে বিদ্বান্ জীবিতাবস্থায়ই মুক্ত হন'।

১। সাংখ্যদর্শন, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩

২। যোগদর্শন, ৪।৩০

৩। ঐ, ব্যাসভাষ্য।

ত্রিক্‌দর্শনেও এই জীবন্মুক্তিবাদ সমর্থিত হইয়াছে *। পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী ত্রিক্‌দর্শনের জীবন্মুক্তির ব্যাখ্যা অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন। "ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পাইলে জীব একসঙ্গে অভিন্ন-ভাবে ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না অর্থাৎ পূর্ণত্বলাভ করিতে পারে না। ভোগ ও মোক্ষের সাম্যাবস্থাই জীবন্মুক্তি। ভোক্তা যখন ভোগ্যের সহিত একীভূত হয়, তখন সেই একীভাবকে ভোগ বলে, মোক্ষও বলে। ...বস্তুতঃ ভোগ ও মোক্ষের অনুভূতির সামরস্যই জীবন্মুক্তি। মহেশ্বরানন্দের[১] মতে ইহাই ত্রিক্‌দর্শনের বিশেষতা"।[২] এই ভোগ মোক্ষরূপ সামরস্যের অনুভূতি যে জীবন্মুক্তাবস্থা তাহা বৌদ্ধগণও জানিতেন। "সহজিয়াগণ বলেন যে, বায়ুর গমনপথ রোধ করিয়া, চন্দ্রসূর্য্যের মার্গ নিরুদ্ধ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মনঃ বা বোধচিত্তকে দীপ করিতে পারিলে মহাসুখ প্রকাশমান হয়"।[৩] এই অবস্থাই জীবন্মুক্তাবস্থা। বুদ্ধ নিজেও নির্ব্বাণলাভ করিয়া বহুদিনই শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া লোককল্যাণ করিয়াছেন। জৈনরাও জীবন্মুক্ত অবস্থা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া সম্প্রদায় স্থাপন ও অনেকবিধ লোককল্যাণ কর্ম্মসমূহ করিয়া গিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্যরামানুজ প্রভৃতি জীবন্মুক্তি সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বলেন এই শরীর অবিদ্যা হইতে সঞ্জাত সুতরাং শরীর থাকিতে অবিদ্যার লেশ আছে মানিতে হইবে। তাই অবিদ্যা থাকিতে মুক্তি (জীবিতাবস্থায়) হইতে পারে না। তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি অবলম্বনে ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'জীবন্মুক্তি কি? সশরীর অবস্থায় মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি। আমার মাতা বন্ধ্যা বলিলে যেরূপ অসঙ্গতার্থক কথা হয়, জীবিতাবস্থায় মুক্তি ইহাও সেইরূপ; কারণ শ্রুতিতে

---

* "ভিন্নাজ্ঞানগ্রন্থি র্গতসন্দেহঃ পরাকৃতভ্রান্তিঃ॥ প্রক্ষীণপুণ্যপাপো বিগ্রহ-যোগেঽপ্যসৌমুক্তঃ"। (পরমার্থসার ৬১)। "ইহহি জীবন্মুক্ততৈব মোক্ষঃ"। স্পন্দপ্রদীপিকা, পৃঃ ৭

১। দ্রষ্টব্য মহার্থমঞ্জরী; পৃঃ ১৩৭

২। পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরায়' প্রবন্ধ 'গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু-রহস্য' (সন ১৩৫০ বৈশাখ, পৃঃ ৩০৭)।

৩। ঐ, প্রবন্ধ, পৃঃ ৩০৭

'সশরীর ভাবকে বন্ধ' এবং 'অশরীর ভাবকে মোক্ষ' বলা হইয়াছে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সশরীরত্ব প্রতীতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেই যাঁহার শরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয় তাঁহার সশরীরত্ব বোধের নিবৃত্তি হয়। না তাহাও বলা যায় না; কারণ সশরীরত্ব মিথ্যা এই প্রত্যয়ের দ্বারাই সশরীরভাব নিবারিত হইয়া গেলে, সশরীরে মুক্তি হইল কোথায়? মৃত ব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমানের নিবৃত্তিই, তখন বিদেহমুক্তে আর জীবন্মুক্তে পার্থক্য কি রহিল? তবে বলা যাইতে পারে যাঁহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচন্দ্রদর্শন জ্ঞানের ন্যায় উহা অনুবৃত্ত হয়, তিনি জীবন্মুক্ত। না তাহাও ঠিক নয়; কারণ উক্ত বাধক জ্ঞান ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থেরই মিথ্যাত্ববোধ, সুতরাং সশরীরত্ব প্রতীতির সহিত উহার কারণীভূত অবিদ্যা ও কর্ম্মাদি দোষসমূহও বাধিত হইবে। অতএব দ্বিচন্দ্রদর্শন জ্ঞানের ন্যায় অনুবৃত্ত হয় বলা যায় না'। "তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষে; অথ সম্পৎস্যে," (ছান্দোগ্য, উ, ৬।১৪।২)। 'তাঁহার (মুমুক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যতক্ষণ দেহবিমুক্তি না হয়। দেহত্যাগের পর তিনি বিমুক্ত হন, (অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করেন)'। সদ্বিদ্যানিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং জীবন্মুক্তিবাদ রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে গ্রহণ করা যায় না। তাই জ্ঞানলাভ হইলেই যে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে তাহা নিরস্ত হইল। সমস্ত ভেদ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবিতাবস্থায় সম্ভবপর নহে, "অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তি র্জীবতো ন সম্ভবতি"। (শ্রীভাষ্য, ১।১।৪)। আচার্য্য ভাস্করও জীবিতাবস্থায় জীব মুক্ত হইতে পারে তাহা স্বীকার করেন নাই, "জীবদবস্থায়াং ন মোক্ষঃ," (ভাস্করভাষ্য, ৩।৪।২৬)। আপস্তম্বের মতে জীবন্মুক্তিবাদ যে সমর্থিত হয় নাই তাহা শ্রীভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।* 'সমস্ত বেদ (বৈদিকক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পরলোকের আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যে মোক্ষ লাভ তাহা শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানলাভেই যদি মোক্ষ-প্রাপ্তি হইত তবে (জ্ঞানীকে) ইহলোকে আর দুঃখভোগ করিতে হইত না'। (দ্রষ্টব্য রামানুজের ব্যাখ্যা, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২।৯।২১)। তাই জ্ঞানলাভ হইলেই জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে তাহা নিরস্ত হইল**। অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণ ও অন্যান্য

* দ্রষ্টব্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ সম্পাদিত শ্রীভাষ্য, পৃঃ ৩১৫-১৬।

** জীবন্মুক্তির সমর্থক সূত্র, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২।২১।১৬

ভারতীয়দর্শনের শাখাভুক্ত দার্শনিকগণ যে জীবন্মুক্তিবাদ সমর্থন করিয়াছেন তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও কোন কোন বর্ত্তমান দার্শনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] আমরা বলিব রামানুজ প্রভৃতি যেরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ শাস্ত্রের সাহায্যে উহার স্বপক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আচার্য্যশঙ্কর প্রভৃতি উপনিষদের ভিত্তিতেই জীবন্মুক্তিবাদ প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও মনে করি যে জীবিতাবস্থায় মুক্তিলাভ অসম্ভব হইলে মুক্তি কি তাহা কোনদিনই কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বুঝাইবার কেহ থাকিত না এবং মোক্ষমার্গের পথপ্রদর্শকেরও অভাব হইত, কারণ যে যাহা উপলব্ধি করে নাই, সে তাহা বুঝাইতে বা দেখাইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র উপদেষ্টা ও মোক্ষমার্গের পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন থাকা হেতুই জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার করিতে হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই কোন কোন সম্প্রদায় জীবন্মুক্তিকেই অধিকতর সমাদর করিয়াছেন। আবার দুই একটি এমন সম্প্রদায়ও আছে যে জীবন্মুক্তিকেই শুধু স্বীকার করিয়া বিদেহমুক্তিকেও অস্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। ঐসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'রসেশ্বর'সম্প্রদায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মতে মুক্তজীব দিব্যতনু পরিগ্রহ করেন। ঐ দিব্যশরীরের নাশ কখনই সম্ভবপর নহে বলিয়া বিদেহমুক্তির প্রশ্ন কখনই উঠে না। দেব, দৈত্য, মুনি ও দানবাদির মধ্যেও অনেকে রসসামর্থ্যবলে রসময়শরীর (দিব্যদেহ) পরিগ্রহ করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন।[২] "অস্মিন্নাধায় মনঃ স্ফুরদখিলং চিন্ময়ং জগৎ পশ্যন্। উৎসন্নকর্ম্মবন্ধো ব্রহ্মত্বমিহৈব চাপ্নোতীতি"। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বরদর্শন, ৩৪)। অর্থাৎ 'তাঁহাতে (ব্রহ্মে) মন আধান করিয়া স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট চিন্ময় জগতকে দর্শন করতঃ কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক ইহশরীরেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়'। রামানুজ প্রভৃতি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই অবিদ্যার অনুবর্ত্তন দেহ থাকিতে দূর হয় না তাহাও মানিতে হইয়াছে। তাই জীবন্মুক্তিবাদ অস্বীকার করার মূলে জগতের স্থায়িত্বে দৃঢ় বিশ্বাস।[৩] শঙ্কর প্রভৃতি জগতের স্থায়িত্ব অস্বীকার করায় জীবন্মুক্তিবাদ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন।

এতক্ষণ জীবন্মুক্তবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিশেষ বিশেষ মতবাদের

১। P. N. Srinivasachari : The Philosophy of Visistādvaita, p. 463
২। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বরদর্শন, ৮-১০ শ্লোক।
৩। Dr. N. K. Brahma: Philosophy of Hindu Sādhanā, p.201

উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদেহমুক্তিবাদ ভারতীয় দার্শনিকগণ কি অদ্বৈতবাদী বা কি অন্যান্যবাদী সকলেই প্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল শুধু দুই একটি সম্প্রদায় জীবন্মুক্তিকে স্বীকার করিয়া বিদেহমুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই একটি সম্প্রদায়ের মতই যে সঠিক তাহাও বলিব না। সে যাহা হউক, এখন আমরা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি অবস্থাদ্বয়ের স্বরূপ বর্ণনায় রত হইতেছি।

জীবন্মুক্তের স্বরূপ

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে জীবন্মুক্তের বর্ণনা নিম্নলিখিত ভাবে করিয়াছেন, 'যাঁহার ভবদোষ দূর হইয়াছে,যিনি কলাযুক্ত হইয়াও নিষ্কল, যাঁহার চিত্ত চিন্তাশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত'। 'যোগীর ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদনে চিত্ত মগ্নতানিবন্ধন অন্তর ও বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানের অভাবই জীবন্মুক্তের লক্ষণ'। 'যিনি শ্রুতির উপদেশ বলে নিজের ব্রহ্মভাব বিদিত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।[১] আচার্য্যের মতে 'গীতা'য় জীবন্মুক্তকে স্থিতপ্রজ্ঞ, মদ্‌ভক্ত, ও গুণাতীত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[২] 'শ্রীমৎ ভাগবতে' জীবন্মুক্তের অবস্থা নিম্নরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। "দেহং বিনশ্বরমবস্থিত-মুত্থিতং বা সিদ্ধ ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎস্বরূপম্। দৈবাদুপেতমথ দৈব-বশাদপেতম্ বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ"।[৩] অর্থাৎ 'যেরূপ মদিরাসক্ত মত্তব্যক্তি নিজ কটিতটে বস্ত্র রহিল কি পড়িয়া গেল দেখেন না, সেইরূপ সিদ্ধ (জীবন্মুক্ত) আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া, আসনে উপবিষ্ট রহিল বা আসন হইতে উত্থিত হইল, দৈববশে দূরে চলিয়া গেল বা দৈববশে সেইস্থানে ফিরিয়া আসিল, তাহার কিছুই দেখেন না'। মহাভারতে জীবন্মুক্তের স্বরূপ বা স্থিতি সম্বন্ধে নিম্নপ্রকার বলা হইয়াছে, "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা"।[৪] অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ মৃত্যুকেও কামনা করেন না বা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করেন না। তিনি কালের প্রতীক্ষায়ই থাকেন, যেরূপ ভৃত্য আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে'। বিভিন্ন উপনিষদে জীবন্মুক্তের বর্ণনা নিম্নোদ্ধৃত ভাবে

১। বিবেকচূড়ামণি, ৪৩২, ৪৩৭, ৪৩৯

২। গীতা, ২।৫৫ ; ১২।১৩-১৯ ; ১৪।২২-২৫ মন্ত্রের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীমৎভাগবৎ, ১১।১৩।৩৬

৪। মহাভারত, ১২।২৪৫।১৫

করা হইয়াছে, "বিকল্পরহিতা চৈতন্যাকারিতা বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রজ্ঞা কহে। সেই প্রজ্ঞা যাঁহার সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত কহে। 'যাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংজ্ঞান এবং দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত বস্তুতে ইদংজ্ঞান হয় না, তিনিই জীবন্মুক্ত'। 'যিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতে তাঁহার (ব্রহ্মের) সৃষ্ট প্রপঞ্চের কোনই পার্থক্য দেখেন না, উভয়ই এক বলিয়া মনে করেন তিনিই জীবন্মুক্ত'। 'যিনি এই সংসারে সাধুজন কর্ত্তৃক পূজিত এবং দুর্জ্জন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও সমভাবে অবস্থান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত"।[১] 'যিনি চিত্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি অতীব পবিত্র-চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন, যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত এবং পরমাত্মায় বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত'। যাঁহার চিত্তে এই জগৎ, এই সেই আমি ইত্যাদি ভাসে না, তিনিই জীবন্মুক্ত।[২] 'কর্ণধার যেরূপ পঙ্কগ্রস্ত নৌকাকে, চালক যেরূপ হস্তিকে নিজের বুদ্ধিবলে নিজাভিমতরূপ চালনা করেন, সেইরূপ যে বিষয়বিরক্ত পুরুষ আত্মব্যতিরিক্ত দৃশ্যমান সমস্ত অনাত্ম জগতকে নশ্বর বলিয়া অবগত হইয়া, আত্মব্যতিরিক্ত আমার আর কিছু জানিবার নাই ভাবিয়া সর্ব্বদা আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ব্যবহার করতঃ কৃতকৃত্য হন, তিনিই জীবন্মুক্ত'।[৩] 'যাঁহাদের বাসনা ভর্জ্জিতবীজতুল্য হওয়ায় পুনর্জ্জন্ম বিধানে অসামর্থ্য এবং বিষয়ভোগরহিতা, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত'। যাঁহার হৃদয়াকাশে বিরাজিত বিজ্ঞান জ্ঞেয়-বিষয়ের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও লিপ্ত হয় না, যাঁহার সম্বিৎ অচিৎ-সম্পর্ক শূন্যা, তিনিই জীবন্মুক্ত।[৪] 'যিনি আমার জরা, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, ও বার্দ্ধক্য নাই জানেন, এবং আমিই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, ইহা যাঁহার স্থির হইয়াছে, আমিই চিৎস্বরূপ, আমিই চিৎস্বরূপ, ইহা যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত'। যিনি নিজেই ব্রহ্ম, নিজেতে নিজে অবস্থিত, নিজের রাজ্যে নিজে আনন্দে অবস্থান করেন, আনন্দস্বরূপকে ভোগ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত'। যিনি নিজে অজেয়, নিজেই প্রভু, যিনি নিজের স্বরূপে স্থিত থাকিয়া দর্শন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।[৫]

১। অধ্যাত্মোপনিষদ্, ৪৪-৪৭
২। বরাহোপনিষদ্, ৪।২৯-৩০
৩। নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্, ৬১
৪। অন্নপূর্ণোপনিষদ্ ৪।৫২, ৫৮, ৫৯ ; আর দ্রষ্টব্য মহোপনিষদ্, ২।৪০-৬৩
৫। তেজবিন্দোপনিষদ্, ৪।২৯-৩২

বিদেহমুক্তের স্বরূপ

চিত্তনাশ দুই প্রকার, স্বরূপ এবং অরূপ। জীবন্মুক্তকে স্বরূপ ও বিদেহ-মুক্তকে অরূপ বলা হয়। জীবন্মুক্তের চিত্ত পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত হয়, তাঁহার মনোনাশ স্বরূপ এবং বিদেহমুক্তের অরূপ মনোনাশ হয়।[১] 'কালবশে প্রারব্ধক্ষয়ে শরীরপাত হইলে জ্ঞানী জীবন্মুক্তপদ পরিত্যাগ করিয়া, বায়ু যেরূপ নিষ্পন্দতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন'।[২] 'হে নিদাঘ! অরূপ মনোনাশ বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিতেই দেখা যায়। ঐ ব্যক্তি (বিদেহ-মুক্ত) নিষ্কল ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার মৈত্রাদিগুণসম্পন্ন সত্ত্বপ্রধান চিত্ত লয়প্রাপ্ত হয়। পরম পবিত্র শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ বিদেহমুক্তিতে লৌকিক কোন ব্যবহারই দৃষ্ট হয় না। ঐ অবস্থায় গুণ বা অগুণ, সম্পদ বা বিপদ, উদয় বা অস্ত, হর্ষ বা শোক অথবা জ্ঞান ইত্যাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না। সেই বিদেহমুক্তি পদে তেজ বা অন্ধকার, সন্ধ্যা বা দিন, সত্ত্বা বা অসত্ত্বা এবং মধ্যবর্ত্তী কোন ধর্ম্মই নাই'।[৩] 'যিনি ব্রহ্মভূত, দেহেন্দ্রিয়াদি যাঁহার উপশান্ত হইয়াছে, ব্রহ্মানন্দময়, সুখী, স্বস্বরূপ ও মহামৌনী তিনিই বিদেহমুক্ত'। 'যিনি নিজকে আনন্দস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ, মোক্ষস্বরূপ এবং আমিই ব্রহ্ম, আমিই চিৎস্বরূপ ইহাও চিন্তা না করিয়া চিন্মাত্রস্বরূপে স্থিত, তিনিই বিদেহমুক্ত। যিনি আমিই নিশ্চিত ব্রহ্ম এই চিন্তাও না করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে স্থিত তিনিই বিদেহমুক্ত। যিনি অসীম, যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরহিত, যিনি তুরীয় হইতেও তুরীয়, শুভাশুভ বিবর্জ্জিত, বন্ধমোক্ষরহিত, গুণাগুণবিহীন, দেশকালাতীত, সাক্ষী ও অসাক্ষীভাবের অতীত, কিছু ও কিছু নহে এই ভাবের অতীত, জগৎ প্রপঞ্চের ভাণ যাঁহাতে নাই, ব্রহ্মাকার বৃত্তিও নাই, যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি আত্মরতি, যিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্বরূপ, যিনি স্বয়ং বাক্য ও মনের অগোচর এবং ভাবাতীত, তিনিই বিদেহমুক্ত। যিনি চিত্তবৃত্তির অতীত হইয়াও চিত্তবৃত্তির অবভাষক এবং সর্ব্ববৃত্তিহীন, তিনিই বিদেহমুক্ত'।[৪]

উপরে যে বিদেহ মুক্তের স্বরূপ বর্ণনা করা হইল উহা তাঁহাদেরই মতে গ্রাহ্য যাঁহারা মানেন যে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় অথবা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়; সুতরাং তখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জীবের কোনপ্রকার ব্যক্তিত্ব থাকে না।

১। মুক্তিকোপনিষৎ, ২।৩২, ৩৪

২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, (উৎপত্তি প্রকরণ) ৯।১৪; মুক্তিক, উ, ২।৭৪

৩। অন্নপূর্ণা, উ, ৪।১৮-২২

৪। তেজবিন্দু, উ, ৪।৩৩; ৪।৩৬; ৪।৪৮-৫২

অদ্বৈতবাদী এবং ক্রমভেদাভেদবাদী বেদান্তিগণ ঐ প্রকার মানিয়া থাকেন। সুতরাং বিদেহমুক্তের উপর্য্যুক্ত স্বরূপ তাঁহাদেরই মান্য। পরন্তু অপরে, যথা রামানুজাদিবেদান্তিগণ, জৈনগণ ও সাংখ্যবাদিগণ প্রভৃতি তাহা মানেন না। উঁহাদের মতে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বিদেহমুক্তির 'বিদেহ' শব্দের অর্থ বিগতদেহ অর্থাৎ যাঁহার দেহের নাশ হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীবেদান্তিগণ জীবের দেহ তিন প্রকার বলিয়া মানেন, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ। অপর বেদান্তিগণ কারণ দেহের সদ্ভাব স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের দেহ দুইটি—স্থূল ও সূক্ষ্ম। জৈন ও সাংখ্যাদির মত তাহাই। স্থূলদেহ পরিত্যাগ হইলেই জীবের মৃত্যু হয়। তখন সূক্ষ্মদেহ ও (কারণদেহবাদিগণের মতে) কারণদেহ থাকে। ঐ দেহবিশিষ্ট জীব পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করে। সুতরাং স্থূলদেহ থাকিলে জন্মমৃত্যু বন্ধ হয় না। তাই মুক্তজীবের সূক্ষ্মদেহও থাকে না। যাঁহারা কারণদেহ মানিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে তখন কারণদেহও থাকে না। অপরবাদিগণ স্থূল ও সূক্ষ্মকে প্রাকৃতদেহ বলেন। তাঁহারা বলেন যে মুক্তিতে প্রাকৃতদেহের নাশ হয় বটে, কিন্তু জীব তখন অপ্রাকৃতদেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের জন্য 'বিদেহ' শব্দের অর্থ বিগত প্রাকৃতদেহ; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্বদেহ বিগত নহে। যাঁহারা মুক্তিকে ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মলয় মানিয়া থাকেন তাঁহারাও মুক্তিতে প্রাকৃতদেহের নাশ হয় বলিয়া বলেন, কিন্তু কোন প্রকার অপ্রাকৃতদেহের সদ্ভাবও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে 'বিদেহ' শব্দের অর্থ যথাশ্রুতঃ সর্ব্বদেহ বিগত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি

বিদেহমুক্তি প্রাপ্তির সম্বন্ধে দুইটি মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেহ অর্থ বিগতদেহ। কোন কোন মতে দেহ তিনটি, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। আবার কোন কোন মতে দুইটি, স্থূল ও সূক্ষ্ম। প্রথমমতে তিনটি দেহের নাশ হইলেই জীব বিদেহমুক্ত হয়, এবং দ্বিতীয়মতে দুইটি দেহের নাশ হইলে জীব বিদেহমুক্ত হয়। একমতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাবল্য-হেতু স্থূলদেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই অপর দেহদ্বয়ও নাশ হয়। ইহাকেই সদ্যোমুক্তি কহে। অপর মতে অপর দেহের নাশ স্থূলদেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই হয় না। কিঞ্চিৎকাল পরে হয়। এইমতে জীব ক্রমে বিদেহ হয়। পরব্রহ্ম প্রাপ্তিকে মুক্তি কহে। সদ্যই পরব্রহ্ম প্রাপ্তিকে সদ্যোমুক্তি এবং ব্রহ্মলোক পরম্পরায় পরব্রহ্ম প্রাপ্তিকে ক্রমমুক্তি কহে।[১]

পরে 'মুক্তের প্রারব্ধভোগ' অধ্যায়ে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ হয় এবং তৎপরে ক্রিয়মান কর্ম্মের অশ্লেষ হয়। তদনন্তর ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে দেহপাত হয়। দেহপাত কালে এবং তাহার পর জ্ঞানীর অবস্থা কি প্রকার হয় তদ্বিষয়ে সেখানে কিছুই বলা হইবে না। নিম্নে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ দেহপাতকালেই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই সদ্যোমুক্তি। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি"। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে এই প্রকারের কথা দুইবার পাওয়া যায়। প্রথমবারে বিদেহরাজ জনক কর্ত্তৃক সমাহুত ব্রহ্মবিদ্‌গণের মহাসভায় ঋষি আর্ত্তভাগ ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার স্বয়ং জনকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মোপদেশ। আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আছে, "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাঽয়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে* স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃত শেতে"।[২]

১। দ্রষ্টব্য গীতা, ৮।২৪ র শঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরি কৃত টীকা। ২। বৃহ, উ, ৩।২।১১

* 'সমবনীয়ন্তে' বা 'সমবলীয়ন্তে' উভয় পাঠই দৃষ্ট হয়।

আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে যাজ্ঞবল্ক্য যখন এই (গ্রহাদিগ্রহমুক্ত)[১] পুরুষ মরে তখন তাঁহার প্রাণ সমূহ ইহা হইতে উৎক্রমণ করে কি, করে না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না করে না; এইখানেই সম্যক্ মিলিত (বিলীন) হয়'। 'সে (অর্থাৎ তাঁহার দেহ) স্ফীত হয়, বায়ুপূর্ণ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট পড়িয়া থাকে'। জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে পাওয়া যায়, মরণ প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযান মার্গ প্রভৃতি বিবৃত করিবার পর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছিলেন, "ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি„।[২] 'ইহা (এবম্প্রকার গতাগতি) সকাম পুরুষের কথা। অনন্তর কামনাহীন পুরুষের কথা বলা যাইতেছে)। যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্ম হইয়াও তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন'। ইহাই সদ্যোমুক্তি। আচার্য্যশঙ্কর বলেন, ঐ সদ্যোমুক্তিভাক্ দর্শননিষ্ঠ ব্যক্তিদের কোন স্থানে গমন বা আগমন নাই',[৩] অর্থাৎ তাঁহারা স্থূলদেহপাতের সাথে সাথেই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। অকাময়মান বিদ্বান্ পুরুষ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হন। ইহাই সদ্যোমুক্তি। আর কামায়মান বিদ্বান্ পুরুষ কি ভাবে বর্ত্তমান লোক হইতে প্রস্থান করিয়া ব্রহ্মলোক পরম্পরায় মুক্ত হন তাহা নিয়ে বিবৃত করিতেছি। এই ব্রহ্মলোক পরম্পরায় পরব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ মুক্তিই ক্রমমুক্তি।

বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে কামায়মান বিদ্বান্ পুরুষ কি ভাবে বর্ত্তমান লোক হইতে প্রস্থান করেন তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'বিদ্বান্ যখন এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন প্রথমে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হন। বায়ু স্বদেহে উপস্থিত পুরুষের উর্দ্ধে গমনের জন্য রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ করিয়া দেন। উপাসক সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধে গমন করতঃ আদিত্য মণ্ডলে উপস্থিত হন। আদিত্য তাঁহার জন্য স্বশরীরে লম্বরনামক বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ করিয়া দেন। সেই পুরুষ ঐ

১। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৩।২।১-৯) বিবৃত হইয়াছে যে প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হস্ত ও ত্বক্ এই আটটি গ্রহ এবং অপান, নাম রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম্ম ও স্পর্শ এই আটটি যথাক্রমে তাহাদের অতিগ্রহ। এই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুদ্বারা জীব আর্ত্ত। তাহা হইতে মুক্ত জীব অমৃত হয়।

২। বৃহ, উ, ৪।৪।৬

৩। "ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতি বা কচিদস্তি"। গীতা, ৮।২৪ র শঙ্করভাষ্য।

ছিদ্রপথের সাহায্যে উর্দ্ধে পুনশ্চ গমন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হন। চন্দ্র তখন ঐ পুরুষের জন্য স্বশরীরে তুন্দুভি বাদ্যের ছিদ্রের ন্যায় একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ প্রস্তুত করিয়া দেন। উপাসক ঐ পথে উর্দ্ধে গমন করতঃ শোক ও হিমবর্জ্জিত (অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক দুঃখরহিত) লোকে (ব্রহ্মলোকে) উপনীত হন, এবং সেখানে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করেন'।[১] বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, 'যাঁহারা যথোক্তরূপে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার রহস্য অবগত আছেন এবং যাঁহারা (বানপ্রস্থিগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সত্যব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারাও দেহপাতের পর জ্যোতির অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা), অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষের পর উত্তরায়ণ[২] ছয়মাসে গমন করেন; সেখান হইতে দেবলোকে, দেবলোকের পর আদিত্যকে, আদিত্যের পর বৈদ্যুত পুরুষকে প্রাপ্ত হন। বিদ্যুৎ-দেবতার নিকট উপস্থিত উপাসকদিগকে ব্রহ্মার মানস সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্ট কোন পুরুষ আসিয়া (এই পুরুষ শুক্রশোণিত সংযোগে উৎপন্ন হন নাই) ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তথায় তাঁহারা বহুদিন পর্য্যন্ত বাস করেন, আর তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না'।[৩] ব্রহ্মলোকেও উপাসকের উপাসনাগত তারতম্য থাকাহেতু উত্তমাধমভেদে ভূমিবিভাগ হইয়াছে।[৪] ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, 'জ্ঞানী ওঙ্কারের ধ্যান করতঃ উর্দ্ধে গমন করেন। সেই বিদ্বান্ মনকে প্রেরণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ অতি সত্বর আদিত্যে গমন করেন। এই আদিত্যই জ্ঞানীদিগের জন্য ব্রহ্মলোকে প্রবেশের দ্বার, আর অজ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্রহ্মলোক লাভের প্রতিবন্ধক স্বরূপ।[৫] উৎক্রমণ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, 'হৃদয়নামক মাংস-পিণ্ডের একশত একটি নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকের দিকে নির্গতা হইয়াছে। সেই নাড়ীটিকে অবলম্বন করিয়া

১। বৃহ, উ, ৫।১০

২। সূর্য্য যে ছয়মাস কাল উত্তরাভিমুখে গমন করেন সেই ছয় মাসই উত্তরায়ণের কাল।

৩। বৃহ, উ, ৬।২।২৫ (প্রায় এই জাতীয় বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদে, ৪।১৫।৫; ৫।১০।১-২ য়ে আছে।)

৪। "ব্রহ্মলোকানিতি অধরোত্তরভূমিভেদেন ভিন্না ইতি গম্যন্তে, বহুবচনপ্রয়োগাৎ। উপাসনাতারতম্যোপপত্তেশ্চ"। বৃহ, উ, ৬।২।১৫ (৭) র শঙ্করভাষ্য।

৫। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৬।৫

ঊর্দ্ধগামী পুরুষ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অন্য একশতটি অধঃ ও বক্রগামী নাড়ীসমূহ কেবল দেহ হইতে উৎক্রমণের সহায়তা করে (কিন্তু অমৃতত্ব লাভে নয়)'।[১] কিরূপে যে বিদ্বান্ শবল ব্রহ্মলোক লাভ করেন তাহাও উপর্য্যুক্ত উপনিষদের 'তাণ্ড্য' ও 'শাট্যায়নী' এই উভয় শাখাতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'অশ্ব যেরূপ লোমসমূহ কাঁপাইয়া স্বশরীরস্থ ধূলা ময়লাদি পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, বিদ্বান্ সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা পাপপুণ্য উভয়ই বিধৌত করিয়া নির্ম্মল হন; চন্দ্র যেরূপ রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া ভাস্বর হন, আমিও (বিদ্বান্) সেইরূপ এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি'।[২] উপর্য্যুক্ত শ্রুতি দৃষ্টে মনে হয় বিদ্বান্ উৎক্রমণের সাথে সাথেই পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ঐ শ্রুতির আধারে আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, 'জ্ঞানীর পুণ্যপাপের পরিত্যাগ পরলোক গমন অর্থাৎ দেহ হইতে উৎক্রমণের সময়ই হইয়া থাকে; কারণ (বিদ্বানের) প্রাপ্তব্য বা ভোক্তব্য কিছুই থাকে না'।[৩] ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে চতুর্দ্দশ সূত্রে স্থাপিত সিদ্ধান্তের কিছু বিরোধ আছে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, 'জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনারব্ধকার্য্য পাপপুণ্য বিনষ্ট হয় এবং আরব্ধকার্য্য পুণ্যপাপ দেহপাতের সময় বিনাশ প্রাপ্ত হয়'। আর এখানে তিনি বলিয়াছেন যে, 'উৎক্রমণ মুহূর্ত্তেই তিনি (বিদ্বান্) পুণ্যপাপ ত্যাগ করেন'। আচার্য্যশঙ্কর তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "পরন্তু সুকৃতদুষ্কৃত বিদ্যাবিরোধী, সুতরাং বিদ্যার প্রভাবেই তাহাদের ক্ষয় হয়, ব্রহ্মবিদ্যা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই তাহাদের ক্ষয় হয়। এইরূপে সুকৃতদুষ্কৃত ক্ষয় বাস্তবতঃ পূর্ব্বে সম্পন্ন হইলেও শ্রুতি তাহা পরে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন মাত্র"।[৪] 'ভামতী'কার বাচস্পতি মিশ্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শ্রুতিবাক্যের মর্ম্মার্থ তাহার পাঠক্রম অপেক্ষা বলবত্তর।[৫]

শ্রুতিতে কোথায়ও উল্লেখ আছে, "অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে"।[৬] 'উপাসক এই রশ্মির দ্বারা ঊর্দ্ধলোক আক্রমণ করেন'। কোথায়ও বলা

১। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৬।৬; কঠ, উ, ২।৩।১৬
২। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১৩।১
৩। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।২৭
৪। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।২৭ র শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৫। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।২৭ র ভামতী টীকা দ্রষ্টব্য।
৬। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৬।৫

হইয়াছে, "তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ"।[১] 'তাঁহারা প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ (তেজঃ) সম্পন্ন হন, পরে অর্চ্চিঃ হইতে দিনদেবতায় গমন করেন'। কোথায়ও দৃষ্ট হয়, "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি"[২]—'তিনি (জ্ঞানী) এই দেবযান মার্গ অবলম্বন করিয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন'। কোথায়ও উল্লেখ আছে, "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি"[৩]—'যখন পুরুষ (উপাসক) এই লোক পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুলোকে উপস্থিত হন'। আবার কোনও শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজঃ প্রয়ান্তি"[৪]—'তাঁহারা সূর্য্যদ্বার (সূর্য্যই ব্রহ্মলোকে যাইবার দ্বার) দিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন'। শ্রুতিতে বহু পথের উল্লেখ থাকায় এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ঐ সকল পথ কি বিভিন্ন বা এক? কখনও উল্লেখ করা হইয়াছে 'এই রশ্মির দ্বারা',[৫] আবার কখনও উল্লেখ করা হইয়াছে, "স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি,[৬] 'যাবৎ তাঁহার দেহ শ্মশানে নীত হইবে, তাবৎ তাঁহার মন আদিত্য-লোকে গমন করিবে'। ইত্যাদি দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ সকল বর্ণনার বিষয় কি অভিন্ন না ভিন্ন? দেহ হইতে প্রয়াণের পর সকল বিদ্বানেরাই কি একই পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন? না তাঁহাদের বিভিন্ন জনে বিভিন্ন পথে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন? বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রারম্ভে আচার্য্য বাদরায়ণ এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মীমাংসা সংক্ষেপে এই—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মাত্রেই দেহ হইতে উৎক্রমণের পর অর্চ্চিরাদি দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যান। সেই একই পথ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে মাত্র। ঐ পথটি বহু পথ বা পর্ব্ব বিশিষ্ট। শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে অনেক পর্ব্বের বর্ণনা আছে এবং কোন কোন স্থলে অল্প সংখ্যক্ পর্ব্বের বর্ণনা আছে। শ্রুতির সর্ব্বত্র সমস্ত পর্ব্বের উল্লেখ না হওয়াতেই ঐ আপাতঃ বৈষম্য ঘটিয়াছে। 'অগ্নি'ও 'অর্চ্চি' শব্দ সমানার্থক। সুতরাং প্রথমপর্ব্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রুতিতে কোন বৈষম্য নাই। প্রবাহণোক্ত সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে চিত্রোক্ত বায়ুর স্থান।[৭] তৎপূর্ব্বে দেবলোক। চিত্র কথিত বরুণ, ইন্দ্র এবং প্রজাপতির স্থান যথাক্রমে বিদ্যুতের উপর।[৮] এইরূপে অবধারিত হয় যে, দেবযান পথের পদসন্নিবেশ যথাক্রমে নিম্নপ্রকার,

---

১। বৃহ, উ, ৬।২।১৫
২। কৌষী, উ, ১।৩
৩। বৃহ, উ, ৫।১০।১
৪। মুণ্ডক, উ, ১।২।১১
৫। ছান্দ্যোগ্য, উ, ৮।৬।৫
৬। ছান্দোগ্য, উ, ৮।৬।৫
৭। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।২
৮। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৩

অর্চ্চিঃ (বা অগ্নি), দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেব, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা।

দেবযান পথের অর্চ্চিরাদিক্রমে যে পদবর্ণনা আছে, ঐ সকল বাস্তবতঃ কি এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। কোন গ্রাম বা নগরে গমনাভিলাষী পথের অনভিজ্ঞ পথিককে পথের উপদেশ দিতে গিয়া পথজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণতঃ এবম্প্রকার বলিয়া থাকেন, এস্থান হইতে অমুক পাহাড়ে যাইবে; তারপর এক বৃহৎ বটগাছ পাইবে; তৎপরে নদী; অতঃপর সেই গ্রাম বা নগর পাইবে। অর্চ্চিরাদি কি সেইপ্রকার পথের পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র? না কি তাহারা পথযাত্রীর ভোগবিশ্রামের স্থান? না অপর কিছু? আবার ঐ মার্গের বর্ণনায় ব্যবহৃত দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ও সংবৎসর সাধারণতঃ কালবাচক। সেই হেতু কালের সহিত দেবযান মার্গের কোন সম্পর্ক আছে বা ছিল কি না, তাহাও চিন্তনীয়? এই সমস্ত বিচারপূর্ব্বক আচার্য্য বাদরায়ণ অনুমান করিয়াছেন যে উহারা তত্তদভিমানী আতিবাহিক দেবতাবিশেষ।[১] উহারা পরলোক যাত্রীদিগকে ঐ পথে বহন করিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যান। এই অনুমানের সমর্থনে আচার্য্য বাদরায়ণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। "তল্লিঙ্গাৎ" অর্থাৎ 'যেহেতু তাহার সমর্থক চিহ্ন রহিয়াছে'। দেবযান পথের সম্পর্কে শ্রুতি উপসংহারে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিদ্যুতের পর অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাতে বুঝা যায় যে 'অর্চ্চিঃ' প্রভৃতি শব্দও বাহক দেবতার লাক্ষণিক নাম মাত্র।[২] ফলকথা, যে লোকের অধিপতি অগ্নি বা অর্চ্চি, উপাসক সেই লোক প্রাপ্ত হইবা মাত্র অগ্নি তাহাকে বহন করিয়া পরের লোকে লইয়া যান এবং যে লোকের অধিপতি বায়ু, সেই লোকে যাইবামাত্র বায়ু উপাসককে বহন করেন ইত্যাদি। এই মতের সমর্থন করিতে আচার্য্য বাদরায়ণ স্বতন্ত্র যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। "উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ"।[৩] এই সূত্রটি শঙ্কর, মধ্ব এবং বল্লভধৃত পাঠে পাওয়া যায়। ভাস্করাদি অপর চারিবাদী* উহা পরিগ্রহ করেন নাই। শঙ্কর উহাকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মার্গ অপরিচিত। তদুপরি পরলোকযাত্রীর ইন্দ্রিয়সমূহও সম্পিণ্ডিত। অর্থাৎ তাঁহাদের বৃত্তি বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা নির্ব্ব্যাপার। এইরূপে

১। "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ"। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪

২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৬ ৩। ঐ, ৪।৩।৫

* চারিবাদী=ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ, নিম্বার্ক ও রামানুজ।

উভয়ের অজ্ঞতায় (মার্গ অপরিচিত এবং যাত্রী মূর্চ্ছিত) জীব স্বতন্ত্রভাবে চলিতে সক্ষম নহে। অতএব তাহাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য বাহকের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন আছে। এই হেতু অবধারণ করিতে হয় যে অর্চ্চি প্রভৃতি তত্তদভিমানিনী দেবতা। মধ্বকৃত ব্যাখ্যার ভাবার্থ এইরূপই; কিন্তু তিনি "উভয়ব্যামোহ" শব্দের ভিন্নার্থ করিয়াছেন—'উহারা আতিবাহিক দেবতা, না অন্য কিছু এই প্রকার ব্যামোহ'। বল্লভের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাহা হউক, শঙ্করের একটা কথা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাহা এই, দেহ হইতে উৎক্রমণের পর জীবের করণবর্গ সম্পিণ্ডিত, সুতরাং জীব নির্ব্যাপার থাকে।[১] মরণাবস্থার বর্ণনাতে শ্রুতি স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্করও উপর্য্যুক্ত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'লিঙ্গশরীরি জীবের স্বতন্ত্রভাবে গমন উপপন্ন হয় না'।

অর্চ্চিঃ, দিন, পক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দ যে কালবাচক হইতে পারে না, আচার্য্য বাদরায়ণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] উহাদিগকে কালবাচক অর্থে গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয়, যে বিদ্বান্ দিবসে দেহত্যাগ করেন তিনি দেবযান পথে উর্দ্ধগামী হন এবং যিনি রাত্রিতে দেহত্যাগ করেন তিনি উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন না। সেইরূপ শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে, উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে দেহত্যাগে গতির পার্থক্য হয়। মৃত্যু কখন ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ঐ প্রকারে মরণসময়ভেদে পরকাল গতির তারতম্য মানিলে জ্ঞানফলে অনিশ্চয়তা দোষ আপন্ন হয়। তাহাতে শ্রুতির প্রামাণ্যও লাঘব হয়। এরূপ কল্পনা করাও নির্দ্দোষ নহে যে, জ্ঞানী প্রকৃতপক্ষে রাত্রি বা কৃষ্ণপক্ষে মরিলেও স্বপ্রাপ্তব্য গতিলাভের জন্য দিন বা শুক্লপক্ষের অপেক্ষায় দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন। যথোচিৎ সময় উপস্থিত হইলেই নিষ্ক্রান্ত হন। এই হেতু নির্ণয় করিতে হয় যে, জ্ঞানকর্ম্মের ফল মরণমুহূর্ত্তের অপেক্ষা রাখে না। দিবা কি রাত্রি, শুক্লপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ, যখনই মৃত্যু সংঘটিত হউক না কেন, প্রত্যেক মৃতজীবই আপন জ্ঞানকর্ম্মোচিৎ গতিলাভ করিয়া থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া বালগঙ্গাধর তিলক মনে করেন যে, দেবযান ও পিতৃযানের দিন, রাত্রি, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন প্রভৃতি শব্দ আদিতে

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪ র শঙ্কর ভাষ্য।

২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৮-২০ (শব)=৪।২।১৭-১৯ (ভাশ্রীনিরা)=৪।২।১৮-২১ (ম)।

কালবাচক ছিল।[১] 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি[২] এবং ভীষ্মের মৃত্যু সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতেও তাহা মনে হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ অবশ্যই এসকল জানিতেন। তিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, স্মৃত্যুক্ত কালনিয়ম যোগীদিগের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নহে।[৩] স্মার্ত্তযোগীরাই কালমরণাদি অনুসারে যোগের ফল লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুত্যুক্ত উপাসনা পরায়ণ (নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা পরায়ণ) জ্ঞানীরা কালের প্রতীক্ষা না করিয়াই জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বদাই (যখন তখন) অনাবৃত্তিফল (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই আচার্য্য বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত।

শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যাঁহারা দেবযান মার্গে গমন করেন, তাঁহারা অন্তে অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হন ; তাঁহারা আর ইহসংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না'। এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণ তন্মধ্যে আচার্য্য বাদরি এবং আচার্য্য জৈমিনির মতবাদ উদ্ধার করিয়াছেন। "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ"।[৪] 'বাদরি (আচার্য্য বলেন), তিনি কার্য্যব্রহ্ম। কারণ

১। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, তিলক মনে করেন যে দেবযান ও পিতৃযান পথের সঙ্গে শবদাহ প্রথার সম্পর্ক রহিয়াছে। মৃত্যুর পর শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিলে, জ্ঞানী জীব সেই অগ্নি হইতে জ্যোতিঃ (জ্বালা), দিবা ইত্যাদি ক্রমে দেবযান মার্গে অগ্রসর হন, (দ্রষ্টব্য তিলকের গীতাভাষ্য, বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ২৯৮)। কর্ম্মী সেই অগ্নি হইতে ধূম, রাত্রি ইত্যাদি ক্রমে পিতৃযান মার্গে অগ্রসর হয়। (ঐ, পৃঃ ২৯৮)। উক্ত দুই পথের বর্ণনার আদিতে অর্চ্চি ও ধূম শব্দ থাকাতে আপাতদৃষ্টিতে ঐ অনুমান সমীচীন মনে হয়। কিন্তু উহা বিচারসহ নহে। যাবৎ শব অগ্নিতে দগ্ধ না হয় তাবৎকাল জীব কি উহাতে অবস্থান করে? যাহাদের শব অগ্নিতে না পোড়াইয়া মাটিতে পোতা হয় বা জলে ফেলা হয়, তাহাদের গতি কি হয়? তাহারা কি দেহমধ্যে বা তাহার সন্নিকটে অপেক্ষা করিতে থাকে? এই প্রকারের কোন কল্পনাই সঙ্গত নহে। অধিকন্তু দেবযান পথের অধিকারী সম্বন্ধে শ্রুতি সাক্ষাৎ ভাবে বলিয়াছেন, "অথ যদুচৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ ন অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য, উ, ৪।১৫।৫)। অর্থাৎ অনন্তর (তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ) শব্যকর্ম্ম অর্থাৎ দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করুক বা না করুক, তথাপি তাঁহারা (জ্ঞানী) অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন ইত্যাদি।

২। গীতা, ৮।২৩

৩। "যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে"। ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।২১

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৭ (শম) = ৪।৩।৬ (ভাশ্রীনিরা) = ৪।৩।৮ (ব)।

তাঁহার সম্বন্ধেই গতি উপপন্ন হয়'। পরব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সর্ব্বাত্মক। তিনি গন্তার প্রত্যগাত্মা। সুতরাং তাঁহাকে পাইতে দেশান্তরে গমন করিতে হয় না। অপর পক্ষে কার্য্যব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) পরিচ্ছিন্ন প্রদেশবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাকে পাইতে তাঁহার লোকে গমনের প্রয়োজন কল্পনা সঙ্গত হয়। অতএব অবধারণ করিতে হয় যে, দেবযান গতি অবলম্বনে যে ব্রহ্মকে প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, উনি কার্য্যব্রহ্মই। কেবল এই যুক্তিমাত্র নহে, এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। "ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি"। 'ব্রহ্মলোকান্'ও 'ব্রহ্মলোকেষু' প্রভৃতি বহুবচনান্ত বিশেষণ পদ পরব্রহ্মে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কেননা তিনি একরূপ এবং কূটস্থ নিত্য। কিন্তু কার্য্যব্রহ্মের অবস্থাভেদের কল্পনা সম্ভব। সুতরাং তাঁহার প্রতি বহুবচন প্রয়োগ করা যায়। 'লোক' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ বিকারাত্মক বিষয়েই হইয়া থাকে। উহার মুখ্যার্থ 'সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগ-ভূমি'। উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মলোক নিবাসস্থান এবং মুক্ত উপাসক তাহার বাসিন্দা। এইপ্রকার অধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশও পরব্রহ্মে সঙ্গত হয় না। এসকল বিশেষণের নির্দ্দেশ থাকাতে স্থির হয় যে ঐ গতি-শ্রুতির লক্ষ্য কার্য্যব্রহ্ম (বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায়ও তাহা নিশ্চিত হয়)।[১] এই সিদ্ধান্তের দুইটি আপত্তি হইতে পারে। ঐ ব্রহ্ম যদি বাস্তবিক কার্য্যব্রহ্মই হন, শ্রুতি তাঁহাকে ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন কেন? এবং তাঁহাতে গমনের পর উপাসক ইহসংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না বলিয়াছেন কেন? প্রথম আপত্তির উত্তরে আচার্য্য বাদরি বলেন, "সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপ-দেশঃ"।[২] 'কিন্তু সামীপ্য হেতু ঐপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন'। কার্য্যব্রহ্ম (ব্রহ্মা) পরব্রহ্মের অতি সন্নিহিত। সেই হেতু তৎপ্রতি শ্রুতি 'ব্রহ্ম'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা দোষের নয়। দ্বিতীয় শঙ্কা নিরসনার্থ তিনি বলেন, "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ"।[৩] 'যেহেতু শ্রুতিতে কথিত আছে যে (মহাপ্রলয়ে) কার্য্যব্রহ্মলোকের বিনাশ ঘটিলে (তল্লোকবাসিগণ) তথা হইতে, তাহার অধিপতিসহ (ব্রহ্মার সহিত) পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন'। "স্মৃতেশ্চ"।[৪] 'স্মৃতিও সে কথা বলিয়াছেন'। যথা, "ব্রহ্মণা সহ তে

১। "বিশেষিতত্বাচ্চ", ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৮ (শম)=৪।৩।৭ (ভাশ্রীনিরা)=৪।৩।৯ (ব)।
২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৯ (শম)=৪।৩।৮ (ভাশ্রীনিরা)=৪।৩।১০ (ব)।
৩। ঐ, ৪।৩।১০ (শম)=৪।৩।৯ (ঐ)=৪।৩।১১ (ব)।
৪। ঐ, ৪।৩।১১ (ঐ)=৪।৩।১০ (ঐ)=৪।৩।১২ (ব)।

সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্” ॥ এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার অন্ত হয়। তখন কৃতাত্মা অর্থাৎ লব্ধব্রহ্মজ্ঞানী সকলে ব্রহ্মার সহিত পরমপদে (পরব্রহ্মে) প্রবেশ করেন। সুতরাং শ্রুতি সত্যই বলিয়াছেন যে, দেবযান গতিতে ব্রহ্মলোকে গমনের পর বিদ্বান্ আর ইহসংসারে ফিরিয়া আসেন না। এইরূপে সিদ্ধ হয় যে উক্ত গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্ম বিষয়ক। ইহাই আচার্য্য বাদরির মত। পক্ষান্তরে আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে ঐ গতিশ্রুতি পরব্রহ্মবিষয়ক। “পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ”।[১] জৈমিনি (আচার্য্য বলেন), ‘উনি পরব্রহ্ম। কেননা, ‘ব্রহ্ম’ শব্দের মুখ্যার্থ তাহাই’। কার্য্যব্রহ্মে তাহার প্রয়োগ গৌণ। “দর্শনাচ্চ”।[২] ‘যেহেতু শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়’। “তয়োর্দ্ধ-মায়ন্নমৃতত্বমেতি” অর্থাৎ সেই পথে ‘ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন’। এইশ্রুতি সাক্ষাৎভাবে গতিপূর্ব্বক অমৃতত্ব লাভ প্রদর্শন করিয়াছেন। একমাত্র পরব্রহ্মকেই পাইয়া জীব অমৃত হয়। কার্য্যব্রহ্ম নশ্বর, অনিত্য। সেইহেতু তাঁহাকে লাভ করিয়া লোক অমৃত হইতে পারে না, সুতরাং অবধারণ করিতে হয় যে দেবযান মার্গে জীব পরব্রহ্মে যায়। “ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ”।[৩] ‘অধিকন্তু (উপাসকের) সম্প্রাপ্তির সঙ্কল্প কার্য্যব্রহ্ম বিষয়ক নহে’। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মোপাসকের জপ ধ্যানের জন্য একটা মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। যথা, “আমি শ্যাম হইতে শবল প্রাপ্ত হইতেছি; শবল হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি”। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ‘শ্যাম’ অর্থ ‘গাঢ়বর্ণ’ এবং ‘শবল’ অর্থ ‘বিচিত্রবর্ণ’। যাহা শ্যামের ন্যায় নিবিড় তাহাকে শ্যাম বলা যায়। যাহা শবলের ন্যায় বিচিত্রতাময় তাহাকে শবল বলা যায়। ব্রহ্ম অতীব দুর্জ্ঞেয়। সেইহেতু শ্রুতি তাঁহাকে শ্যাম আখ্যা দিয়াছেন। সেই প্রকার নামরূপ বহু বিচিত্র বলিয়া শ্রুতি নামরূপাত্মক ব্রহ্মকে শবল বলিয়াছেন। “আকাশই (ব্রহ্মই) নামরূপের নির্ব্বাহক। সেই নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে অথবা সেই নাম ও রূপ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত এবং তাহাই আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি। আমি যশঃস্বরূপ হইতেছি। ব্রাহ্মণগণের যশ, ক্ষত্রিয়গণের যশ এবং বৈশ্যগণের যশ পাইতে

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১২ (শম)=৪।৩।১১ (ভাশ্রীনিরা)=৪।৩।১৩ (ব)।
২। ঐ, ৪।৩।১৩ (শম)=৪।৩।১২ (ভাশ্রীনিরা)=৪।৩।১৪ (ব)।
৩। ঐ, ৪।৩।১৪ (ঐ)=৪।৩।১৩ (ঐ)=৪।৩।১৫ (ব)।

আমি ইচ্ছা করি। যশেরও যশস্বরূপ আমি, শুভ্রবর্ণ (অর্থাৎ নির্ম্মল, দোষকলঙ্করহিত) এবং বিগতদন্ত (অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণাবিরহিত) হইয়াও যেন ক্ষয়কারক শ্বেতবর্ণ লিন্দু (স্ত্রীচিহ্ন) অভিগমন না করি, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত না হই"।[১] শ্রুতির পরব্রহ্মের প্রকরণেই এই সঙ্কল্প মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে ধ্যেয় বস্তু পরব্রহ্মই। বস্তুতঃ এই বিষয়ে সন্দেহের কোন স্থান নাই। কেননা, ঐ মন্ত্রেই তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। নামরূপের নির্ব্বাহক ও আশ্রয়, অথচ নামরূপ হইতে বিলক্ষণ এই প্রকারে ঐ শ্রুতি ধ্যেয় ব্রহ্মের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরব্রহ্মেরই। "আমি যশস্বরূপ হইতেছি, ব্রাহ্মণগণের যশ" ইত্যাদি বাক্যে যে সর্ব্বাত্মকতা প্রাপ্তির উল্লেখ আছে তাহাতেও নিশ্চিত হয় যে ঐ সঙ্কল্পের লক্ষ্য পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহাকেও সর্ব্বগত ও সর্ব্বাত্মক বলা যায় না। পরব্রহ্মের 'যশঃ' আখ্যার প্রসিদ্ধি শ্রুতিতে রহিয়াছে। যথা, "যাঁহার নাম মহদ্ যশঃ, তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই"। জৈমিনি বলেন এসকল প্রকৃষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কেবলমাত্র, 'প্রজাপতি', 'সভা' ও 'বেশ্ম' শব্দের প্রয়োগ হইতে ঐ সঙ্কল্পবাক্যের প্রাপ্তব্য ব্রহ্মকে কার্য্যব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করা সমীচীন হইবে না। গতিপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির স্পষ্ট উল্লেখ উহাতে আছে। সুতরাং গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তি অনুপপন্ন হয় না। এসকল কারণে আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, উপাসক দেবযান পথে পরব্রহ্মে গমন করেন।

ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করের অনুযায়ী। ভাস্কর, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বল্লভ কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যও তাহাই। আচার্য্য বাদরির মতবাদের ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ শঙ্করের অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য জৈমিনির মতবাদের ব্যাখ্যা তিনি ভিন্নপ্রকারে করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ সর্ব্বথৈব ভিন্ন প্রকারে আলোচ্য সূত্রসমূহের ভাবার্থ করিয়াছেন। দেবযান পথে জীব কোথায় যায়, শঙ্কর প্রমুখ ছয়জন ভাষ্যকারের মতে তাহাই উহাদের বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু রামানুজ মনে করেন এখানে বিচার্য্য এই যে, দেবযান পথে কাহারা যান। সেইহেতু সূত্রগত কোন কোন শব্দের আক্ষরিক অর্থও তাঁহাকে অন্যপ্রকারে করিতে হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া রামানুজের মতবাদের ব্যাখ্যা এখানে করা হইল না।

বৃহদারণ্যক্ শ্রুতি বলিয়াছেন, "তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।[২] '(তাঁহারা) সেই ব্রহ্মলোকে বহু বহু সংবৎসর বাস

১। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১৩।১ ; ৮।১৪।১ ২। বৃহ, উ, ৬।২।১৫

করেন। তাঁহাদিগকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না'। এই পাঠ কাণ্ব-শাখার। কিন্তু মাধ্যন্দিনশাখায় ধৃত এই শ্রুতি—"তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ"।[১] 'সেখানে শাশ্বতকাল বাস করেন'। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"।[২] 'এই পথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা এই সংসারচক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না'। স্মৃতিও সেকথা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার অন্ত হয়। তখন তল্লোকবাসী যাঁহারা কৃতাত্মা হইয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত কল্পান্তে পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন'। সুতরাং শ্রুতি সত্যই বলিয়াছেন যে দেবযান গতিতে ব্রহ্মলোকে গমনের পর বিদ্বান্ আর ইহসংসারে ফিরিয়া আসেন না। ইহাই ক্রমমুক্তি। অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্রহ্মলোকে যাঁহারা উপস্থিত হন, তাঁহারা সগুণব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহাদের মতে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয় না। তাই সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মনির্ব্বাণ কি করিয়া হইবে? আচার্য্য শঙ্কর বলেন, যাঁহাদের নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মলোকে স্বতঃই উদয় হয় তাঁহারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন; আর যাঁহাদের হয় না, তাঁহারা আগামী কল্পে ফিরিয়া আসিবেন। যদি কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না হইত তবে মাধ্যন্দিনশাখায় 'ইহ' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকিত না।[৩] আনন্দগিরি বলেন ছান্দোগ্য উপনিষদে "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" বলার তাৎপর্য্য তাহাই। পূর্ব্বোক্ত (এই গ্রন্থের পৃঃ ১৮০) স্মৃতিবচনে "কৃতাত্মা" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্যও তাহাই মনে হয়। ব্রহ্মলোকবাসী যাঁহাদের নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইয়াছে তাঁহারাই সম্পূর্ণ কৃতাত্মা; আর যাঁহাদের এখনও হয় নাই তাঁহাদিগকে কৃতাত্মা বলা যায় না। উক্তবচনে আছে, 'যাঁহারা কৃতাত্মা হইয়াছেন তাঁহারাই কল্পান্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন'। তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা কৃতাত্মা হন নাই তাঁহারা কল্পান্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিবেন না; তাঁহাদিগকে আগামী কল্পে আসিতে হইবে।

আচার্য্য শঙ্করের মতে সগুণব্রহ্মবাদীদেরই পুনর্জ্জন্ম বা আবৃত্তি হয়; কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবাদীদের অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধ।[৪] তাঁহার মতে জ্ঞানীর

১। বৃহ, উ, ৫।১০।১ ২। ছান্দোগ্য, উ, ৪।১৫।৫

৩। "যদি হি নাবর্ত্তন্ত এব, ইহ গ্রহণমনর্থকমেব স্যাৎ"। বৃহ, উ,৬।২।১৫ র শঙ্কর ভাষ্য।

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২ র শঙ্কর ভাষ্য এবং গীতা, ১২।৩-৪ র শঙ্কর ভাষ্য।

উৎক্রমণ নাই ; কিন্তু উপাসকের উৎক্রমণ আছে। তিনি বলেন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জ্ঞানী সর্ব্বাবস্থায়ই ব্রহ্মপ্রাপ্ত। তাঁহার (জ্ঞানীর) গমনাগমন নাই। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি নির্গুণ উপাসনা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে ক্রমমুক্তির রাস্তায় সকলকেই যাইতে হইবে। আর শঙ্করের মতে উৎক্রান্তি-গতিবর্জ্জিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপতাই প্রকৃত মুক্তি। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির মতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই মুক্তি। এই মুক্তি উপাসকের ক্রমে লাভ হয়। শঙ্কর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি বলিয়াছেন।

মহাভারতে ক্রমমুক্তিবাদ

ক্রমমুক্তির বিবরণ মহাভারতেও সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভীষ্ম বলেন, 'গায়ত্রী উপাসক পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার লোকে গমন করেন। অথবা অগ্নিলোকে, সূর্য্যলোকে, চন্দ্রলোকে বা বায়ুলোকে ভূমিশরীরে (স্থূলশরীরে) বা আকাশশরীরে (সূক্ষ্মশরীরে) গমন করেন।[১] "স তৈজসেন ভাবেন যদি তত্র রমত্যুত। গুণাস্তেষাং সমাধন্তে রাগেণ প্রতিমোহিতা" ॥[২] 'যদি তিনি রাগদ্বারা প্রতিমোহিত হইয়া তৈজসভাবে তথায় রমণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের (অর্থাৎ তত্তৎলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের) গুণসমূহ সম্যক্ ধারণ করেন।' তিনি রাগান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের গুণসমূহ আচরণ করতঃ তথায় বাস করেন।[৩] আর তিনি যদি ঐসকল লোকের ঐশ্বর্য্যসমূহে সংশয়াপন্ন হইয়া উহাদিগেতে "বিরাগী" হন, তবে "পরম অব্যয়" ইচ্ছাকরতঃ পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করেন। "তিনি (পরমেষ্টিভাবরূপ আপেক্ষিক) অমৃত হইতে কৈবল্যাখ্য মুখ্য অমৃতপ্রাপ্ত, শান্তীভূত, নিরাত্মবান (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আত্ম-বোধরহিত), ব্রহ্মভূত নির্দ্বন্দ্ব, সুখী, শান্ত এবং নিরাময় হন। যাহা এক ও অক্ষয় নামে অভিহিত হয়, যাহা অদুঃখ, অজর ও শান্ত এবং যাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না, তিনি সেই ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হন। তিনি (প্রত্যক্ষাদি) চারি, (ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই) ছয় এবং (পঞ্চপ্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই) ষোড়শ লক্ষণ বিরহিত (কারণস্বরূপ) আকাশকে অতিক্রম করতঃ সেই পুরুষকে (অর্থাৎ নিরুপাধি চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন।[৪] 'রাগাত্মা উহা

১। মহাভারত, ১২।১৯৯।১১৯ ২। মহাভারত, ১২।১৯৯।১২০

৩। "সরাগস্তত্র বসতি গুণাস্তেষাং সমাচরন্"। ঐ, ১২।১৯৯।১২১

৪। ঐ ১২।১৯৯।১২৩-১২৫

(ব্রহ্মনির্ব্বাণ) ইচ্ছা করেন না। তিনি সেই সমস্ত (লোকে) অধিষ্ঠিত থাকেন এবং মনে মনে যাহা ইচ্ছা করেন তাহা প্রাপ্ত হন।[১] আর যদি তিনি ঐসকল লোকের প্রতি যাহাদিগকে নরক বলা হয়, দৃষ্টিপাত না করেন, তবে সর্ব্বত নিস্পৃহ হইয়া তাহাতে সুখে রমণ করেন"।[২] এইস্থানে ভীষ্ম ত্রিবিধ গতির উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। যথা, ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তি এবং সূর্য্যাদিলোকপ্রাপ্তি। "পরমাত্মার স্থানের তুলনায় অপর সমস্ত লোক নিরয় (নরক)"।[৩] শুদ্ধ, সনাতন এবং জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম, যাঁহাকে বিষ্ণুর পরমপদও বলা হয় তাহা ব্রহ্মলোকেরও উর্দ্ধে।[৪]

১। অর্থাৎ তাঁহারা সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হন। শ্রুতিতেও এই কথা আছে, দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্য, উ, ৮।১।৬ ; ৮।২।১০

২। মহাভারত, ১২।১৯৯।১২৬-১২৭

৩। ঐ, ১২।১৯৮।৩-৬, ১০-১১

৪। ঐ, ৩।২৬০।৩৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য

মুক্তজীব সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ করেন

বর্ত্তমান অধ্যায়ে যে ব্রহ্মজ্ঞানীর (মুক্তের) ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করা হইবে তাহা সকলই সগুণব্রহ্ম উপাসকের বুঝিতে হইবে। সগুণব্রহ্মোপাসকগণ বিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ করিয়া (সৃজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্য) ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।[১] শ্রুতিতে দেখা যায় মুক্তজীব সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প হন। কেবল সঙ্কল্পবলেই তিনি আপন কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন। বদ্ধজীবকে আপন অভীষ্ট পূরণার্থ নানাপ্রকার প্রযত্ন করিতে হয়। তাঁহাকে (মুক্তজীবকে) তাহা করিতে হয় না। যথা, প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন, "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি"।[২] 'সমস্ত লোকে তাঁহাদের কামচার হয়। তিনি যদি পিতৃলোককাম (অর্থাৎ পিতৃপুরুষের দর্শনাভিলাষী হন) সঙ্কল্প মাত্রে তাঁহার পিতৃগণ সমুপস্থিত হন'। এই শ্রুতির আধারে আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ"।[৩] 'কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই মুক্তজীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কেননা শ্রুতি এইরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন'। এবম্প্রকার অবন্ধ্যসঙ্কল্প বলিয়া কোন কোন শ্রুতি তাঁহাকে (ব্রহ্মজ্ঞকে) স্বাধীনও বলিয়াছেন। "স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"।[৪] 'তিনি স্বরাট্ হন ; সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার হয়' (অর্থাৎ তিনি যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন)। "সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি"।[৫] 'সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আনয়ন করেন'। সুতরাং তিনি সর্ব্বেশ্বর। আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "অতএব চানন্যাধিপতিঃ"।[৬] 'অতএব তিনি অনন্যাধিপতি' (অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার অধিপতি বা প্রভু নাই)।[৭] অপরের বিধিনিষেধের অধীন চলিতে হইলে সঙ্কল্প অপ্রতিহত থাকে না। তিনি কাহারও অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) সঙ্কল্প অপ্রতিহত।

১। গীতা, ৪।১১
২। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১।৬ ; ৮।২।১
৩। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮
৪। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৫।২
৫। তৈত্তিরীয়, উ, ১।৫.৩
৬। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯
৭। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের অধীন, নতুবা সর্ব্বত্র স্বাধীন।

মুক্তপুরুষের (ব্রহ্মজ্ঞানীর) সঙ্কল্প থাকে বলাতে অবধারিত হয় যে তাঁহার মন থাকে। কারণ মনই সঙ্কল্প করে। তাঁহার শরীরেন্দ্রিয়াদি থাকে কিনা, ঐ প্রশ্ন তখন স্বতঃই মনে জাগে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে নানামত আছে। প্রজাপতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মোক্ষে জীব শরীরভাব ত্যাগ করে, "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদি। তদনন্তর তিনি (প্রজাপতি) উপদেশ করিয়াছেন, "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে"।[১] 'মন তাঁহার দৈবচক্ষু। সেই আত্মা এই মনোরূপ চক্ষুর দ্বারা ব্রহ্মলোকে যে যে কাম্যবিষয় সমূহ আছে সে সমুদয় দর্শন করতঃ আনন্দোপভোগ করেন'। যদি মুক্ত আত্মা মনের ন্যায় শরীর এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা বিহার করিতেন, তবে শ্রুতি অতি স্পষ্টাক্ষরে মনের দ্বারা ('মনসা') একথা বলিতেন না। এই শ্রুতিবলে আচার্য্য বাদরি সিদ্ধান্ত করেন যে, আত্মার মন থাকে, কিন্তু শরীর এবং অপর ইন্দ্রিয় থাকে না।[২]

অপরপক্ষে অন্য শ্রুতিতে আছে যে মোক্ষে মনের ন্যায় শরীর এবং ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে। ভূমাবিদ্যার উপদেশ কালে সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন, "তিনি (মুক্ত পুরুষ) একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, পাঁচপ্রকার হন, সাতপ্রকার হন ও নয়প্রকার হন, পুনশ্চ তিনি একাদশ, একশত একাদশ ও বিংশত্যধিক সহস্র প্রকার বলিয়াও কথিত হন"।[৩] শরীর ভেদ ব্যতীত অনেকবিধ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন, মোক্ষে মুক্তজীবের শরীরেন্দ্রিয়াদির ভাব (অর্থাৎ থাকে)। কারণ, শ্রুতিতে বিকল্পের নির্দ্দেশ আছে।[৪]

সশরীর ও অশরীর উভয় বোধিকা শ্রুতি থাকাতে আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন, মুক্তাত্মা কখন সশরীর, কখন অশরীর, এইরূপ উভয়বিধ বলিয়াই মীমাংসা করা সমীচীন। যখন শরীরধারণের সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি সশরীর হন। এবং যখন অশরীর হওয়ার সঙ্কল্প করেন, তখন অশরীর হন। মুক্ত আত্মা সত্য সঙ্কল্প। সঙ্কল্পও বিচিত্র। সেহেতু আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন, উভয়রূপ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব।[৫] এই মীমাংসার পোষণ করিতে

১। ছান্দোগ্য, উ, ৮।১২।৫
২। "অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্," ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০
৩। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৬।২
৪। "ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ", ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১১
৫। "অতএব শঙ্কল্পাৎ, উভয়বিধং সশরীরমশরীরং চ মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে"। শ্রীভাষ্য, ৪।৪।১২

তিনি দ্বাদশাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। একই যজ্ঞ, যাহার সম্পদ কামনা আছে তাহারও অনুষ্ঠেয় এবং যাহার প্রজাকামনা আছে তাহারও অনুষ্ঠেয়।[১] অর্থাৎ কামনাভেদে একই যাগ উভয়বিধ ফলের সাধক হইয়া থাকে, সেইরূপ একই মুক্ত পুরুষ যখন ইচ্ছা করেন, তখন দেহবান হন এবং যখন ইচ্ছা থাকে না, তখন দেহও থাকে না। যখন অশরীরভাব হয়, তখন মুক্তপুরুষের কাম-ভোগাদি জীবের স্বাপ্নিক কাম ভোগাদির সদৃশ।[২] এবং যখন সশরীরভাব, তখন জাগ্রতপুরুষের ন্যায় তিনি উপভোগ করেন।[৩] মুক্তপুরুষ সঙ্কল্পবলে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন। যুগপৎ সমস্ত শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি ভিন্নবৎ ভোগব্যবহারাদি সম্পন্ন করিতে পারেন। "প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি"।[৪] ভাবার্থ এই যে প্রদীপ যেমন একস্থানে স্থিত হইয়াও তাহার প্রভার দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ মুক্তপুরুষও অনেক শরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। অমুক্ত (বদ্ধ) পুরুষ জ্ঞানকর্ম্মের দ্বারা (প্রারব্ধ কর্ম্ম) সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ দেহান্তরে আত্মাভিমানের উপযুক্ত জ্ঞানব্যাপ্তি সম্ভব হয় না; কিন্তু মুক্তপুরুষের জ্ঞান অসঙ্কুচিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দেহান্তরেও আত্মাভিমানের উপযুক্ত জ্ঞানব্যাপ্তি বা জ্ঞান-প্রসারণ অনুপপন্ন হয় না।[৫] মুক্তপুরুষের কায়ব্যূহ রচনার সহিত প্রদীপের কোন অংশে সাদৃশ্য আছে তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ স্পষ্ট নহেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "যেমন একটি প্রদীপ বিকার শক্তিযোগে অনেক প্রদীপ হয়, তেমন মুক্ত" ইত্যাদি। তাঁহার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। যেমন একই প্রদীপ বিভিন্ন আকারের বহু বর্ত্তিমুখে আলোক প্রদান করিতে পারে, তেমন একই জীব দেহভেদে নানারূপে ব্যবহার করিতে পারেন। জীব বিভু বলিয়াই তাহা সম্ভব। ভাস্করের ব্যাখ্যাও তদ্রূপ। শ্রীকণ্ঠ বলেন, "ঘটাদি দ্বারা আবরিত ঘরের একস্থানে স্থিত প্রদীপ যেমন আবরণ বিনাশে স্বীয় প্রভাদ্বারা সমস্ত গৃহকে ব্যাপ্ত করে, অজ্ঞানাবরণতিরোহিত মুক্তজীবেরও তেমন স্বশক্তিতে বিশ্বব্যাপ্তিরূপ

১। "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ ; দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ"। শ্রীভাষ্য ৪।৪।১২

২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৩

৩। "ভাবে জাগ্রদ্বৎ", ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৪

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫

৫। শ্রীভাষ্য, ৪।৪।১৫

আবেশ হয়"। নিম্বার্ক এবং রামানুজের ব্যাখ্যাও তদ্‌বৎ। প্রদীপের দৃষ্টান্তোল্লেখ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে আচার্য্য বাদরায়ণ অণুবাদী ছিলেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, বিভুবাদীর পক্ষে নানা শরীর নির্ম্মাণে কোন সংশয়ই হইতে পারে না।[১] এই অনুমান সত্য নহে। কারণ একই জীব কি করিয়া যুগপৎ বহু শরীরে বর্ত্তমান থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে সংশয় নহে। কি করিয়া সে উহাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহারাদি করে, অর্থাৎ একজীব কি করিয়া যুগপৎ বহু স্বতন্ত্র জীববৎ হয়, তাহাই প্রশ্ন। "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদি। ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যে (৭।২৬।২) যে একধা, ত্রিধা ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহাতেই উহা অনায়াসে বুঝা যায়। যদি কেবল সংখ্যাবহুত্বের প্রতিই শ্রুতির লক্ষ্য হইত, তবে 'একঃ' 'ত্রিঃ,' 'পঞ্চঃ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। যেমন্ 'স পঞ্চধা ভবতি' ইহার অর্থ জীব পাঁচ প্রকার হয়, অর্থাৎ সংখ্যায় পাঁচটি হইয়া প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করে, সুতরাং সর্ব্বসমেত পাঁচ প্রকারে ব্যবহার করে। "স পঞ্চঃ ভবতি" বলিতে জীব সংখ্যায় পাঁচটি হইয়া প্রতিশরীরে একই প্রকার ব্যবহার করে।

মুক্তজীব সর্ব্বজ্ঞ হন

বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যে সূত্রাত্মা এবং অন্তর্য্যামী আত্মাকে জানে, সে ব্রহ্মবিৎ, সে লোকবিৎ, সে দেববিৎ, সে আত্মবিৎ এবং সে সর্ব্ববিৎ।[২] মহর্ষি উদ্দালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঐ আত্মাদ্বয়কে জানিতেন, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, বলিতে হইবে। শ্রুতিতে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা আছে,[৩] অর্থাৎ কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী (মুক্তজীব) সর্ব্বজ্ঞ হন। অপর উপাসনার দ্বারাও জীব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।[৪] শুনঃশেপ ঋষি বলিয়াছেন, "নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যস্বা। সম্রাজ্যায় সক্রতুঃ"।[৫] অর্থাৎ 'ধৃতব্রত এবং সক্রতু বরুণ প্রজ্ঞাবান প্রজাদিগের সাম্রাজ্য সিদ্ধার্থ তাঁহাদের মধ্যে আগমন করতঃ

১। Ghate, The Vedānta, p. 164
২। বৃহ, উ, ৩।৭।১
৩। মুণ্ডকোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।
৪। ছান্দোগ্য, উ, ২।২১।৪
৫। ঋক্‌সং, ১।২৫।১০

নিশ্চিতরূপে (তাঁহাদের পূর্ব্ব ভাবের) অবসাদ বা উচ্ছেদ করেন', (অর্থাৎ তাঁহাদের বরুণত্ব লাভ হয়)। "অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভিপশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্ত্বা"।[১] 'অতএব প্রজ্ঞাবান সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্মসমূহ অভিজ্ঞাত হন, যাহা কৃত হইয়াছে এবং যাহা কৃত হইবে' অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই তিনি অভিদর্শন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে তত্ত্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ হন।[২] দ্রমিড় ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষেরও ভগবৎ সাযুজ্য লাভ করার জন্য ভগবানের মতন সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) লাভ হয়। (দ্রষ্টব্য শ্রীভাষ্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সংস্করণ)।

মুক্তজীব সর্ব্বব্যাপিত্ব লাভ করেন

জ্ঞানোদয়ে জীব আপনাকে সর্ব্বগত বলিয়া উপলব্ধি করেন। যথা ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, "অহং পরস্তাদহমধস্তাদথদন্তরিক্ষং তদু মে পিতাভূৎ। অহং সূর্য্যমুভয়তো দদর্শাহং দেবানাং পরমং গুহাযৎ"।[৩] 'আমি উপরে (দ্যুলোকে), আমি অধে (ভূলোকে) এবং অন্তরীক্ষ আমার পিতাভূত (অর্থাৎ পিতৃবৎ পালক)। আমি সূর্য্যকে উভয়ত (অর্থাৎ উপর ও নীচ উভয়দিক হইতে) দেখি। দেবতাদিগের যাহা পরম গুহা, আমিই তাহা'। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন যে, "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি"।[৪] অর্থাৎ তিনিই (ভূমাব্রহ্ম) নীচে, তিনিই উপরে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে এবং তিনিই উত্তরে। তিনিই এই সমস্ত (জগৎ)'। তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্যাবগতি হইলে জ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে, "অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি"।[৫] 'আমিই নীচে, আমিই উপরে আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই উত্তরে। আমিই এই সমস্ত (জগৎ)'। মোট কথা, ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ হেতু জীবও আপনাকে সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া উপলব্ধি করেন। জুতি, বাতজুতি প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মুনিগণ সেইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া 'ঋগ্‌বেদে'

১। ঋক্‌সং, ১।২৫।১১

২। "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি"। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৬।২

৩। বাজসং (মাধ্য), ৮।৯; শতব্রা (মাধ্য), ৪।৪।২।১৪; কাণ্বসংহিতা, ১।৮।৬।২ ও কাণ্বশতপথ ব্রাহ্মণ, ৫।৪।৪।১০

৪। ছান্দোগ্য, উ, ৭।২৫।১

৫। ঐ, ৭।২৫।১

বিবৃত হইয়াছে। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' একটা প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে জনৈক ঋষির সর্ব্বব্যাপিত্বানুভূতি বিবৃত আছে। ঋষি বলিয়াছেন, "মদীয়ং মন্যে ভুবনাদি সর্ব্বং ময়ি লোকা ময়ি দিশশ্চতস্রঃ। মদীয়ং মন্যে নিমিষদ্ যদেজতি ময্যাপ ঔষধয়শ্চ সর্ব্বা"।[১] 'আমি অনুভব করিতেছি যে ভুবনাদি সমস্তই আমাতেই (অবস্থিত আছে)। আমাতেই লোকসমূহ; আমাতেই চারিদিক; যাহারা নিমিষোন্মেষ করে এবং যাহারা চলে, তাহারা আমাতেই; এবং আমাতেই সমস্ত জলসমূহ এবং ঔষধি সমূহ'। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে এবম্বিধ জ্ঞানী ব্রহ্মাই। সুতরাং এবম্বিধ জ্ঞানীকেই যজ্ঞে ব্রহ্মা নিযুক্ত করা উচিৎ।[২]

মুক্তের ঐশ্বর্য্য সীমাবদ্ধ

এই পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে কোন কোন শ্রুতিবাক্য অনুসারে প্রতীতি হয় যে মুক্তপুরুষ মহান্ ঐশ্বর্য্যবান হন। তিনি স্বরাট্ হন; কাহারও শাসনের অধীনে তাঁহাকে চলিতে হয় না। তাঁহার সঙ্কল্প অপ্রতিহত। সঙ্কল্প মাত্রেই তিনি সমস্ত লোকে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন এবং নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু আরও অধিক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য সীমাবদ্ধ। জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ"।[৩] 'জগদ্ব্যাপার ব্যতীত (অপর ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য সমূহ মুক্তপুরুষ লাভ করেন)। প্রকরণ হইতে এবং অসন্নিহিত বলিয়াও (তাহা জানা যায়)'। শ্রুতির সৃষ্টি প্রকরণের সর্ব্বত্রই এক বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা। উহার কোথাও মুক্তপুরুষের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং জগদ্ব্যাপারে মুক্তপুরুষের স্বাতন্ত্র্য আছে বলা যায় না। তাহার অপর হেতু এই যে মুক্তপুরুষ জগদ্ব্যাপারের সন্নিহিত নহেন। অতএব তাহাতে তাঁহার যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকিতে পারে না। জগদ্ব্যাপারে মুক্তপুরুষের সান্নিধ্য নাই, আচার্য্য বাদরায়ণের এই উক্তির মর্ম্মার্থ ভাল বুঝা যায় না। তাঁহার

১। জৈম উব্রা, ৩।১৭।৬ (এই প্রকার বচন 'কৈবল্যোপনিষদে' পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য ঐ, ১।১৯)।

২। জৈম উব্রা, ৩।১৭।১০ ('কৈবল্যোপনিষদে'ও আছে যে এবম্বিদ্ জ্ঞানী পরমাত্মস্বরূপ হন। দ্রষ্টব্য ঐ, ২।৫)।

৩। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

ভাষ্যকারগণও তাহা পরিস্কার করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন জীব সৃষ্টির পরভাবী। স্রষ্টা-ব্রহ্মের অন্বেষণ পূর্ব্বক বিশেষ জ্ঞান লাভ করতঃ জীব ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য আদিমান অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ছিল না। অতএব তিনি জগদ্ব্যাপারের সন্নিহিত নহেন। ভাস্করও ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সকল সংশয় বিদূরিত হয় না। প্রথমতঃ আচার্য্য বাদরায়ণের মতে জীব নিত্য। তাহার উৎপত্তি হয় না। সুতরাং সৃষ্টিকালে মুক্তজীব ছিল না, একথা বলা যায় কিনা চিন্তনীয়। যাঁহারা অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় মানেন যে, মোক্ষে জীব ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভ করেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব থাকে না, কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন যে সৃষ্টিকালে মুক্তজীব থাকে না। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে মোক্ষে জীবের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না, তাঁহারা ঐরকম বলিতে পারেন না। আদি কল্পের সৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বর্ত্তমান কল্পে মোক্ষপ্রাপ্ত জীব পরকল্পের সৃষ্টিকালে বর্ত্তমান থাকেন। তারপর সৃষ্টি অনাদি বলিয়া প্রত্যেক সৃষ্টিকালেই ঐশ্বর্য্যবান মুক্তপুরুষ উপস্থিত থাকেন বলিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারিবেন না যে ঐশ্বর্য্যবান মুক্তপুরুষ সৃষ্টির সন্নিহিত নহেন। অন্যথা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে কল্পান্তে মুক্তপুরুষের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। ঐরূপ করিলে অদ্বৈত-বাদীর ক্রমমুক্তিবাদ তাঁহাদের স্বীকৃত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান কল্পের মুক্তজীব বর্ত্তমান জগতের সৃষ্টির সন্নিহিত নহে সত্য। কিন্তু স্থিতি এবং লয়ের সন্নিহিত নহে কি? যদি তাহাও সত্য হয়, তবে বলিতে হয় যে মোক্ষে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গই উঠে না। অথবা বলিতে হয় মুক্তজীব ব্যক্তিত্ববান থাকিলেও জগদ্ব্যাপারের অতীতে চলিয়া যান। ব্রহ্মের যে অংশে জগৎ অবস্থিত, তাহা ছাড়িয়া তিনি অপরাংশে চলিয়া যান। অথবা জগতের সুখদুঃখে নির্ব্বিকার উদাসীনবৎ তাঁহার স্থিতি হয়। যেটাই হউক না কেন, তাহাতে তিনি জগদ্ব্যাপারের অসন্নিহিত থাকেন সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন পুরুষের ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্যের কথা কি? যাঁহারা এখনও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন নাই, সে সকল সাযুজ্যমুক্ত ঐশ্বর্য্যবান মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর আর একপ্রকার বিচার করিয়াছেন। ঐসকল মুক্তপুরুষের মন থাকে এবং সকলের মন একরূপ নহে। সুতরাং কখন কখন এমন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে যে কাহারও মনে স্থিতির সঙ্কল্প, কাহারও মনে সংহারের সঙ্কল্প উদয় হইবে। ঐপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা পরিহারার্থ অনুমান করিতে হয় যে অপর সকলের সঙ্কল্প কোন এক বিশিষ্ট

ব্যক্তির সঙ্কল্পের অনুসারী। ঈশ্বরই সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি। জগদ্ব্যাপার পরিচালনায় তিনিই একমাত্র স্বাধীন। অপর সকলে তাঁহার ইচ্ছাধীন। মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য এইরূপে ঐশীশক্তি হইতে নিম্নে বলিয়া তাঁহাকে জগদ্ব্যাপারের অসন্নিহিত বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ হয়ত এখানে শঙ্কা করিবেন; মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছাধীনই হয়, তবে কেন শ্রুতি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ করিয়াছেন, "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্", 'স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন'। প্রত্যুত্তরে আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, ঐ উক্তিটিকে নির্ব্বিশেষ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না।[১] কারণ, উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি জগতের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অধিকারে পরমেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত দেবতাগণকে প্রাপ্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, "সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসাস্পতিম্। বাকপতিশ্চক্ষুপতিঃ। ক্ষেত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ"।[২] 'সুব এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠালাভ করতঃ তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন; মনের অধিপতিকে প্রাপ্ত হন'; বাক্পতি, চক্ষুপতি, শ্রোত্রপতি এবং বুদ্ধির অধিপতিকে প্রাপ্ত হন'। যিনি সমুদয় মনের অধিপতি, উপাসক সেই পূর্ব্ব সিদ্ধ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন'। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। সুতরাং ব্রহ্মভাবাপন্ন মুক্তজীব সমস্ত মনের দ্বারা মনন করেন, তিনি মনোরাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। বাক্পতি প্রভৃতি সংজ্ঞাকেও ঐ প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ফলকথা, সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হইয়া উপাসক সর্ব্বপ্রাণীর করণ সমূহদ্বারা করণবান হন এবং বিষয় ভোগ করেন। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আনয়ন করেন'। ইহাই স্বারাজ্য প্রাপ্তি শ্রুতির মর্ম্মার্থ। এতদ্বারা লোকসমূহের অনুভব সামর্থ্যপ্রাপ্তি বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদের নিয়মন সামর্থ্য প্রাপ্তির কথা বুঝা যায় না। সুতরাং মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে।

মুক্তজীব ভোগে মাত্র ঈশ্বরের সমান হন

'কেবল ভোগে মাত্র মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের সমান'। তাহার প্রমাণ আছে। সেইকারণেও অবধারিত হয় যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য সসীম।[৩] শ্রুতি বলিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮

২। তৈত্তিরীয়, উ, ১।৬।২

৩। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১

সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি"।[১] 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। হৃদয়াকাশস্থিত (বুদ্ধিরূপ) গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ ব্রহ্মের সহিত (অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাবে) সমস্ত কার্য্য সমূহ ভোগ করেন'। সেই কামসমূহ কি, তাহারা কি বিষয়ক এবং কি প্রকারেই ব্রহ্মের সহিত উপাসক সে সমুদয় ভোগ করেন, ঐ শ্রুতি পরবর্ত্তী বাক্যে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। "সেই যে এবম্বিধ পুরুষ (অর্থাৎ অন্নময়াদি পরম্পরাক্রমে আনন্দময়রূপে ব্রহ্মোপাসক) ইহলোক হইতে প্রস্থানে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন। তদনন্তর যথাক্রমে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রমণ করেন। তিনি কামান্নী এবং কামরূপী হইয়া (অর্থাৎ কামনানুসারে অন্নলাভ এবং রূপপরিগ্রহ করিয়া) এ সমস্ত লোকে বিচরণ করেন" ইত্যাদি।[২]

উপরে মুক্তজীবের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই অনুমোদিত। আচার্য্য শঙ্কর যদিও স্বীকার করিয়াছেন যে সগুণব্রহ্মের উপাসকদের ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, তথাপি তিনি ইহা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই যে, সগুণব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি যথার্থ মুক্তি নহে। তাঁহার মতে নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তি বা লয়ই যথার্থ মুক্তি। শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সহিত মুক্তজীবের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে প্রায় একমত। তবে বৈষ্ণবমতে মুক্তিতেও জীব স্বতন্ত্র হয় না বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদিও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।[৩] আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বলেন মুক্তজীব স্বাধীন, সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদিও শিবের অধীন নহে।[৪] আচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিত 'শিবাদ্বৈতনির্ণয়ে' শ্রীকণ্ঠের মত সমর্থন করিতে যাইয়া পুরাণ হইতে দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র স্বেচ্ছায় নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছিলেন।[৫] তবে বৈষ্ণবেরাও যেরূপ ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে হাত নাই মনে করেন, আচার্য্য শ্রীকণ্ঠও সেইরূপই মনে করিতেন।[৬]

১। তৈত্তিরীয়, উ, ২।২।১

২। ঐ, ৩।১০।৫-৬

৩। "পরমপুরুষায়ত্তং মুক্তৈশ্বর্য্যম্"—শ্রীভাষ্য, ৪।৪।২১

৪। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪।৪।৯

৫। দ্রষ্টব্য 'শিবাদ্বৈতনির্ণয়,' ২'৩৩৩৩, পৃষ্ঠা, ১৪

৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪।৪।১৭

মুক্তজীবের স্রষ্টৃত্ব লাভ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মুক্তজীব স্রষ্টৃত্ব লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে দেখা যায় যে মুক্তজীব স্রষ্টৃত্বও লাভ করিয়া থাকেন। সগুণব্রহ্মের উপাসকদের ভিতর যদি কেহ চাহেন যে, তিনি ভবিষ্যতে কোন কল্পে স্রষ্টা হইবেন কিন্তু একল্পে নহে, তবে তাহা হইতে পারেন। ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিলে জগদ্ব্যাপারে (বর্ত্তমান সৃষ্টিতে) মুক্তজীবের যে হাত নাই বলা হইয়াছে তাহার সহিত বিরোধ থাকে না। এখন দেখা যাউক কোন কোন শ্রুতি মুক্তজীবের স্রষ্টৃত্ব লাভের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

জীব যথোপযুক্ত সাধন বলে ইন্দ্র হইতে পারেন। বেদের ইন্দ্র বিশ্ব-স্রষ্টারই অপর নাম। সুতরাং বলিতে হয় জীব বিশ্বস্রষ্টা হইতে পারে। ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতিবচনও আছে। যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, যিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশ্বকৃৎ, কেননা, তিনি সকলের কর্ত্তা। তিনি (প্রজাপতি, এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ) মনে করিলেন, আমিই এই সৃষ্টি, যেহেতু আমিই এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছি, সেইহেতু আমিই এই সৃষ্টি বা সৃষ্ট জগৎ। যিনি এই প্রকারে জানেন, তিনিও তাঁহার এই সৃষ্টিতে স্রষ্টা হন। তিনি যে নিজের অপেক্ষাও শ্রেয়তর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বয়ং মর্ত্ত্য হইয়াও যে তিনি অমৃত দেবতা-গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু ইহা অতিসৃষ্টি। যিনি এই প্রকার জানেন তিনিও তাঁহার (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টিতে স্রষ্টা হন।[১] স্রষ্টার (প্রজাপতির) সহিত অভেদ বোধ হেতু সাধকেরও স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই সার্ষ্টিতা প্রাপ্তি। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মা বিশ্বসৃজোধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ"।[২] 'বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, ধর্ম্মরাজ, মহত্তত্ত্ব এবং অব্যক্ত (ভবনকে) মনীষিগণ উত্তম সাত্ত্বিকী গতি বলিয়াছেন'। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও আছে যে অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ, "অসতঃ সদ্ যে ততক্ষুঃ" অর্থাৎ 'অসৎ বা অব্যক্ত জগৎ কারণ হইতে সৎ বা ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন'। একবার বলা হইয়াছে যে মুক্তজীবের জগদ্ব্যাপারে হাত নাই, আবার বলা হইল যে মুক্তজীব

১। বৃহ, উ, ১।৪।৫—৬

২। মনুস্মৃতি, ১২।৫০

৩। তৈত্তি আ, ১।১১।১

স্রষ্টা হইতে পারেন। এই উভয়বিধ মতবাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত ইহার উত্তর কি হইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

মুক্তের কোন ঐশ্বর্য্য নাই

ইতিপূর্ব্বে মুক্তের ঐশ্বর্য্যলাভের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সকল মুক্তেরই যে ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে তাহা নহে। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় যে জীবন্মুক্ত বীতহব্যের ঐশ্বর্য্য ছিল না। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। "জীবন্মুক্ত শরীরাণাং কথমাত্মবিদাং বর। শক্তয় নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনাদিকাঃ" ॥[১] 'হে আত্মজ্ঞানি শ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগকে আকাশগমনাদি ব্যাপারে আসক্ত হইতে কেন দেখা যায় না?' ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব জীবন্মুক্ত পুরুষ যে ঐশ্বর্য্যাদির কেন বাঞ্ছা করেন না তাহা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন, "যিনি আত্মার স্বরূপ অবগত নহেন ও মুক্তিলাভ করেন নাই, সে ব্যক্তিও দ্রব্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কাল এই সমুদয়ের শক্তিতে আকাশগমনাদি করিতে সমর্থ হন"।[২] "যাহা কিছু জগদ্‌ভাব তাহা সকলই অবিদ্যাময়; সুতরাং যিনি অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন, কেন আবার তিনি তাহাতে নিমজ্জিত হইবেন"।[৩] "যিনি অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই এই অবিদ্যাকৃত স্বতঃসিদ্ধ শক্তিকে অতিক্রম করেন; কারণ আত্মজ্ঞানীর ঐসকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই নাই"।[৪] "আত্মজ্ঞস্য তু পূর্ণস্য ন্যেচ্ছা সম্ভবতি ক্বচিৎ"।[৫] "যিনি পূর্ণরূপী আত্মজ্ঞানী, তাঁহার কিছুতেই ইচ্ছা সম্ভব হয় না'। "সর্ব্বেচ্ছাজালসংশান্তাবাত্মলাভোদয়োহি যঃ। তদ্বিরুদ্ধা কথং কস্মাদিচ্ছা সঞ্জায়তেঽনঘ" ॥[৬] "সমুদয় ইচ্ছার উপশম হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং আত্মজ্ঞানীর আত্মলাভের বিরোধিনী ইচ্ছা কি করিয়া থাকিতে পারে"? অর্থাৎ থাকে না। বীতহব্যের বাহ্যসিদ্ধির জন্য কিছুই চেষ্টা ছিল না।[৭]

মহাভারতে অনিমাদি ঐশ্বর্য্যকে ভীষ্ম নিরয় (নরক) বলিয়াছেন।[৮] সুতরাং তাঁহার মতে মুক্তপুরুষের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে না।

১। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, উপশম প্রকরণ, ৮৯।৯
২। ঐ, ৮৯।১২ ৩। ঐ, ৮৯।১৪
৪। ঐ, ৮৯।৩০ ৫। ঐ, ৮৯।৩২
৬। ঐ, ৮৯।৩৩ ৭। ঐ, ৮৯।৩৫
৮। মহাভারত, ১২।১৯৭।২—১১

করালজনকও বলিয়াছেন যে, মুক্তি 'অনীশ্বর'।[১] সুতরাং তাঁহার মতেও মুক্তের ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে না। মহাভারতে একথাও বলা হইয়াছে, যিনি যোগৈশ্বর্য্যকে অতিক্রম করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন তিনিই মুক্ত—"যোগৈশ্বর্য্যমতিক্রান্তো যো নিষ্ক্রামতি মুচ্যতে"। (দ্রষ্টব্য মহাভারত, ১২।২৩৫।৪০)। পুরাণাদিতেও ঐশ্বর্য্যের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, বায়ুপুরাণে আছে, "যস্মিনযস্মিংশ্চ সংযুক্তো ভূত ঐশ্বর্য্যলক্ষণে।[২] "তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেনৈব প্রবিনশ্যতি"॥[৩] অর্থাৎ (যোগী) ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যে কোন ভূতে আসক্ত হইলেই তাঁহার বিনাশ হইবে। "ঐশ্বর্য্যাজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্ম চোচ্যতে"।[৪] কারণ 'ঐশ্বর্য্য হইতে আসক্তি জন্মে; ব্রহ্ম আসক্তিহীন'। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি। তাই নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিতে কোন কিছু ঐশ্বর্য্যের কামনা বা আসক্তি থাকিতে পারে না।

১। "মোক্ষকামা বয়ং চাপি কাঙ্ক্ষামো যদনাময়ম্। অদেহমজরং নিত্যমতীন্দ্রিয়মনীশ্বরম্", মহাভারত, ১২।৩০৫।১০

২। বায়ুপুরাণ, ১২।২৮

৩। ঐ , ১২।২৯ ৪। ঐ , ১২।৩২

ষোড়শ অধ্যায়

মুক্তের প্রারব্ধ ভোগ

কর্ম্ম ত্রিবিধ ; তন্মধ্যে বর্ত্তমান দেহারম্ভক কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। 'কর্ম্ম ত্রিবিধ, সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ। ভাবিদেহারম্ভক কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম, বর্ত্তমান দেহনিবর্ত্ত্য কর্ম্মকে ক্রিয়মাণ এবং বর্ত্তমান দেহারম্ভক কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে'—"কর্ম্মত্রিবিধং সঞ্চিতক্রিয়মাণপ্রারব্ধভেদাৎ ; তন্মধ্যে ভাবিদেহারম্ভকং সঞ্চিতং, তথা বর্ত্তমানদেহনিবর্ত্ত্যং ক্রিয়মাণং ; প্রারব্ধন্তু বর্ত্তমানদেহারম্ভকং"। (দ্রষ্টব্য অপরোক্ষানুভূতি, ৯২ শ্লোকের শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্য-মুনি কৃত দীপিকা)। প্রারব্ধকর্ম্ম আবার বহুপ্রকার বলা হয়। 'পঞ্চদশী' নামক বেদান্তগ্রন্থে তিন প্রকার প্রারব্ধকর্ম্ম বলা হইয়াছে, স্বেচ্ছা প্রারব্ধ, পরেচ্ছা প্রারব্ধ ও অনিচ্ছা প্রারব্ধ। 'অনুভূতিপ্রকাশ' গ্রন্থে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও সুপ্ত এই চতুর্ব্বিধ প্রারব্ধ বলা হইয়াছে। তীব্রাদি প্রারব্ধের প্রত্যেকটি, স্বেচ্ছা, পরেচ্ছা ও অনিচ্ছা ভেদে তিন প্রকার বলা হয়। সুতরাং প্রারব্ধকর্ম্ম দ্বাদশ প্রকার স্বীকৃত হইল। ব্রহ্মজ্ঞানলাভোত্তর সমস্ত কর্ম্মেরই কি বিনাশ হয়? কি কোন কর্ম্ম ভোগান্তে ক্ষয়ের জন্য (ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও) থাকিয়া যায়? ইহাই এই অধ্যায়ে বিচার্য্য। কর্ম্মকে কোন কোন শাস্ত্রকার পাপপুণ্য সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে উত্তর ও পূর্ব্ব পাপের বিনাশ হয়। "তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"।[১] 'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলে পূর্ব্বকৃত পাপের বিনাশ এবং উত্তরকালীন কৃত পাপের অশ্লেষ বা অস্পর্শ হয়। যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে'। এই সূত্রে লক্ষিত শ্রুতি নিম্নপ্রকার, "যথা পুষ্কর পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে"।[২] 'যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি এই তত্ত্ববিৎ পুরুষেও পাপের সংশ্লেষ হয় না'। এতদ্বারা জানা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর জ্ঞানী কোন পাপ কর্ম্ম করিয়া ফেলিলেও তাহার দুঃখফল তাঁহাকে ভুগিতে হইবে না।[৩] "তস্যৈবাত্মা পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন"। 'সেই উপাসকের আত্মা পদনীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পাপকর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না'। এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জ্ঞানোত্তরকালীন পাপের অসংস্পর্শ বুঝা যায়। "তদ্ যথেষীকতূলামগ্নৌ

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩ ২। ছান্দোগ্য, উ, ৪।১৪।৩ ৩। গীতা, ১৮।১৭

প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে"।[১] 'ইষীকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয়, তেমনি এই ব্রহ্মজ্ঞেরও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়'। আচার্য্য বাদরায়ণ আরও বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ এবং বিনাশ হয়। "ইতরস্যাপ্যেব-মসংশ্লেষঃ পাতে তু"।[২] পুণ্যেরও এইরূপ (পাপের অশ্লেষ ও বিনাশের ন্যায়) অশ্লেষ এবং বিনাশ হয়। কারণ এই পুণ্যও সুখভোগের উৎপাদক। সুখভোগের উৎপাদক বিধায় পুণ্যও মোক্ষের প্রতিবন্ধক। তাই পুণ্যক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষ লাভ হয় না ; সেইজন্য পুণ্যেরও বিনাশ স্বীকার্য্য। শ্রুতিতে আছে, সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি"।[৩] 'ইনি (আত্মজ্ঞানী) পাপপুণ্য এই উভয়কেই অতিক্রম করেন'। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিনদৃষ্টে পরাবরে"। 'সে পরাবর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে ইহার (জীবের) কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়'। পর পর উপর্য্যুক্ত দুই সূত্রে নির্দ্ধারিত হইল যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্ম্মের বিনাশ বলিতে প্রারব্ধ ব্যতীত সমস্ত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, কারণ প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, তাহা শাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ"।[৪] এই সূত্রের ভাবার্থ এই যে বর্ত্তমান শরীর লাভের "পূর্ব্বকৃত যে সকল কর্ম্ম এতৎ শরীরে সঞ্চিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান হইলে দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ সে সকল আর সুখদুঃখাদি সংসারফল প্রসব করে না। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম (প্রারব্ধকর্ম্ম) এতজ্জন্ম জন্মাইয়াছে, এতজ্জন্মযোগ্য ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সকল কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানে দগ্ধ হয় না"।[৫] আরব্ধ কর্ম্ম বা প্রারব্ধ কর্ম্ম কিরূপ ভাবে ক্ষয় হয় তাহাই মহর্ষি বাদরায়ণ নিম্ন উদ্ধৃত সূত্রে বলিতেছেন, "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে"।[৬] 'ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করেন'। মূল কথা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে অনুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মরাশি যে সমস্ত তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সঞ্চিতমাত্র রহিয়াছে, সে অনন্ত সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ব্রহ্মজ্ঞানের

১। ছান্দোগ্য, উ, ৫।২৪।৩ ২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৪

৩। বৃহ, উ, ৪।৪।২৩ ; আর দেখুন, "তৎ সুকৃত দুষ্কৃত ধূনুতে"। কৌষী, উ, ১।৪

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫

৫। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫ র কালীবরবেদান্তবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ।

৬। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৯

সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে গুলি জ্ঞানোদয়ের উত্তর কালে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের ফলাফল ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের যেগুলি ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেগুলির ফল ব্রহ্মজ্ঞানীকে ভোগ করিতেই হইবে। একমাত্র ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধের নাশ হয়। প্রারব্ধ নাশে দেহপাত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তি লাভ করেন। তাহাই আচার্য্য বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত।

ইহা প্রণিধানযোগ্য যে ভগবান্ বাদরায়ণের মতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবের শরীরপাত হয় না। দেহারম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগের জন্য দেহ কিছুকাল অবস্থিত থাকে, "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্"। (ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩২)। 'যাঁহারা আধিকারিক পুরুষ তাঁহাদের প্রারব্ধভোগ শেষ হইতে কিছুকাল (দুই চারি জন্মও) লাগিতে পারে'। এই শরীরপাতের সাথে সাথেই তাঁহারা কৈবল্য প্রাপ্ত হন না। (দ্রষ্টব্য ঐ, শঙ্করভাষ্য)। কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে মোক্ষের জন্য জ্ঞানীকে আর কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না। "তস্য তাবদেবচিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে"। এই ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্ববাদীমতে "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে" এই সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ণ ঐ শ্রুতি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে, "ভূয়োশ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ"।[১] 'পরিশেষে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়'। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে, দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি (অশেষ কার্য্যের সন্তানের (দুঃখের) কারণ রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে) নিবৃত্ত হয়, আর উৎপন্ন হয় না। তবে এই কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে জ্ঞানী প্রারব্ধ ব্যতীত আর কোন নূতন কর্ম্মের (ক্রিয়মাণ প্রভৃতি) দ্বারা আবদ্ধ হন না। 'কৌষীতকি' উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কর্ম্মণা লোকো মীয়তে (হীয়তে) ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া"।[২] অর্থাৎ 'যিনি আমাকে (আত্মাকে) জানেন, তিনি কোন কর্ম্মের দ্বারা সেই অবস্থা হইতে চ্যুত হন না, মাতৃবধের দ্বারাও নহে, পিতৃবধের দ্বারাও নহে, চৌর্য্যের দ্বারাও নহে এবং ভ্রূণহত্যার দ্বারাও নহে'। জ্ঞানীরও যে প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় আচার্য্যশঙ্কর তাহা তাঁহার ব্রহ্মসুত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য ও পরবর্ত্তী 'বাক্যবৃত্তি' এবং 'বিবেকচূড়ামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিদ্যার প্রভাবে সঞ্চিত পাপপুণ্যের ক্ষয় হয়, আর আরব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগদ্বারা

১। শ্বেতাশ্বতর, উ, ১।১০

২। কৌষী, উ, ৩।১

নিঃশেষিত হইলে জ্ঞানী ব্রহ্মসম্পন্ন হন"।[১] তিনি আরও বলেন, "যে কর্ম্মের দ্বারা এই শরীর আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তফলের উপভোগ দ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে"।[২] "প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন জীবন্মুক্ত যদা ভবেৎ। কঞ্চিৎকালমথারব্ধ কর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে॥ নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈষ্ণবং পরমং পদম্। পুনরাবৃত্তি-রহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে"॥[৩] 'প্রারব্ধকর্ম্মের বেগবশতঃ সাধক যখন জীবন্মুক্ত হন, তখন আরব্ধকর্ম্মফলভোগের জন্য তিনি কিছুক্ষণ শরীরে অবস্থান করেন। পরে (ঐ কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) তিনি আনন্দতারতম্য রহিত, পুনরাবৃত্তি শূন্য কৈবল্যস্বরূপ পরম বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন'। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগের কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, "জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি। অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবানবৎ"॥ (দ্রষ্টব্য বিবেকচূড়ামণি, ৪৫৩)। 'জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে আরব্ধকর্ম্ম ফল প্রদান না করিয়া জ্ঞানলাভ হইলেও নষ্ট হয় না, যেমন লক্ষ্য উদ্দেশে ত্যক্ত বান লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না'। তিনি আরও বলিয়াছেন, "ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্ম্মুক্ত বানঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ। ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্"॥ (দ্রষ্টব্য ঐ, ৪৫৪)। 'ব্যাঘ্র বুদ্ধিতে নির্ম্মুক্ত শর পশ্চাৎ গো জ্ঞান জন্মিলে যেমন নিবৃত্ত না হইয়া বেগে লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ জ্ঞানোদয় হইলেও নিবৃত্ত না হইয়া নিজ ফল প্রদান করে'। এই প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়েই বিদেহমুক্তি লাভ হয়— "প্রারব্ধক্ষয়াদ্বিদেহমুক্তিঃ"। (মুক্তিকোপনিষৎ, ২।২)।

আচার্য্য রামানুজ বলেন, "অপর যে সমস্ত পাপপুণ্যের ফলভোগ আরব্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত আরব্ধফলক পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় বা সমাপ্ত করিয়া, তাহার ফলভোগ সমাপ্ত হইলে পর বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মসম্পন্ন হন। আর সেই কর্ম্মফলাদি অনেক শরীরে ভোগযোগ্য হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত শরীর পাতের পর ব্রহ্মসম্পন্ন হয়; কারণ, প্রারব্ধফলক পুণ্য ও পাপকর্ম্ম একমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয় করিতে হয়"। (দ্রষ্টব্য শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কৃত বঙ্গানুবাদ, শ্রীভাষ্য, ৪।১।১৯)।

আচার্য্য নিম্বার্কের অভিমত এই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের, যাহা যাহা এখনও ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই অর্থাৎ

১। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৯র শঙ্করভাষ্য।

২। "যেন কর্ম্মণা শরীরং আরব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে"। গীতা, ৪।৩৭র শঙ্করভাষ্য।

৩। বাক্যবৃত্তি, ৫২—৫৩ শ্লোক।

ইহজন্ম কৃত সঞ্চিত কর্ম্ম এবং অপরাপর জন্ম কৃত সঞ্চিত কর্ম্ম, যাহা এই জন্মে ফলোন্মুখী হয় নাই, তাহা সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে সকল কর্ম্ম ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ভোগের দ্বারাই ক্ষয় করিতে হইবে। (দ্রষ্টব্য দশশ্লোকী, ৬ এবং নিম্বার্কভাষ্য, ৪।১।১৯)। 'অতএব জ্ঞানীকেও নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে প্রারব্ধ ভোগের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। (দ্রষ্টব্য নিম্বার্কভাষ্য, ৪।১।১৫)। আচার্য্য মধ্ব জ্ঞানীকেও প্রারব্ধ ভোগ করিতে হইবে সেই কথাই বলিয়াছেন। "আরব্ধপুণ্যপাপে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্মসম্পদ্যতে"।[১] জ্ঞানী 'ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন'। 'সূতসংহিতায়' উক্ত হইয়াছে, "যস্মিন্ দেহে দৃঢ় জ্ঞানমপরোক্ষ বিজায়তে। তদ্দেহপাত পর্য্যন্তমেব সংসারদর্শনম্"॥[২] 'যে দেহে দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়, সেই দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানীর সংসারদর্শন (অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে)'। 'ভাগবতে' ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে বলিয়াছেন যে, "প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ অনিবার্য্য, এমনকি মুক্ত পুরুষকেও প্রারব্ধের ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিতে হয়। তবে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, সুতরাং ঐ সময়ের কৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না"।[৩]

সাংখ্যশাস্ত্রে ও ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগ হয় তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। "চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ"। (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৩।৮০)। অর্থাৎ যেমন কুম্ভকারের কর্ম্ম নিবৃত্তি হইলেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য বেগবশতঃ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত স্বয়ংই চক্র ভ্রমণ করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরে অনারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য কিছুকাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ হয়— "সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ। তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্র-ভ্রমিবদ্ ধৃত শরীরঃ"॥ (সাংখ্যকারিকা, ৬৭)। ন্যায়দর্শনের আচার্য্যগণও প্রারব্ধভোগ জ্ঞানীকেও করিতে হয় সেই মতই পোষণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'পর' নিঃশ্রেয়স ততক্ষণ লাভ হয় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উপভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়—"পরং নিঃশ্রেয়সং ন তাবদ্ ভবতি যাবৎ উপভোগাদুপাত্তকর্ম্মাশয়প্রচয়ো ন ক্ষীয়তে"। (তাৎপর্য্যটীকা, পৃষ্ঠা, ৮১ দ্রষ্টব্য)।

১। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্, ৪।১।১৯

২। সূতসংহিতা, ৩।৭।৭৬

৩। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৫।১।১৬

এই প্রসঙ্গে ইহা বলা সঙ্গত মনে হইতেছে যে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের পাপপুণ্য জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না তাহা সর্ব্বত্রই স্বীকার করা হইয়াছে। আমরা এই সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্রাদির মত উদ্ধৃত করিতেছি। 'সূতসংহিতা'য় বলা হইয়াছে, 'যে একত্ব উপলব্ধি করিয়াছে সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও, শত ব্রহ্মহত্যা করিয়া থাকিলেও তাহার ফলের দ্বারা লিপ্ত হয় না'।[১] আর বলা হইয়াছে, "হয়মেধশতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাত লক্ষাণি। পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্ন চ পাপৈ স্পৃশ্যতে বিমলঃ" ॥[২] অর্থাৎ 'পরমার্থবিৎ যদি সহস্র সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর যদি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্ম হত্যাও করেন, তথাপি তাঁহাকে পুণ্য বা পাপ কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ তিনি বিমল (অবিদ্যাশূন্য)'। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের পাপপুণ্য যে জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না তাহা 'গীতা'শাস্ত্রেও স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে,—"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" ॥[৩] 'বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা যোগযুক্ত (ব্যক্তি) কর্ম্ম করিতে থাকিলেও (অর্থাৎ এমন কি যদি কর্ম্ম করিতে থাকেনও তথাপি তৎফল দ্বারা) লিপ্ত হন না'। এইখানে উল্লিখিত 'যোগযুক্ত' ব্যক্তি কর্ম্মযোগীই। প্রকরণ হইতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায়। তিনি 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা', সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মতা উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বা সম্যগ্‌দর্শী।[৪] দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জিত না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় না। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়মাণ ('কুর্ব্বন্') কর্ম্মের ফল তাঁহাতে লাগে না, সুতরাং তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। উহাতে 'কুর্ব্বন্' শব্দের সঙ্গে 'অপি' শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে অধিকন্তু ইহাও বুঝা যায় যে, কর্ম্ম যে তখনও ত্যাগীকে অবশ্যই করিতে হইবে (তখনও যে উঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য থাকে) তাহা নহে। কর্ম্ম যদি তখনও উঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য থাকিত, সকল কর্ম্মযোগীই যদি ব্রহ্মজ্ঞানোদয়োত্তরও কর্ম্ম করিতে থাকিতেন কিম্বা উঁহাদিগকে করিতেই হইত, তবে 'অপি' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। অবশ্য কর্ত্তব্যতা না থাকিলেও যদি কোন না কোন হেতু জন্য পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ বা যদৃচ্ছা ক্রমে কোন ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্মযোগী

১। "অশ্বমেধসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাশতানি চ। কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে যদ্যেকত্বং প্রপশ্যতি" ॥ সূতসংহিতা

২। শেষনাগ, পরমার্থসার, শ্লোক ৭৭

৩। গীতা, ৫।৭

৪। ঐ, ৪।৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

কোন কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, অথবা তাঁহার দ্বারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম হইয়া যায়, তথাপি তাঁহাকে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না। ইহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের মর্ম্মার্থ। "যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে" ॥[১] 'যাঁহার (মনে) এই ভাব নাই যে 'আমি কর্ত্তা' এবং যাঁহার বুদ্ধি (কোন বিষয়ে) লিপ্ত হয় না, তিনি এমন কি যদি এই সমস্ত লোককে হনন করেনও তথাপি (প্রকৃত পক্ষে) হনন করেন না এবং (সেই হেতু ঐ কর্ম্মদ্বারা) বন্ধনগ্রস্ত হন না।' 'হত্বাঽপি' বাক্যে এই বুঝিতে হইবে না যে তিনি অথবা ঐ প্রকার প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণতঃ হনন করিয়া থাকেন, কিম্বা হনন তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। উহাতে হত্যার বিধান নাই। উহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি কখনও যদি হত্যা করিয়াও ফেলেন অথবা তাঁহার দ্বারা যদি কখনও অবুদ্ধিপূর্ব্বক হত্যা হইয়াও যায়, তবে উহার দোষ তাঁহার লাগিবে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের 'কুর্ব্বন্নপি' বাক্যের তাৎপর্য্যও ঠিক সেই প্রকারই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'গীতা'র আরও কতিপয় স্থলে ঐ প্রকার অর্থেই 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।[২]

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও জ্ঞানীর প্রারব্ধ নষ্ট হয় না, এই কথাই বলা হইল। আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্যে এবং অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থে ঐ কথাই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কোন কোন প্রকরণ গ্রন্থে ঐ মত তিনি স্বীকার করেন নাই তাহাও দেখা যায়। "তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে। দেহাদীনামসত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নবিবোধিতঃ" ॥[৩] এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, 'তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট দেহাদিকে অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হওয়ায় তাহাদের কারণ প্রারব্ধও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং (জ্ঞানীর দৃষ্টিতে) প্রারব্ধ নাই, যেরূপ স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হওয়ায় তাহা স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির কাছে নাই'। মৃত্তিকা যেমন কটকরকাদির উপাদান, সেইরূপ অজ্ঞান এই জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান, এই কথাই শ্রুত্যাদিতে উক্ত হইয়াছে। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। (শ্বেতাশ্ব, উ, ৪।১০)। (জ্ঞানীর) অজ্ঞান নষ্ট হওয়াতে জীব, জগৎ ইত্যাদি কি করিয়া থাকে?[৪] 'যেমন কেহ ভ্রান্তি বশতঃ রজ্জুকে

১। গীতা, ১৮।১৭
২। ঐ, ৪।২০, ২২; ৬।৩১
৩। অপরোক্ষানুভূতি, ৯১
৪। অপরোক্ষানুভূতি, ৯৪

সর্পরূপে গ্রহণ করেন, সেইরূপ অজ্ঞানী সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া জগৎ দর্শন করে'।[১] ভ্রম দুর হইলে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই উপলব্ধি হয়, সেইরূপ অজ্ঞান দূর হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই বলিয়া উপলব্ধি হইবে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, 'রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, তখন আর সর্পখণ্ড থাকে না, সেইরূপ জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, এই জগৎ প্রপঞ্চও থাকে না। দেহও প্রপঞ্চ, তাই দেহকে আশ্রয় করিয়া যে প্রারব্ধের স্থিতি তাহা কি করিয়া থাকিতে পারে'?[২] তথাপি যে জ্ঞানী-দিগেরও প্রারব্ধ আছে বলা হয়, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "অজ্ঞানিজন-বোধার্থং প্রারব্ধং বক্তিবৈ শ্রুতি"।[৩] 'অজ্ঞানী জনদের বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি প্রারব্ধ স্বীকার করিয়াছেন'। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, জ্ঞানীর দেহনির্ব্বাহার্থ জগৎ ব্যবহার কি করিয়া সম্ভব? তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্যই বলা হয় যে জ্ঞানীরও প্রারব্ধ বশে দেহ ব্যবহার সম্ভবপর হয়। যথার্থরূপে জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই না থাকায় প্রারব্ধ অসিদ্ধ হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার 'বিবেকচূড়ামণি' নামক গ্রন্থে প্রথমে প্রারব্ধ স্বীকার করিয়া পরে জ্ঞানীর যে প্রারব্ধ ভোগ সম্ভব নহে তাহাই বলিয়াছেন।[৪] "তদাত্মনা-তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধ কল্পনা"॥ (ঐ ১।৫৫)। "সমাধাতু বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ"॥ (২।৫৯, অধ্যাত্মোপনিষৎ)।

বৈষ্ণব আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ কোন কোন জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগ হয় স্বীকার করিলেও, পরম আতুর শরণাগত ভক্ত বিশেষের বেলায় ভোগ ব্যতীতই শ্রীভগবানের কৃপায় সমস্ত প্রারব্ধ ক্ষয় হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্রহ্মৈকরতাণাং পরমাতুরাণাং কেষাঞ্চিন্নিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগমুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্ব্বিশ্লেষঃ স্যাৎ"। (গোবিন্দভাষ্য)। পরে বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষোক্ত সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, 'শ্রীভগবানের পক্ষপাতদোষ না থাকিলেও আতুর ভক্ত বিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে এবং উহা তাঁহার দোষ নহে, বরঞ্চ গুণ'। আরও বলিয়াছেন যে, 'শ্রীভগবান্ পরম আতুর ভক্তের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহকে ভক্তের আত্মীয়বর্গকে প্রদান করিয়া ভক্তকে নিজের কাছে টানিয়া লন'।[৫]

১। অপরোক্ষানুভূতি, ৯৫ ২। ঐ, ৯৬ ৩। ঐ, ৯৭

৪। বিবেকচূড়ামণি, ৪৫৫,৪৬০,৪৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫। গোবিন্দ ভাষ্য, ৪।১।১৭

ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয় ইহা তন্ত্রশাস্ত্রেরও মত।[১] কিন্তু আবার ঐ শাস্ত্রেই একথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোগ ব্যতীতই প্রারব্ধ ক্ষয় হয়। "শক্তিপাত তীব্র, মধ্য ও মন্দভেদে স্থূলতঃ তিন প্রকার। ইহার প্রত্যেকটিতে তীব্রাদি অবান্তর ভেদ আছে। সুতরাং মোটের উপর ইহা নয় প্রকার। এই প্রকার বিভিন্ন মাত্রায় শক্তিপাতের ফলও বিভিন্ন। তীব্র, মধ্য-তীব্র ও মন্দ-তীব্র ভেদে তীব্র শক্তিপাত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তীব্র-তীব্র শক্তিপাতের ফলে আপনা আপনি দেহপাত হইয়াই মোক্ষ লাভ হয়। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়ের অপেক্ষা থাকে না। এইপ্রকার শক্তিপাত প্রারব্ধকেও নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু তীব্র-তীব্রেরও প্রকার ভেদ আছে। ইহার মধ্যে যেটি অতি তীব্র, তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ দেহ ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যুৎপাত হইলে যেমন দেহ পাতের বিলম্ব হয় না, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ হয়। সর্ব্বত্রই প্রারব্ধের খণ্ডন হয়। তবে কোনস্থলে তৎক্ষণাৎ দেহপাত হয়, কোনস্থলে অল্পাধিক বিলম্বে হয়, তাহার কারণ পতিত শক্তির তারতম্য। মধ্যতীব্র শক্তিপাতের ফলে দেহের নিবৃত্তি হয় না। শুধু যাবতীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। প্রচলিত বেদান্তের পরিভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, তীব্র-তীব্র শক্তিপাতের ফলে প্রারব্ধের সহিত সকল কর্ম্মই দগ্ধ হয় ও মধ্য-তীব্র শক্তিপাতে প্রারব্ধ ব্যতীত অবশিষ্ট কর্ম্ম দগ্ধ হয়"। (দ্রষ্টব্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজী লিখিত 'উত্তরায়' প্রবন্ধ—'শক্তিপাত রহস্য,' সন ১৩৪৯ পৌষ ; পৃষ্ঠা ২০৯)। তন্ত্রশাস্ত্রে একথাও বলা হইয়াছে যে নির্ব্বাণ-দীক্ষার দ্বারা ভোগ ব্যতীতও প্রারব্ধ ক্ষয় হয়।[২] "সদ্যোনির্ব্বাণদা সেয়ং নির্বীজা যেতি ভণ্যতে। অতীতানাগতারব্ধ পাশত্রয়বিয়োজিকা" ॥ (শ্রীতন্ত্রালোক, ১৫।৩২)। অর্থাৎ 'নির্ব্বাণদীক্ষায় অতীত, অনাগত ও আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয়'। তাই প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় বলা যাইতে পারে। নির্ব্বাণদীক্ষার দ্বারা প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না এই শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ায় বলা হইয়াছে যে, যিনি প্রারব্ধ ভোগান্তে শুদ্ধ হইয়াছেন তিনি নির্ব্বাণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগ করতঃ মুক্ত হন বা পরম পদ লাভ করেন।[৩]

১। তত্ত্ব প্রকাশিকা, ৭২

২। রাজা ভোজদেব কৃত 'তত্ত্ব প্রকাশিকা'র ৭২ শ্লোকের উপর অঘোরশিবাচার্য্যের বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

৩। "দীক্ষাবসানে শুদ্ধস্য দেহত্যাগে পরং পদম্"। তন্ত্রালোক ১৫।৩৩

বিদ্যারণ্য মুনি 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেও যোগাভ্যাসের শক্তি অধিক স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যোগাভ্যাসের বলেই উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি যোগীরা প্রারব্ধ ভোগ না করিয়াও স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ' হইতে বশিষ্ঠদেব যে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "এই সংসারে সকলেই সম্যক্ অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মরূপ পুরুষকারের দ্বারা সমস্তই লাভ করিতে পারে", এই বচন উদ্ধৃত করিয়া উপর্য্যুক্ত মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আবার পরে বিরুদ্ধ মতও পোষণ করিয়াছেন দেখা যায়। "অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ যদি। তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ"॥ 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে'র এই বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি আবার এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। তাঁহার দ্বিতীয় মতটিই বহু শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত মত, আর প্রথম মতটি, "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে"; "অবশ্যমেবভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মশুভাশুভম্" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের সহিত অসামঞ্জস্য বলিয়া বোধ হয়। যদিও শ্রুতিতে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুণ্ডক শ্রুতি) ও "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" (গীতা) এই বচনে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মেরই নাশ হয় বুঝা যায়; কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষে" ইত্যাদি বচনে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন অপর সকল কর্ম্মই জ্ঞানের দ্বারা নাশ হয় বুঝিতে হইবে। তাই জ্ঞানলাভের পরেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল জ্ঞানীকে ভোগ করিতে হয় ইহাই বহু শাস্ত্র সম্মত প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

মুক্তের ব্যবহার বা কর্ম্ম

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর কৃতকর্ম্মের ভালমন্দ ফল ব্রহ্মজ্ঞানীতে (মুক্তে) সংশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাঁহাকে ভোগ করিতেও হয় না। তাহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যদি না করিতেন তবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল ব্রহ্মজ্ঞানীতে লাগা না লাগার কথাও উঠিত না। এখন প্রশ্ন, সকল ব্রহ্মজ্ঞানীই (মুক্তই) কি কর্ম্ম করেন ? কিম্বা সকলেরই করা উচিৎ ? এখানে ভিক্ষাচর্য্যাদি জীবনধারণ উপযোগী কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে না। তদ্‌ব্যতীত অপর বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম করেন, কি করেন না এবং করা উচিত, কি উচিৎ নহে, তাহাই বিচার্য্য। এই বিষয়ে শাস্ত্রাদিতে দুইপ্রকার মত পাওয়া যায়।

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে আছে ব্রহ্মজ্ঞানী (মুক্ত) কর্ম্ম করেন না। যথা, "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"।[১] 'ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে জানিয়া পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া (অর্থাৎ এষণা ত্যাগ করিয়া) ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন'। পুত্রৈষণা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম করেন না। যাজ্ঞবল্ক্যাদি জ্ঞানী ছিলেন অথচ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। 'ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিলেন'।[২] "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি"।[৩] 'আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব ? আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মাই এই লোক'। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, এই শ্রুতি আত্মজ্ঞের কর্ত্তব্যাভাব দেখাইয়াছেন।[৪] তিনি বলেন, "তস্মাদ্‌ ব্রহ্মবিদো নাস্তি কর্ম্ম কর্ম্মসাধনং বা"।[৫] 'ব্রহ্মবিদগণের পক্ষে কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনের সম্ভাবনা নাই'। তিনি আরও বলেন, "নতু পরমার্থতঃ আত্মব্যতিরেকেনাস্তি

১। বৃহ, উ, ৩।৫।১

২। "এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার"। ঐ, ৪।৫।১৫

৩। ঐ, ৪।৪।২২

৪। "ইত্যাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাভাবং দর্শয়তি"। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।২ র শঙ্করভাষ্য।

৫। বৃহ, উ, ৩।৫।১ (১২) র শঙ্করভাষ্য।

কিঞ্চিৎ; তস্মাৎ পরমার্থাত্মৈকত্বপ্রত্যয়ে ক্রিয়াকারকফলপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ; অতো বিরোধাৎ ব্রহ্মবিদঃ ক্রিয়াণাং তৎসাধনানাঞ্চাত্যন্তমেব নিবৃত্তিঃ"।[১] অর্থাৎ পরমার্থ দৃষ্টিতে আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুরই সত্তা নাই। সুতরাং পরমার্থজ্ঞান উপস্থিত হইলে পর ক্রিয়া কারক ও ফল ব্যবহারও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বিরুদ্ধ স্বভাব বলিয়াই ব্রহ্মবিদের (মুক্তের) সম্বন্ধে ক্রিয়া ও ক্রিয়া-সাধনের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়'।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও আর কোন কোন আধুনিক লেখক বলিয়াছেন যে, 'গীতা'র সিদ্ধান্ত মতে সমস্ত কর্ম্মযোগীকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও আমরণ সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ অবশ্যই করিতে হইবে।[২] কিন্তু আমরা ঐ সিদ্ধান্ত সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, কারণ 'গীতা'য় স্পষ্টবাক্যে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য থাকে না। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥ "নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ"॥[৩] 'পরন্তু যে মনুষ্য কেবল আত্মরতি (অর্থাৎ কেবল আত্মাতেই রতি বা প্রেম আছে, অপর বিষয়ে নহে),[৪] আত্মতৃপ্ত (অর্থাৎ আত্মাতেই তৃপ্ত, সুতরাং অপর বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা নাই),[৫] এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার (কোন কর্ত্তব্য) কার্য্য থাকে না'। ইহসংসারে কর্ম্মকরণে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। (আর) না করিলেও কোন অর্থ নাই (অর্থাৎ প্রত্যবায় হয় না)। সর্ব্বভূতে তাঁহার কোন অর্থব্যপাশ্রয় নাই'। "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্"॥[৬]

১। বৃহ, উ, ২।৪।৩৪ (৪) র শঙ্করভাষ্য।

২। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি বলেন। S. N. Das Gupta in the Legacy of India, edited by G.T.Garratt, Oxford, 1947, p 112.

৩। গীতা, ৩।১৭-১৮; (ভাগবতের দেবহুতি ও ঋষভদেব সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন)।

৪। পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, "সংগুপ্তান্যাত্মনো দ্বারাণ্যাপিধায় বিচিন্তয়ন্। যো হ্যাস্তে ব্রহ্মণঃ শিষ্ট স আত্মরতিরুচ্যতে"॥ মহাভারত, ১২।২৫১।১৯ অর্থাৎ 'যে সমস্ত বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাবৃত্ত করতঃ অন্তর্মুখীন করিয়া একমাত্র আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, সে আত্মরতি'।

৫। ব্যাস বলেন, "তানি সর্ব্বানি সন্ধায় মনঃ ষষ্ঠানি মেধয়া। আত্মতৃপ্ত ইবাসীত বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্"। মহাভারত, ১২।১৫০ (৫)

৬। গীতা, ৫।১৩

'জিতেন্দ্রিয় দেহী (দেহবান ব্যক্তি, পুরুষ) সমস্ত কর্ম্মসমূহকে মন দ্বারা সন্ন্যাস (বা পরিত্যাগ) করিয়া, (কোন কর্ম্ম স্বয়ং) না করিয়া এবং (অপরকে দিয়াও) না করাইয়া আনন্দে স্থিত থাকেন'।

শাস্ত্রাদিতে যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানোত্তর কর্ম্মত্যাগের কথা আছে, সেইরূপ কর্ম্মকরার কথাও আছে। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"।[১] 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে'। "যাবজ্জীবং দশপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত"।[২] 'যাবজ্জীবন দশপূর্ণমাস যাগ করিবে'। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"।[৩] 'কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই ইহলোকে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে'। উপর্য্যুক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের ইহাই তাৎপর্য্য যে আজীবন (আমরণ) কর্ম্ম করিতে হইবে। তাই বলা যায় যে ঐসকল বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানোত্তরও কর্ম্ম করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। 'গীতা'য় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু-র্লোকসংগ্রহম্" ॥[৪] অর্থাৎ 'হে ভারত! অবিদ্বদ্‌গণ যেরূপ কর্ম্মের ফললাভে আসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইপ্রকার লোকসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক বিদ্বদ্‌ব্যক্তিও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন'। লোকেরা অসন্মার্গে ধাবিত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিই তাহাদিগকে সেই মার্গ হইতে উন্নততর মার্গে লইয়া যান। লোকগণের অসন্মার্গ হইতে প্রবৃত্তির নিবারণকেই লোকসংগ্রহ বলা হইয়াছে।[৫] তাই বিদ্বানের নিজের কর্ম্ম না থাকিলেও পরের উপকারার্থে অনাসক্ত-ভাবে তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে দিন দিন আনয়ন করা বিদ্বানেরই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য যদি তিনি প্রতিপালন না করেন, তবে 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে'র মতে, সেই পুরুষ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী তাহাও বলা যায় না। "যাবল্লোক-পরামর্শো-নিরূঢ়ো নাস্তি যোগিনঃ। তাবদ্রূঢ়সমাধিত্বং ন ভবত্যেব নির্ম্মলম্" ॥[৬] অর্থাৎ 'যাবৎপর্য্যন্ত লোকের পরামর্শ লইবার (অর্থাৎ লোকদিগকে উন্নত করিবার) কিছুমাত্র কাজও অবশিষ্ট থাকে, সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগারূঢ়পুরুষের (আত্মজ্ঞানীর) অবস্থা নির্দ্দোষ, এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না'। তাই 'যোগবাশিষ্ঠের' মতে জ্ঞানোত্তর যে জ্ঞানী পুরুষ লোক-কল্যাণ-জনক কার্য্য করিবেন তাহা স্থিরীকৃত হইল। ভর্ত্তৃহরি বলেন, "স্বার্থো-

---

১। কর্ম্মমীমাংসা সূত্র
২। কর্ম্মমীমাংসা সূত্র
৩। ঈশ, উ, ২
৪। গীতা, ৩।২৫
৫। গীতা, ৩।২০র শঙ্করভাষ্য
৬। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ৬ পূঃ, ১২৮।৯৭

যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ"। 'পরার্থই যাঁহার স্বার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'।

তত্ত্বজ্ঞানীর যে কোন কিছু করণীয় নাই তাহার উল্লেখও আবার শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'উত্তরগীতায়' উক্ত হইয়াছে যে, 'জ্ঞানীর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই'। যথা, "জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ"॥[১] অর্থাৎ 'জ্ঞানামৃত পান করিয়া যে পুরুষ তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না; এবং যদি থাকেতো সেই পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানী নহে'। 'মহাভারতে'ও দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। প্রভাসে যদুবংশীয়গণের ভীষণ পরস্পর হত্যাকাণ্ড দেখিয়া বলরামের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি নির্জ্জন বনান্তে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হন।[২] তাহা দেখিয়া কৃষ্ণেরও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। পরন্তু তাঁহাদের অভাবে দ্বারকার স্ত্রীগণের যে দুরবস্থা হইবে তাহা তাঁহার মনে উদয় হয় এবং তাঁহাদিগকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা হয়। এতটা কর্ত্তব্য বুদ্ধি তখনও তাঁহার ছিল। তাই তখন তিনি অর্জ্জুনকে আনয়ন করিতে দারুককে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন এবং বভ্রুকে বলেন দ্বারকায় গিয়া অর্জ্জুনের আগমন পর্য্যন্ত স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে, যাহাতে দস্যুগণ বিত্তলোভে উঁহাদিগকে হিংসা না করে। পরন্তু তৎক্ষণাৎ বভ্রুর মৃত্যু হয়। সুতরাং কৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকায় গমন করেন। তথায় পিতা বসুদেবকে অর্জ্জুনের আগমন পর্য্যন্ত স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে বলেন এবং আরও বলেন, "দৃষ্টং ময়েদং নিধনং যদূনাং রাজ্ঞাং পূর্ব্বং কুরুপুঙ্গবানাম্। নাহং বিনা যদুভির্যাদবানাং পুরীমিমামশকং দ্রষ্টুমদ্য॥ তপশ্চরামি নিবোধ তন্মে রামেণ সার্ধং বনমভ্যুপেত্য"।[৩] 'আমি পূর্ব্বে কুরুবীরদিগের ও অপর রাজগণের এবং অধুনা যদুবংশীয়গণের এই নিধন দেখিয়াছি। যাদবগণ রহিত তাঁহাদের এই পুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আমি সমর্থ নহি। আমি বনে গমন করিয়া রামের সহিত তপশ্চর্য্যা করিব। তাহা আপনি নিশ্চিতরূপে জানুন'। এই বলিয়া পিতার পায়ে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ ত্বরিতগতিতে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যান। ... অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে পর বসুদেব তাঁহাকে বলেন যে, "আমি ধীমান্ রামের সহিত কোন পুণ্যদেশে নিয়মে আস্থিত

১। উত্তরগীতা, ১।২৩ ২। মহাভারত, ১৬।৪।১

৩। মহাভারত, ১৬।৪।৯-১০

হইব। (তাহার) কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। (সুতরাং) আমি করিবই। ইহা নিশ্চয় সত্য”। আমাকে এই বলিয়া অচিন্ত্যপরাক্রম প্রভু হৃষীকেশ বালকগণের সহিত আমাকে পরিত্যাগ করতঃ কোন একদিকে গমন করিয়াছেন।[১] ভাগবতধর্ম্মের পুনরুজ্জীবক ও পুনঃ প্রচারক কৃষ্ণ, যিনি উহার আদি প্রবর্ত্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষির অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন, এবং যিনি অতি মহান্ কর্ম্মী বলিয়া সুবিখ্যাত, তিনি স্বয়ং সংসারের অনিত্যতা এবং দুঃখ দেখিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন এবং তপস্যার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। লোক এবং সমাজের জন্য তাঁহার প্রয়োজন যখন অতিমাত্রায় ছিল, তখনই তিনি উহাদের পরিত্যাগ করেন।

‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’র মতে কৃষ্ণের স্বতঃই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। “বিশ্বাত্মা ভগবান্ হইয়াও কৃষ্ণ লৌকিক এবং বৈদিক মার্গের অনুগামী হইয়া দ্বারাবতীতে সাংখ্যজ্ঞানে আস্থিত হইয়া অনাসক্তভাবে কামসমূহ ভোগ করেন। ... বহুসংবৎসর এই প্রকারে রমমাণ তাঁহার গৃহধর্ম্মীয় কামোপভোগসমূহে সম্যক্ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল”।[২]

মহাবীর ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নিহত হন। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ। তিনি চিরকুমার ছিলেন। সুতরাং স্ববর্ণের শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম্ম না করিলেও অনেক কর্ম্ম করিতেন। তিনি যে যাবজ্জীবন ব্যবহারিক কর্ম্মী ছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পরন্তু তাহা বলিয়া তিনি তিলকের ব্যাখ্যানুযায়ী নিষ্কামকর্ম্মবাদী ছিলেন কি না সন্দেহ। ‘মহাভারতে’র মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে বিবৃত আছে, “যে গার্হস্থ্য পরিত্যাগ না করিয়া বুদ্ধির বিলয়রূপ মোক্ষতত্ত্বকে লাভ করিয়াছে, তাহার বিষয় বর্ণনা করিতে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে অনুরোধ করেন”।[৩] তাহাতে ভীষ্ম মিথিলার রাজা ধর্ম্মধ্বজ জনক এবং বিদুষী সন্ন্যাসিনী সুলভার সংবাদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মধ্বজ “সন্ন্যাসফলিক ছিলেন”।[৪] তিনি বেদে, মোক্ষশাস্ত্রে ও রাজশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন; এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহিত করতঃ পৃথিবী শাসন করিতেন।[৫] মোক্ষধর্ম্মে সুবিজ্ঞ বলিয়া মুমুক্ষুসমাজে তাঁহার প্রসিদ্ধিও ছিল।[৬] ঐ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে সৎসঙ্গ করিবার জন্য মোক্ষতত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ ভিক্ষুকী সুলভা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন।[৭] জনক

১। মহাভারত, ১৬।৬।২৪-২৬

২। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।৩।১৯,২২

৩। মহাভারত, ১২।৩২০।১

৪। মহাভারত, ১২।৩২০।৪

৫। ঐ, ১২।৩২০।৫

৬। ঐ, ১২।৩২০।৮,৩৭

৭। ঐ, ১২।৩২০।১৮৬

ভিক্ষু পঞ্চশিখের শিষ্য ছিলেন। উঁহার মতে, বৈরাগ্যই মোক্ষের পরম সাধন এবং জ্ঞান হইতেই সেই মোক্ষপ্রাপক বৈরাগ্য লাভ হয়। জ্ঞানদ্বারা লোক যত্ন করে; যত্নদ্বারা মহৎ (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হয়; মহৎ প্রাপ্ত হইলে দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হয়; এবং তাহাতে পুনর্জ্জন্মকে জয় করে।[১] যেমন জলসিক্ত মৃণ্ময় ক্ষেত্রে পতিত বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমন কর্ম্ম হইতে মানুষের পুনর্জ্জন্ম হয়। পরন্তু যেমন ভৃষ্ট বীজ হইতে, সুকর্ষিত এবং জলসিক্ত মৃত্তিকায় রোপণ সত্ত্বেও, অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমন বাসনা এবং আসক্তি বিরহিত বুদ্ধিতে কৃতকর্ম্মদ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই ভিক্ষু পঞ্চশিখের সিদ্ধান্ত।[২] তিনি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন।[৩] তাই তিনি ধর্ম্মধ্বজকে মোক্ষের উপদেশ দিলেও রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই।[৪] তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি-মতে, ধর্ম্মধ্বজ মুক্তরাগ, নির্দ্বন্দ্ব, গতমোহ এবং মুক্তসঙ্গ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।[৫] তিনি একাধিক বার সুলভাকে বলেন যে, সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি মুক্ত।[৬] পঞ্চশিখদ্বারা "তাঁহার জ্ঞান (বুদ্ধি) অবীজ কৃত হইয়াছে, সেইহেতু বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না।[৭] মুক্তির জন্য গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের এবং দণ্ডকমণ্ডলাদি ধারণের প্রতি তিনি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।[৮] ভিক্ষুকী সুলভার প্রতি তিনি কঠোর শ্লেষ করিয়াছেন।[৯] প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুকী সুলভা রাজা ধর্ম্মধ্বজ জনকের মতবাদের তথা আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "হে রাজন্! যদি তুমি পঞ্চশিখ হইতে উপায় উপনিষৎ, উপাসঙ্গ এবং নিশ্চয়সহ সম্পূর্ণ মোক্ষ (তত্ত্ব) শুনিয়া থাক এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতঃ মুক্তসঙ্গ হইয়া থাক, তবে ছত্রাদি (রাজোচিত) বিষয়সমূহে তোমার সঙ্গ কেন? যদিও তুমি বলিতেছ যে, তুমি মোক্ষশাস্ত্র শুনিয়াছ, আমার বোধ হয় তুমি মোক্ষশাস্ত্র শুন নাই; অথবা শুনিয়া থাকিলেও মিথ্যাই শুনিয়াছ (অর্থাৎ উহার তাৎপর্য্য ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পার নাই; তাই তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ); অথবা মোক্ষশাস্ত্র-সদৃশ অপর কোন শাস্ত্র শুনিয়াছ। এই লৌকিক ব্যবহারে তুমি প্রাকৃত-জনেরই

১। মহাভারত, ১২।৩২০।২৯-৩০

২। মহাভারত, ১২।৩২০।৩২-৪

৩। মহাভারত, ১২।৩২০।৩৮-৪০

৪। ঐ, ১২।৩৩০।২৭

৫। ঐ, ১২।৩২০।২৮-৩১

৬। ঐ, ১২।৩২০।৫১-৫৩

৭। ঐ, ১২।৩২০।৩৪

৮। ঐ, ১২।৩২০।৪১-৫০

৯। ঐ, ১২।৩২০।৫৩

মত প্রতিষ্ঠিত আছ, সুতরাং উহাদেরই মতন অভিষঙ্গ এবং অবরোধদ্বারা বদ্ধ আছ"।[১] তিনি আরও বলেন (ধর্ম্মধ্বজের জ্ঞান) "প্রকৃতপক্ষে অবীজ হয় নাই, যদিও তিনি হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন"।[২] "তুমি গার্হস্থ্য হইতে চ্যুত হইয়াছ, আর দুর্জ্ঞেয় মোক্ষতত্ত্বকেও জান নাই; মোক্ষবার্তিক মাত্র হইয়া উভয়ের অন্তরালে বর্ত্তমান আছ"।[৩] রাজা ধর্ম্মধ্বজ জনক এবং সন্ন্যাসিনী সুলভার ঐ বাদপ্রতিবাদের বর্ণনার উপসংহারে ভীষ্ম বলেন যে, "ঐ সকল হেতুমান্ এবং অর্থবান্ বাক্যসমূহ শুনিয়া রাজা অতঃপর আর কিছু (উত্তর) খুঁজিয়া পাইলেন না"।[৪] তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মধ্বজের বাক্যসমূহকে তিনি "অসুখ, অযুক্ত এবং অসমঞ্জস" বলিয়াছেন।[৫] তাহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, ভীষ্ম সুলভার মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং তিনি সুলভার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে, মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া একান্ত আবশ্যক; সংসারের সমস্ত ব্যবহার যথাযথ করিতে থাকিয়া কেহ যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। অতএব যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই দাঁড়াইল যে, গার্হস্থ্য পরিত্যাগ না করিয়া কেহ মোক্ষতত্ত্ব অধিগত করিতে পারে নাই; যিনি অধিগত করিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং মনে করিতেন এবং তৎসমকালীন মুমুক্ষুমণ্ডলীতে যাঁহার ঐ সম্বন্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধিও ছিল, সেই বিদেহরাজ ধর্ম্মধ্বজ জনক ভিক্ষুকী সুলভার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

আবার এই কথারও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, জ্ঞানী (মুক্ত) নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বদা মুক্ত। যথা, "বিবেকী সর্ব্বদা মুক্তঃ কুর্ব্বতো নাস্তি কর্ত্তৃতা। অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণজনকৌ যথা"।[৬] 'বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদা মুক্ত, সর্ব্ব-কর্ম্ম করিতে থাকিলেও নির্লেপতার আশ্রয়হেতু তাঁহার কর্ত্তৃতা নাই। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং জনক'।[৭] পরন্তু উপরে যে জনকের নাম উল্লেখ করা হইল ঐ জনক কে? পুরাণশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সূর্য্যবংশীয় রাজা ঈক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির তনয় 'জনক' নামে প্রসিদ্ধ হন। অতঃপর তাঁহার বংশীয়

১। মহাভারত, ১২।৩২০।১৬১-১৬৬ ২। ঐ, ১২।৩২০।১৭৩
৩। ঐ, ১২।৩২০।১৭৪ ৪। ঐ, ১২।৩২০।১৯০ ৫। ঐ, ১২।৩২০।১৭৬
৬। 'কঠোপনিষদে'র (২।১৯) শঙ্করভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি এই স্মৃতিবচনটি অনুবাদ করিয়াছেন।
৭। শ্রীপতিও (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বলিয়াছেন, "জনকাদিব্রহ্মবিদামপি পূর্ব্ববদ্ ব্যবহার এব দৃশ্যতে"। শ্রীপতিভাষ্য, পৃঃ ৪৮

সকল রাজাই জনক নামে অভিহিত হইতে থাকেন।[১] 'মহাভারতে'র মোক্ষ-ধর্ম্মপর্ব্বে কতিপয় জনক রাজার নাম পাওয়া যায়; যথা, জনদেব জনক, ধর্ম্মধ্বজ জনক, করাল জনক প্রভৃতি। কোন কোন পুরাণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, প্রায় সকল জনক অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন।[২] পরন্তু সকল জনকই যে জ্ঞানোত্তর-রাজকার্য্যাদি যথাপূর্ব্ব করিতেন তাহা নহে। কোন কোন জনক সন্ন্যাসও করিয়াছিলেন। 'মহাভারতে'ই তাহার উল্লেখ আছে। তাই প্রশ্ন হয় "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" গীতার (৩।২০) এই বচনে কোন জনককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। একজন জনক রাজা শ্রুতিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ দেখা যায়।[৩] তাঁহার সভায় ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ উপদেশ-লাভের পরে ঐ জনক কি করেন, তাহা তথায় বিবৃত হয় নাই। 'জাবাল' উপনিষদে আছে। বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে সন্ন্যাসবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবান্ সন্ন্যাসং ব্রূহীতি"।[৪] তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস-সমর্থক বচন বলেন। "ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ"। জনক তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। সুতরাং জনক সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন বলা যায় না। 'মহাভারতে' দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যিনি ব্রহ্মোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম দৈবরাতি জনক এবং উপদেশপ্রাপ্তির পর তিনি রাজপাট পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। "মিথিলাধিপ তখন পুত্রকে বিদেহরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ বাস করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি।[৫] একজন সন্ন্যাসী জনকের উল্লেখ মহাভারতে অর্জ্জুন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরে যখন যুধিষ্ঠির নিহত আত্মীয় স্বজনগণের শোকে অভিসন্তপ্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগকরতঃ বনে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রতিবাধা দিতে গিয়া অর্জ্জুন সন্ন্যাসী জনক ও তাঁহার ভার্য্যার সংবাদ পুরাবৃত্ত বর্ণনা করেন।[৬] বিদেহরাজ "জনক, পুত্র, কলত্রসকল, ধনসমূহ, বিবিধ রত্নসমূহ এবং (ইহপরলোকে অভ্যুদয় লাভের) পন্থা পাবকে পরিত্যাগ করতঃ

১। যথা দ্রষ্টব্য দেবীভাগবতপুরাণ, ৬।১৫।৩০

২। যথা দ্রষ্টব্য বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৫।৩৫ ; (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৯।১৩।২৭

৩। যথা, শত ব্রা (মাধ্য), ১১।৩।১।২ ; ১১।৪।৩।২০; ৬।২।১ ইত্যাদি ; বৃহ, উ, ৩।১।১ ; ৪।১।১ ইত্যাদি ; জৈমি ব্রা, ১।১৯।২ ; কৌষী ব্রা, উ, ৪।১

৪। জাবাল, উ, ৪

৫। মহাভারত, ১২।৩১৮।৯৭

৬। মহাভারত, ১২।১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করেন ('মৌঢ্যমাস্থিতঃ')।[১] তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ "নিষ্ক্রিয় হইয়া পরিব্রজ্যা করেন"।[২] তাঁহার কুণ্ডিকা ও ত্রিদণ্ড ছিল।[৩] একদিন তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে মুষ্টি মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বের স্ত্রী কৌশল্যা কঠোর ভর্ৎসনা করেন। অর্জ্জুন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে "তত্ত্বজ্ঞো জনকো রাজা লোকেঽস্মিন্নিতি গীয়তে"—'রাজা জনক তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন'।[৪] সুতরাং জ্ঞানোত্তর কর্ম্মসন্ন্যাসী জনকের প্রবাদ জ্ঞানোত্তর কর্ম্মী জনকের প্রবাদেরই মত প্রাচীন। কর্ম্মী জনকের দৃষ্টান্ত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেন, আর সন্ন্যাসী জনকের দৃষ্টান্ত অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে দেন।

'বিষ্ণুপুরাণে' রাজা কেশিধ্বজ জনক এবং রাজা খাণ্ডিক্য জনকের কথা আছে।[৫] কথিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের সময়ে কেশিধ্বজ অদ্বিতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিশারদ এবং খাণ্ডিক্য অদ্বিতীয় কর্ম্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। কেশিধ্বজ হইতে অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ পাইয়া খাণ্ডিক্য রাজ্য ত্যাগ করতঃ বনে গমন করেন এবং সাধনবলে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন, আর কেশিধ্বজ বিমুক্ত্যর্থ সকর্ম্ম-ক্ষেপণোন্মুখ হইয়া বিষয়সমূহ ভোগ করেন এবং অনাসক্তভাবে ('অনভিসংহিতম্') কর্ম্ম করেন। কল্যাণপ্রদ উপভোগসমূহদ্বারা তাঁহার পাপ ও মল ক্ষয় হইলে তিনি তাপ (ত্রয়) ক্ষয়ফলিক আত্যন্তিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।[৬]

'মহাভারতে'র বিবরণ হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে ব্যাসের শিষ্য জনক, যিনি শুকদেবকে উপদেশ করেন, তিনি চাতুরাশ্রমবাদী ছিলেন, মোক্ষলাভার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। 'মহোপনিষদে' আছে, জনক শুকের নিকট, যে বিজ্ঞানদ্বারা মনুষ্য সদ্য জীবন্মুক্তত্ব লাভ করে, তাহা এবং জীবন্মুক্তের লক্ষণ বর্ণনা করেন।[৭] উহাতে কর্ম্মসন্ন্যাসের যেমন স্বপক্ষে তেমন বিপক্ষেও কিছুই নাই। উহার একটি বচন এই, "যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্যোঽপি নিস্পৃহঃ। পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে"॥[৮] 'যে সমস্ত জাগতিক বিষয়ের ব্যবহার করিতে থাকিলেও উহাদিগের প্রতি, যেমন পরার্থের প্রতি তেমন, নিস্পৃহ, সুতরাং পূর্ণাত্মা, সে জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়'।

১। মহাভারত, ১২।১৮।৪
২। ঐ, ১২।১৮।১০,১৬
৩। ঐ, ১২।১৮।১৯
৪। ঐ, ১২।১৮।৩৭
৫। বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৬-৭ অধ্যায়
৬। ঐ, ৬।৭।১০৩-৬
৭। মহোপনিষদ্, ২।৩৭
৮। ঐ, ২।৬২

এই বচন হইতে ইহা জানা যায় যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগতিক ব্যবহার করিতেও পারেন। পরন্তু ইহাও বলা যায় না যে, জীবন্মুক্তের সাংসারিক ব্যবহার যথাপূর্ব্ব করিতেই হইবে বলিয়া জনক মনে করিতেন। কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার নিকট উপদেশ পাইবার পর শুক মেরুপর্ব্বতের শিখরে গিয়া নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে নিমগ্ন হন এবং কালান্তরে তৈলহীন দীপবৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন, সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায় অমল পরমাত্মায় একতা প্রাপ্ত হন।[১] 'মহাভারতে'ও আছে যে, জনকের নিকট উপদেশপ্রাপ্তির পর শুক হিমালয়পর্ব্বতে চলিয়া যান। এইরূপে দেখা যায়, কোন কোন জনক জ্ঞানোত্তর সংসার-ব্যবহার পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসী হইয়াছেন; আর কেহ কেহ মোক্ষলাভার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন; আর কেহ কেহ জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম করিয়াছেন। জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম করা এবং না করা এই উভয় পন্থাই শাস্ত্রানুমোদিত। 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে, "লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ধর্মঃ প্রবর্ততে। প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যস্মাদেতদ্ ভবিষ্যতি" ॥[২] অর্থাৎ, 'কেননা, উহা হইতে সম্পূর্ণ লোকতন্ত্রের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, যেহেতু উহা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়পক্ষেই হইবে'। জ্ঞানোত্তর অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করাই 'প্রবৃত্তিমার্গ' এবং না করাই 'নিবৃত্তিমার্গ'। শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তিধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম্ম উভয়ই তিনি। তিনি অর্জ্জুনকে বলেন, "হে কৌন্তেয়! তুমি ও আমি নর ও নারায়ণ বলিয়া, পরন্তু (পৃথিবীর) ভার অবতারণার্থই আমরা মনুষ্যদেহ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, স্মৃত হই। হে ভারত! আমি অধ্যাত্মযোগ-সমূহ, আমি কি এবং কোথা হইতে আসিয়াছি, তৎসমস্তই জানি। আমি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম তথা আভ্যুদায়িক (ফলপ্রদ) প্রবৃত্তিধর্ম্মও। একমাত্র সনাতন আমিই নরগণের অয়ন বলিয়া খ্যাত"। (দ্রষ্টব্য মহাভারত, ১২।৩৪১।৩৭-৩৯)।

১। মহোপনিষদ্, ২।৭৫-৭৭ ২। মহাভারত, ১২।৩৩৫।৩৯.২-৪০.১

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভক্তি ও মুক্তি

মুক্তি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ কি সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ভক্তি কি এবং ভক্তির সহিত মুক্তির সম্বন্ধই বা কি ইত্যাদির আলোচনা করা যাইতেছে।

ভক্তি কি ?

প্রেমই ভক্তি। দেবর্ষি নারদ বলেন, "সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা"।[১] অর্থাৎ 'ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমই ভক্তি'। তিনি আরও বলেন, "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্"।[২] 'ঐ প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়'। মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"।[৩] অর্থাৎ 'ঈশ্বরে যে পরম অনুরক্তি তাহারই নাম ভক্তি'! 'পরমসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে, "স্নেহপূর্ব্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে"।[৪] 'অর্থাৎ স্নেহসহকারে ভগবানের অনুধ্যানই ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।' রূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে এক 'পাঞ্চরাত্রসংহিতা' হইতে (যাহার নাম উল্লিখিত হয় নাই) প্রেমভক্তির নিম্নোক্ত সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছেন, "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে"।[৫] অর্থাৎ 'দেহাদি বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে মমতাধিক্য জন্মিলেই তাহাকে ভক্তি বলা হইয়া থাকে'। 'বিষ্ণুভাগবতপুরাণে' ভক্তির নিম্নলিখিত সংজ্ঞা পাওয়া যায়। "মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে"।[৬] অর্থাৎ 'গঙ্গাম্ভসের সমুদ্রের প্রতি যেরূপ অবিচ্ছিন্না গতি সেইরূপ আমার (ভক্তবাৎসল্যাদি) গুণগ্রামের শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে (পুরুষোত্তমে) ভেদদর্শনরহিতা ও ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতা মনের যে অবিচ্ছিনা গতি তাহাই শাস্ত্রাদিতে নির্গুণ ভক্তি (যোগ) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে'। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই বা স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি'।[৭] যে বিশুদ্ধ অনুসন্ধানের

১। নারদসূত্র, ২
২। ঐ, ৫১
৩। শাণ্ডিল্যসূত্র, ২
৪। পরমসংহিতা, ৪।৭২
৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।৪।১
৬। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।২৯।১১-১২
৭। "স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে"। বিবেকচূড়ামণি, ৩২

সহায়তায় ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নতাবোধ জন্মে, তাহাই তাঁহার মতে ভক্তি। তাঁহার মতে ভক্তিতে পরমেশ্বরই জীবের আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তিনি বলেন ভক্তি জ্ঞানরূপী।[১] জ্ঞাননিষ্ঠা আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ যে চতুর্থী ভক্তি তাহাই। অর্থাৎ ভক্তি আর পরাজ্ঞাননিষ্ঠা একই বস্তু।[২]

আচার্য্য যামুন বলেন, "ভক্তি যোগঃ পরৈকান্তপ্রীত্যাধ্যানাদিষু স্থিতিঃ"।[৩] "পরের (বা পরমপুরুষের) প্রতি একান্ত প্রীতিবশতঃ তাঁহার ধ্যানাদিতে অবস্থিতিই ভক্তি"। পরে তিনি বলিয়াছেন, ভগবানের ধ্যান, যোগ, উক্তি (প্রবচন), বন্দন, স্তুতি, কীর্ত্তন প্রভৃতি জনিত প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে তদ্গত ভাব তাহাই ভক্তি।[৪] আচার্য্য রামানুজ বলেন, "ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে"।[৫] 'ধ্রুবানুস্মৃতিই ভক্তি নামে অভিহিত হয়'। ঐ ধ্রুবানুস্মৃতিই প্রত্যক্ষজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) সমান।[৬] আবার জ্ঞান উপাসনাদি শব্দবাচ্য সর্ব্বাধিক প্রিয় ও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবাপন্ন স্মৃতিস্বরূপ।[৭] আর ভক্তি শব্দেও উপাসনাকেই বুঝায়।[৮] তাই ভক্তিকে ধ্রুবানুস্মৃতি, জ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায়। আচার্য্য নিম্বার্ক ভক্তিকে প্রেমবিশেষলক্ষণা বলিয়াছেন, (দ্রষ্টব্য দশশ্লোকী, শ্লোক ৯)। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "নিরুপমসুখসম্বিৎ-রূপমস্পৃষ্ট-দুঃখং ভক্তিযোগম্"।[৯] অর্থাৎ 'দুঃখ সম্পর্করহিত অতুলনীয় আনন্দানুভূতিই সেই ভক্তি (যোগ)'।

ভক্তি মুক্তির সাধন

ভক্তির দ্বারাই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়।[১০] তাই উহা মুক্তির সাধন। মায়ার দ্বারা সংমোহিত হইয়া জীব (প্রকৃতপক্ষে) পর (অর্থাৎ পরব্রহ্ম এবং

১। গীতা, ১৮।৫৪র শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। "সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা···পরাচতুর্থীভক্তিরিত্যুক্তা"। ঐ, ১৮।৫৫ র শঙ্করভাষ্য

৩। গীতার্থসংগ্রহ, শ্লোক ২৪

৪। ঐ, " ৩০ (শ্রীনিবাস অষ্টাঙ্গযোগকে ভক্তিযোগ বলিয়াছেন, "ভক্তিযোগনাম যমনিয়মাসনপ্রণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিরূপাষ্টাঙ্গাং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপঃ"। যতীন্দ্রমতদীপিকা, পুনা সং, পৃঃ ৬২)।

৫। শ্রীভাষ্য, ১।১।১ ৬। ঐ, ১।১।১ ৭। ঐ, ১।১।১

৮। ঐ, ১।১।১ ৯। ভক্তিরসায়ণসিন্ধু, ১ ১০। গীতা, ১৮।৫৫

মায়াতীত) হইলেও, আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং তৎকৃত অনর্থসমূহ প্রাপ্ত হয়।[১] অধোক্ষজে ভক্তিযোগই ঐ অনর্থসমূহের উপশমের সাক্ষাৎ উপায়।[২] যাহারা তাহা জানে না, তাহাদিগকে তাহা জানাইবার অভিপ্রায়ে মহর্ষি ব্যাস 'সাত্বতসংহিতা' (বিষ্ণুভাগবতপুরাণ) রচনা করেন। উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যদিগের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে তাহাদিগের শোক, মোহ এবং ভয় বিদূরিত হয়।[৩] 'বিষ্ণুভাগবত-পুরাণে' তত্ত্বজ্ঞানলাভের সাধনরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবের মুক্তি হয়। ভক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান পাওয়া যায়। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তকে ঐ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। 'গীতা'য় ভগবান্ কৃষ্ণ তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন।[৪] 'বিষ্ণুভাগবতপুরাণে'র অন্যত্রও সেই প্রকার বহু স্পষ্টোক্তি এবং দৃষ্টান্ত আছে। যথা, পরম-ভাগবতকবি বলিয়াছেন যে, নিরন্তর ভগবানের ভজনকারী ভাগবতের (ভগবানে) ভক্তি, (সংসারে) বিরক্তি এবং ভগবজ্‌জ্ঞান ("পরেশানুভবঃ", "ভগবৎপ্রবোধঃ") এই তিনই একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে সে পরাশান্তি লাভ করে।[৫] তাহার সর্ব্বপ্রকারের সংসারভয় নিবৃত্ত হয়, সে সম্যক্ অভয়প্রাপ্ত হয়।[৬] পিপ্‌পলায়ন বলেন, "ভগবান্ বিষ্ণুর চরণপ্রাপ্তির এষণাদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তীব্র ভক্তি রূপ অগ্নিদ্বারা জীবের গুণকর্ম্মজ চিত্তমল-সমূহ দগ্ধ হয়; চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে (জীব) আত্মতত্ত্ব তেমন সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করে, যেমন নির্ম্মলনেত্রে সূর্য্যের প্রকাশ (দেখে)"।[৭] সূত বলিয়াছেন, "হরির গুণানুবাদের শ্রবণাদিদ্বারা তাঁহার চরণকমলের অবিস্মৃতি হয়। কৃষ্ণচরণকমলের অবিস্মৃতি সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট করে এবং শম বিস্তার করে; তথা চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি এবং বিজ্ঞানে (অর্থাৎ বিবিধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে) বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান (উৎপাদন করে)।[৮]

আবার কথিত হইয়াছে যে ভক্তি চিত্তশুদ্ধির, বৈরাগ্যের এবং জ্ঞানলাভের অতি সুগম এবং আশু ফলপ্রদ সাধন। যথা, দেবগণ বলেন, "ভগবানের কথামৃত পানদ্বারা প্রবৃদ্ধ ভক্তির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা

১। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ১।৭।৫

২। "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে"। ঐ, ১।৭।৬; আর দেখুন ঐ ১।২.৬

৩। ঐ, ১।৭।৬-৭

৪। গীতা, ১০।১০

৫। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ১১।২।৪২-৪৩

৬। ঐ, ১১।২।৩৩

৭। ঐ, ১১।৩।৪০

৮। ঐ, ১১।১২।৫৩-৫৪

অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জসা") বৈরাগ্যসার-জ্ঞান লাভ করতঃ ভগবানে প্রবেশ করেন"। অপর যে সকল ধীরব্যক্তিগণ আত্মসমাধিযোগবলদ্বারা বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করতঃ ভগবানে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। পরন্তু ভগবানের সেবারূপভক্তিতে তত পরিশ্রম হয় না। ভক্ত অনায়াসে ভগবানে প্রবেশ করেন।[১] ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্" ॥[২] অর্থাৎ 'ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি প্রয়োজিতভক্তি শীঘ্র (অব্রহ্মসংসারের প্রতি) বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মদর্শনরূপজ্ঞান উৎপন্ন করে'। দেবর্ষি নারদ বলেন, যে অচ্যুত-কথাশ্রয়ী শ্রদ্ধাসহকারে অচ্যুতের কথা নিত্য শ্রবণ ও পাঠ করে, সে অচিরেই ভক্তিলাভ করে, এবং ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করে।[৩] মহাত্মা সনৎকুমার বলেন "সন্তগণ হৃদয়গ্রন্থিরূপ কর্ম্মাশয় ভগবান্ বাসুদেবের চরণকমলের প্রতি অনুরাগবিলাসরূপভক্তিদ্বারা যেমন ছিন্ন করেন, বৈরাগ্যবান এবং চিত্তনিরোধকারী যতিগণ তেমন পারেন না। এই সংসার সমুদ্র ষড়বর্গ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) রূপ মকর পূর্ণ। সেইহেতু উহা অতীব দুস্তর। যোগাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হওয়া অতীব কঠিন। পরন্তু ভগবান্ হরির ভজনীয় চরণকমলকে নৌকা করিলে উহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।[৪] পরম ভাগবত প্রবুদ্ধ বলেন, "এই প্রকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিয়া তদুত্‌থ ভক্তির দ্বারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া মনুষ্য অনায়াসে এবং শীঘ্র দুস্তর মায়া অতিক্রম করে"।[৫] প্রহ্লাদ বলেন, যে হেতু অচ্যুত সর্ব্বভূতের আত্মা এবং ইহসংসারে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, সেইহেতু তাঁহাকে তুষ্ট করিতে বহু আয়াস করিতে হয় না।[৬] আর তিনি তুষ্ট হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না।[৭] সুতরাং সমস্ত কিছুই অচ্যুতভক্তির দ্বারা সহজে পাওয়া যায়।

ইহাও বোধ হয় এইখানে বলা উচিৎ যে, ভক্তির দ্বারা যে অনায়াসে এবং অচিরে চিত্তশুদ্ধি বশতঃ ভগবল্লাভ হয় বলা হইয়াছে, তাহা অর্থবাদও হইতে পারে। অন্ততঃ তাহা ঐকান্তিক নহে। কেননা, তপস্যাদি সম্বন্ধেও

১। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ৩৫।৪৫-৪৬

২। ঐ, ৩।৩২।৩৩ (স্বল্পবিস্তর পাঠান্তরে এই বচন ঐ গ্রন্থের অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা, সূত বলিয়াছেন, ৪।২।৩৭ ; নারদ বলিয়াছেন, ১।২।৭)

৩। ঐ, ৪।২৯।৩৭-৩৮ ৪। ঐ, ৪।২২।৩৯-৪০ ৫। ঐ, ১১।৩।৩৩

৬। ঐ, ৭।৬।১৯ ৭। ঐ, ৭।৬।২৫

সেইপ্রকার উক্তি (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে কখন কখন পাওয়া যায়। যথা, ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "তপস্যার দ্বারাই মনুষ্য সর্ব্বভূতগুহাবাসী পরজ্যোতিঃ ভগবান্ অধোক্ষজকে অনায়াসে এবং শীঘ্র লাভ করিতে পারে"।[১] ভগবান্ কপিল যেমন বলিয়াছেন যে, বাসুদেবভক্তির দ্বারা মনুষ্য আশু বৈরাগ্য ও ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান লাভ করে, তেমন তৎপূর্ব্বে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-দ্বারাই লোক অনায়াসে এবং শীঘ্র বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভ করতঃ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।[২] ভগবান্ কৃষ্ণও সেইপ্রকার বলিয়াছেন যে, সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা মনুষ্য বৈকল্পিক (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চরূপ) ভ্রমকে "সদ্য" পরিত্যাগ করে।[৩] যেমন আকাশে সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমন সাংখ্যবিচারসম্পন্ন ব্যক্তির বৈকল্পিক ভ্রম থাকিতে পারে না।[৪] ভগবান্ রুদ্র বলিয়াছেন, "ইহসংসারে সমস্ত শ্রেয় (সাধন) সমূহের মধ্যে জ্ঞানই পরম নিঃশ্রেয়স (সাধন)। জ্ঞানরূপ নৌকা (এই সংসাররূপ) দুস্পার ব্যসনার্ণবকে সুখে পার হয়।[৫]

যাহা হউক ভক্তিকে যে কেবল সহজ এবং আশুফলপ্রদ সাধন বলা হইয়াছে তাহা নহে, আরও বলা হইয়াছে যে, উহা অব্যর্থ, সম্যক্ কল্যাণতম, সুতরাং শ্রেষ্ঠতম সাধনও ; তৎসদৃশ শিবপন্থা আর নাই। ভগবান্ কপিল বলেন, "যোগীদিগের ব্রহ্মসিদ্ধির জন্য অখিলাত্মা ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত ভক্তির সদৃশ শিবপন্থা আর নাই।[৬] ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে উদ্ধব! আমার প্রীতিবর্দ্ধনশীল ভক্তি আমাকে যেমন প্রাপ্ত করায়, সাংখ্য, যোগ, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ কিম্বা ত্যাগ তেমন করায় না। সাধুগণের প্রিয় আত্মা আমি একমাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারাই গ্রাহ্য"।[৭] প্রহ্লাদ বলেন, মৌন, ব্রত, শ্রবণ, তপঃ, স্বাধ্যায়, স্বধর্ম্ম-পালন, ব্যাখ্যান, একান্তবাস, জপ এবং সমাধি এইগুলি মোক্ষপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরন্তু ঐ সকল প্রায় অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণের জীবিকার সাধন হইয়া থাকে, আর দাম্ভিকদিগের জীবিকাসাধনও উহারা কখন হয়; আর কখন হয়ও না।[৮] ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন. "তপঃ এবং বিদ্যা উভয়ই বিপ্রদিগের নিঃশ্রেয়সকর। উহারাই (আবার) দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার বিপরীত ফলপ্রদ হইয়া যায়"।[৯] তাৎপর্য্য এই যে ভক্তি ব্যতীত অপর

১। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ৩।১২।১৯ ২। ঐ, ৩।২৭।২৭-২৯
৩। ঐ, ১১।২৪।১ ৪। ঐ, ৪।২৪।২৮
৫। ঐ, ৪।২৪।৭৫ ৬। ঐ, ৩।২৫।১৯
৭। ঐ, ১১।১৪।২০-২১ ৮। ঐ, ৭।৯।৪৬ ৯। ঐ, ৯।৪।৭০

সাধন সমূহ পতনাশঙ্কা রহিত নহে ; সেই হেতু উহাদিগকে ঐকান্তিক ও অব্যর্থ ফলপ্রদ বলা যায় না। এবং উহারা শিবপন্থাও নহে। ভক্তিই শিবপন্থা।[১]

ভগবদ্ ভক্তি যে মহান্ পাপীকেও পবিত্র করতঃ উদ্ধার করে 'গীতা'য়ও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে অনন্যভাবে ভজন করিতে আরম্ভ করে, তবে সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং শাশ্বত শান্তিলাভ করে।[২] "হে পার্থ! যে সকল স্ত্রীগণ, বৈশ্যগণ এবং শূদ্রগণ, তথা অপর পাপযোনি-ব্যক্তিগণ আমাকে আশ্রয় করতঃ অবস্থান করে, তাহারাও পরাগতি প্রাপ্ত হয়।[৩] 'বিষ্ণুভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ বিশুদ্ধা ভক্তির দ্বারাই প্রীত হন। তদ্‌ভিন্ন অপর সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র।[৪] বহু পাপী জীব (অচ্যুতের ভক্তিদ্বারা) অচ্যুততত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।[৫] শুকদেব বলেন, যে অভয় লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহার উচিৎ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করা।[৬] বিদুর বলেন, "সমস্ত বেদসমূহ, যজ্ঞসমূহ, তপঃসমূহ এবং দানসমূহ জীবকে অভয় প্রদানের এক কণাও করিতে পারে না"।[৭] সুতরাং সম্যক্ অভয়, তাঁহার মতে, একমাত্র ভক্তি হইতেই লাভ হয়, অপর কোন উপায়ে নহে।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"।[৮] 'মোক্ষকারণনিচয়ের মধ্যে ভক্তিই গরীয়সী (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা)'। তিনি আরও বলেন, "পরয়াভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি"।[৯] 'পরাভক্তির দ্বারাই ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারা যায়'। 'স্নেহপূর্ব্বক ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণকে আমি (ঈশ্বর) আমার তত্ত্ববিষয়ক (পরমেশ্বরবিষয়ক) যথার্থ জ্ঞান (বুদ্ধিযোগ) দান করি, যে বুদ্ধিযোগের (সম্যক্ জ্ঞানের) দ্বারা তাঁহারা আমাকে—সকলের আত্মভূত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন'।[১০] তাঁহার মতে যথার্থ জ্ঞান (বুদ্ধিযোগ) উৎপত্তির কারণ ভগবদ্‌ভক্তি। এবং জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। তাই ভক্তি সাক্ষাৎ ভগবদ্ প্রাপ্তির কারণ না হইলেও পরোক্ষভাবে

১। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীতা, ১৮।৫৫

২। গীতা, ৯।৩০-৩১

৩। গীতা, ৯।৩২

৪। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ৭।৭।৫০-৫২

৫। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ৭।৭।৫৪

৬। ঐ, ২।১।৫

৭। ঐ, ৩।৭।৪১

৮। বিবেকচূড়ামণি, ৩২

৯। গীতা, ১৮।৫৫র শঙ্করভাষ্য

১০। গীতা, ১০।১০র শঙ্করভাষ্য

ভগবদ্ প্রাপ্তির কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ব্যতীত যেরূপ মুক্তি অসম্ভব, সেইরূপ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না।[১]

'গীতার্থসংগ্রহে' আচার্য্য যামুন বলিয়াছেন যে, ভগবৎস্বরূপ একমাত্র পরাভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়।[২] ভক্তিই ভগবানকে লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।[৩] ঐ ভক্তি আবার স্বধর্ম্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যদ্বারা সাধ্য।[৪] কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান-যোগদ্বারা সুসংস্কৃতান্তঃকরণ ব্যক্তিরই ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে।[৫] ভক্তির চরম অভিব্যক্তি প্রপত্তি বা ভগবানের শরণাগতি। আত্মসমর্পণই শরণাগতির পরিপূর্ণতা। যামুন বলেন, ভগবানের স্বরূপ প্রকৃতি (বা মায়ার) দ্বারা তিরোহিত আছে, শরণাগতির দ্বারা সেই তিরোধানের নিবৃত্তি হয়।[৬] অবশ্য তিনি এখানে কৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলেন, ত্রিগুণ মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া লোক তাঁহার স্বরূপ যথার্থতঃ জানিতে পারে না। যাহারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করে তাহারা ঐ মায়া উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং তাঁহাকে যথার্থতঃ জানিতে সক্ষম হয়।[৭] নিখিল অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে এবং নিজকে "পরানুগ" (অর্থাৎ ভগবানের অনুগত ভৃত্য) বলিয়া উপলব্ধি করিলেই পরাভক্তি লাভ হয়। একমাত্র উহারই দ্বারা মনুষ্য পরমপদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়।[৮] 'গীতার্থসংগ্রহে'র উপসংহারে আচার্য্য যামুন বলিয়াছেন যে, একান্ত এবং অত্যন্ত দাস্যৈকরতি দ্বারাই মনুষ্য বিষ্ণুপদ (মুক্তি) লাভ করিতে পারে এবং গীতাশাস্ত্রও তৎপ্রধান।[৯] 'স্তোত্ররত্নে' যামুনের ভগবদ্ দাস্যৈকরতি চরমে উঠিয়াছে। তিনি ভগবান্ নারায়ণের নিকট এই কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অপর সমস্ত বাসনা যেন নিঃশেষে প্রশান্ত হইয়া যায়, একমাত্র এই বাসনা যেন থাকে যে, তিনি তাঁহাকে (ভগবানকে) নিরন্তর সেবা করিয়া, তাঁহার "ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর" হইয়া প্রহর্ষিত হইতে থাকিবেন। (ঐ, ৪৬ শ্লোক)। তিনি জানেন যে, ভগবানের শ্রীচরণে নিত্য সেবা করার কথাত দূরে থাকুক, এমনকি নিত্য ধ্যান করাও বড় বড় যোগিগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং তাঁহার মত অধম, সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে উহা লাভ করিতে কামনা করা পরিহাসেরই বিষয়। তথাপি "তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ" ('আমি কামপরায়ণ হইয়া তোমার পরিজন-

---

১। বোধসার, ১১ ২। গীতার্থসংগ্রহ, ২৬ শ্লোক
৩। গীতার্থসংগ্রহ, ১৬ শ্লোক ৪। গীতার্থসংগ্রহ, ১ শ্লোক
৫। ঐ, ১৬ ,, ৬। ঐ, ১১
৭। গীতা ৭।১৩-১৪ ৮। গীতার্থসংগ্রহ, ৩০ শ্লোক। ৯। ঐ. ৩২ শ্লোক

ভাব কামনা করিতেছি'। (ঐ, ৪৭ শ্লোক)। "হে হরি! হাজার অপরাধে অপরাধী এবং (সেইহেতু) অতি ঘোরসংসার সাগরে নিমগ্ন (আমি তাহা হইতে নিস্তারের অপর) উপায় রহিত (হইয়া তোমার) শরণাগত হইয়াছি। কৃপা করিয়া আত্মসাৎ কর"। (ঐ, ৪৮ শ্লোক)। "তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি দয়িতা, তুমি পুত্র, তুমি প্রিয় সুহৃৎ, তুমি মিত্র, তুমি গুরু এবং তুমি জগতের সকলের গতি। আমি তদীয়, তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন, ত্বদ্‌গতি (অর্থাৎ তুমিই আমার একমাত্র গতি) এবং তোমাতে প্রপন্ন। তোমার সহিত আমার এইপ্রকার (সর্ব্বসম্বন্ধ) হইলেও আমি 'তবৈবাস্মি' (আমি তোমারই দাস), তুমি আমায় রক্ষা কর"। (ঐ, ৬০ শ্লোক)। "যাহারা একমাত্র তোমার দাস্য 'সুখে' আসক্ত তাহাদের গৃহে আমার বরং কীটরূপে জন্ম হউক। পরন্তু ব্রহ্মারূপেও যেন আমার জন্ম অপরের গৃহে না হয়। (ঐ, ৫৫ শ্লোক)। যামুনের এই সকল উক্তি হইতে অনায়াসে অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, তিনি দাস্য ভাবকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার মতে দাস্যভাবের দ্বারাই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়।

শ্রুতির মতে একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারাই অনাদি-অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, সুতরাং মোক্ষলাভ হয়। রামানুজ বলেন, উক্ত 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যসমূহের অর্থজ্ঞানমাত্র নহে, ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতিই।[১] "তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপ ধ্রুবাস্মৃতিকেই অপবর্গ লাভের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ স্মৃতি আবার দর্শনের সমান। শ্রুত্যুক্ত 'নিদিধ্যাসনও দর্শনরূপী। কেননা, ভাবনার প্রকর্ষ হইতে স্মৃতি দর্শনরূপে পর্য্যবসিত হয়। ঐ বিষয়ে তিনি 'বাক্যকার' নামে খ্যাত জনৈক প্রাচীন আচার্য্যের অভিমতও উদ্ধৃত করিয়াছেন"।[২] অনন্তর তিনি বলেন, কেবল মাত্র শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনদ্বারাও পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় না। পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, তাহারই নিকটে তিনি আপনস্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয়। পরমাত্মা যাঁহার নিকট নিরতিশয় প্রিয় সেই তাঁহার প্রিয়তম হয়, তাহাকেই পরমাত্মা নিজের স্বরূপ প্রকাশার্থ বরণ করেন। ঐ প্রিয়তম ব্যক্তি যাহাতে তাঁহাকে পাইতে পারে, ভগবান্ স্বয়ং তজ্জন্য প্রযত্ন করেন। 'গীতা'তে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই তাহা বলিয়াছেন।[৩] এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, সতত

১। "জ্ঞানং চ...ধ্যানোপাসনাদি শব্দবাচ্যং...মোক্ষ সাধনম্"। শ্রীভাষ্য, ১।১।১

২। ঐ, পৃঃ ২৪-২৭ (১ম খণ্ড) দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত

৩। গীতা, ৭।১৭; ১০।১০

ভগবৎ স্মরণ যাহার অতিশয় প্রিয়, সেই ভগবানের প্রিয়তম, সুতরাং বরণীয় হয়। অতএব সেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে।[১] ঐ প্রকারে ধ্রুবানুস্মৃতি-ভক্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না, 'ভক্তি' শব্দ উপাসনার পর্য্যায়বাচী।[২] এইরূপে আচার্য্য রামানুজ সিদ্ধ করিয়াছেন যে, ধ্যানোপাসনাদি-রূপ ভক্তির দ্বারা পরিতুষ্ট পরমেশ্বরের প্রসাদেই জীবের মোক্ষলাভ হয়।[৩] তিনি বলেন, ইহা যে বলা হইয়া থাকে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানদ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত, তাহা (প্রকৃত পক্ষে) যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, (জীবের) বন্ধন পারমার্থিক; সুতরাং জ্ঞানদ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। "পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মবশতঃ দেবমনুষ্যাদি শরীরধারণ এবং তৎফল সুখদুঃখাদি অনুভবই আত্মার বন্ধন। সুতরাং উহাকে মিথ্যা বলা যায় না। অতএব বন্ধন পারমার্থিক। এবংবিধ বন্ধনের নিবৃত্তি একমাত্র ভক্তিরূপ-শরণাগত উপাসনার দ্বারা পরিতুষ্ট পরমপুরুষের প্রসাদের দ্বারাই লভ্য। ......অভিমত-ঐক্যজ্ঞান বস্তুর যথাবস্থিতির বিপরীত বলিয়া মিথ্যা। সেইহেতু উহার ফলে বন্ধনের বিশেষ বৃদ্ধিই হয়"।[৪] সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, এবং মহা উদার পরমপুরুষ যাগ, দান, হোম, প্রভৃতি উপাসনার দ্বারা আরাধিত হইয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ্যপদার্থসমূহ, তথা স্বস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ-অপবর্গও দিয়া থাকেন।[৫] যাগাদির ন্যায় স্তুতি, নমস্কার, কীর্ত্তন, অর্চ্চন এবং ধ্যানও তাঁহার উপাসনা।[৬] রামানুজ বলেন, যেমন উপাসক-প্রত্যগাত্মা স্বয়ং স্বশরীরের আত্মা, তেমন পরব্রহ্ম প্রত্যগাত্মার আত্মা। সুতরাং নিজের (উপাসকের) আত্মরূপেই ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে, উভয়ে অভিন্ন বলিয়া নহে।[৭] ঐ উপাসনারূপ ভক্তিদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়।

আচার্য্য বলদেববিদ্যাভূষণ বলেন, জীব শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনদ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরব্রহ্মে গমন করে, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রণাম করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা দশটি অশ্বমেধযজ্ঞেও লাভ হয় না। দশাশ্বমেধীকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর (কৃষ্ণভক্তের) আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।[৮] বলদেবের মতে ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।[৯]

১। শ্রীভাষ্য, ১।১।১
২। ঐ, ১।১।১; আর দ্রষ্টব্য রামানুজের গীতাভাষ্য, ৭।১
৩। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৬০-২
৪। শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ সম্পাদিত পৃঃ ২৪৭, দ্রষ্টব্য)
৫। শ্রীভাষ্য, ৩।২।৩৭
৬। শ্রীভাষ্য, ৩।২।৪০
৭। শ্রীভাষ্য, ৪।১।৩
৮। গোবিন্দভাষ্য, ৩।৩।৩২
৯। গোবিন্দভাষ্য, ৩।৩।৫৪র মুখবন্ধ

তাঁহার মতে, প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা; তদ্দ্বারা নিজের স্বরূপের বোধ, পরমাত্মস্বরূপের বোধ ও উভয়ের সম্বন্ধবোধ জন্মে; তারপর তদিতরে বৈতৃষ্ণ্য-পূর্ব্বিকা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে প্রিয়রূপে বরণ করে এবং তাহা হইতে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।[১] হ্লাদিনী-সারসমবেত-সংবিদের নামই ভক্তি। 'বেদে'ও ভক্তিকে সচ্চিদানন্দস্বরূপই বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'ভক্তি'কে সচ্চিদানন্দস্বরূপ না বলিলে ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে বশ করা সম্ভব হইত না। ভক্তি সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও ভক্তের দেহাদির সহিত তাদাত্ম্য সম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হয় এবং কার্য্য সাধন করে।[২] ভক্তির কার্য্য হইল জড়দেহে উদিত হইয়া জীবকে তাহার অভীষ্ট লাভ করান। বলদেবের মতে মুক্তির ভক্তিই মুখ্যসাধন। জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সহকারিসাধন। উপাসনার ফলেই ভগবান্ প্রীত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'ভগবান্ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে স্বীয়পদ অর্পণ করেন না, সুতরাং জ্ঞানবান্ ঐসমস্ত সাধন অবলম্বন করিবেন'—"ন বিনা সাধনৈর্দেবো জ্ঞান-বৈরাজ্ঞ-ভক্তিভিঃ। দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ" ॥[৩]

ভক্তি মুক্তি হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ

কেহ কেহ (মধুসূদন সরস্বতী, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী এবং কবিরাজগোস্বামী প্রভৃতি) মনে করেন যে, ভক্তি কেবল ভগবৎ-প্রাপ্তির বা তত্ত্বজ্ঞানলাভের সুগম ও শ্রেষ্ঠ-সাধনমাত্র নহে, উহা সাধ্যও; উহা মুক্তি* অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। ঐ অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, "(নির্গুণভক্ত) জনগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব (বা সাযুজ্য) মুক্তি, এমন কি প্রদত্ত হইলেও, গ্রহণ করে না। সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়"।[৪] ভগবান্ কৃষ্ণও সেইপ্রকার বলিয়াছেন, "যাহার চিত্ত (একমাত্র) আমাতেই অর্পিত; (সেই একান্ত ভক্ত) আমাকে বিনা অপর কিছুরই বাঞ্ছা করে না। ব্রহ্মের পদ, ইন্দ্রের পদ, সার্ব্বভৌম রাজ্য, সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য, কিম্বা যোগসিদ্ধি, এমন কি, মোক্ষও ("অপুনর্ভবং") সে বাঞ্ছা করে

১। গোবিন্দভাষ্য, ৩।৩।৫৪

২। ঐ, ৩।৪।১২ ও দ্রষ্টব্য তাঁহার 'সিদ্ধান্তরত্ন', ১ম পাদ, পৃঃ ৬০

৩। গোবিন্দভাষ্য ৩য় অধ্যায়, প্রারম্ভ শ্লোক * কৈবল্যমুক্তি

৪। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ৩।২৯।১৩-১৪

না"।[১] "কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম, তথা শ্রেয়প্রাপক অপর সাধনসমূহদ্বারা, যাহা কিছু—স্বর্গ, অপবর্গ, কিংবা আমার পরমধাম পাওয়া যায়, তৎসমস্তই আমার ভক্ত, যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা করে, আমার ভক্তি-যোগদ্বারা অনায়াসে শীঘ্রই এবং সম্পূর্ণতঃ পাইতে পারে। (পরন্তু) ধীর ও সাধু, আমার একান্ত-ভক্তগণ কিছুই বাঞ্ছা করে না; এমন কি আমি দিলেও, অপুনর্ভব-কৈবল্যও বাঞ্ছা করে না"।[২] ঐ প্রকার বচন 'বিষ্ণুভাগবতপুরাণে' আরও কতিপয় আছে। যথা, ভগবান্ বিষ্ণু বলেন, "(আমার ভক্তগণ) আমার সেবাদ্বারা পূর্ণকাম। তাই আমার সেবার দ্বারা প্রাপ্য সালোক্যাদি (মুক্তি) চতুষ্টয়কেও তাহারা ইচ্ছা করে না। কালে বিনষ্টশীল অপর পদার্থের কথা আর কি?"[৩] মহর্ষি মৈত্রেয় বলিয়াছেন, ভগবানের একান্তভক্তের সর্ব্বার্থ "ভগবদীয়ত্বেন" (অর্থাৎ ভগবানের নিজজন হইয়া যাওয়াতে) নিশ্চয় পরিসমাপ্ত হয়। সুতরাং সে পরম নির্বৃত্তি লাভ করে। সেই হেতু সে অপর কিছুই আশা করে না। এমন কি, আত্যন্তিক পরমপুরুষার্থ—অপবর্গকেও, স্বয়ং উপস্থিত হইলেও, সে আদর করে না।[৪] তিনি আরও বলিয়াছেন, "ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ন ভক্তিযোগম্"।[৫] 'ভগবান্ মুকুন্দ আপন ভক্তগণকে কখন কখন মুক্তি দিয়া দেন, পরন্তু ভক্তিযোগ দেন না'। তাহাতে তিনি ভক্তিকে মুক্তি অপেক্ষা দুর্লভ এবং শ্রেষ্ঠা বলিয়াছেন। ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন, "মহতাং মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ"।[৬] 'মধুসূদনের সেবায় অনুরক্তচিত্ত মহাপুরুষের দৃষ্টিতে অপুনর্ভবও ব্যর্থ'। কৃষ্ণকে স্তুতিপ্রসঙ্গে নাগপত্নীগণ বলেন, "যাহারা তোমার চরণরজের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ব্রহ্মের পদ, স্বর্গলোক, সার্ব্বভৌমরাজ্য, সমস্ত-ভূমণ্ডলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা অপুনর্ভব, কিছুই বাঞ্ছা করে না"।[৭] মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভকরতঃ তিনি কিছুরই, এমন কি মোক্ষেরও কামনা করিতেন না।[৮] ভগবান্ রুদ্র বলেন, অদ্ভুতকর্ম্মা হরির দাসানুদাস নিস্পৃহ-মহাত্মাদিগের মাহাত্ম্য এই যে, "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ"॥[৯] 'নারায়ণপরায়ণ সকলে কোথা হইতেও ভয়ভীত হয় না।

১। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ১১।১৪।১৪ ২। ঐ, ১১।২০।৩২-৩৪ ৩। ঐ, ৯।৪।৬৭
৪। ঐ, ৫।৬।১৭ ৫। ঐ, ৫।৬।১৮
৬। ঐ, ৫।১৪।৪৪ ৭। ঐ, ১০।১৬।৩৭
৮। ঐ, ১২।১০।৬ ৯। ঐ, ৬।১৭।২৮

কেন না, তাহারা স্বর্গে, অপবর্গে এবং নরকেও তুল্যার্থদর্শী'। অর্থাৎ তাঁহাদের দৃষ্টিতে যেমন স্বর্গ, তেমন মোক্ষও নরকের তুল্য; নরকে গমন যেমন কাহারও অভিপ্রেত নহে, তেমন স্বর্গ কিংবা মোক্ষপ্রাপ্তিও নারায়ণের ভক্তের অভিপ্রেত নহে।

ভক্তি মুক্তিই

তথাপি উপর্য্যুক্ত অনুমান সত্য নহে। কেন না কিঞ্চিৎ বিচার করিলে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি হয় যে, ঐসকল বচনের তাৎপর্য্য প্রকৃতপক্ষে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন নহে; নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ ঐসকল অর্থবাদমাত্র। কেন না, নির্গুণভক্ত বা একান্ত-ভক্ত মুক্তিলাভ করে বলিয়া যেমন কপিল, তেমন কৃষ্ণও[১] ঐ সকল বচনের পরে বলিয়াছেন, "যেনাতিব্রজ্য-ত্রিগুণং মদ্ভাবমুপপদ্যতে"।[২] অর্থাৎ 'আত্যন্তিক ভক্তিদ্বারা গুণত্রয় অতিক্রম করতঃ আমার স্বরূপ হইয়া যায়'। 'মদ্ভাব' শব্দপ্রয়োগ হইতে শঙ্কা করা যায় না যে, ঐ অবস্থায় পরমাত্মার ও মুক্তাত্মার মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ থাকে বলিয়া কপিলের মনে ছিল। কেন না তিনি পরমাত্মার ও জীবাত্মার বাস্তবভেদ মানিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজের ও পরমাত্মার মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ করিয়া থাকে, সেই ভেদদর্শীকে মৃত্যু ঘোর ভয় প্রদান করিয়া থাকে"।[৩] সুতরাং তাঁহার মতে একান্তভক্ত পরমাত্মাই হয়। তিনি অতীব স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন, ভক্ত তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভক্তিদ্বারা ভগবানের সহিত ঐকাত্ম্য লাভ করে। "আমার পাদসেবায় অভিরত এবং মদর্থে কর্ম্মকারী কেহ কেহ আমার সহিত ঐকাত্ম্য স্পৃহা করে না। ঐ সকল ভাগবত একত্রিত হইয়া প্রেমসহকারে আমার পৌরুষ কর্ম্মসমূহ পরস্পর আলোচনা করে। হে মাতঃ! ঐ সকল ভক্ত আমার প্রীতিপ্রদ ও বরপ্রদ প্রসন্নবদন এবং অরুণলোচনযুক্ত দিব্যরূপসমূহ দর্শন করিতে থাকে এবং উহাদের সহিত স্পৃহণীয় বাণী বলে। ঐ সকল দর্শনীয় অঙ্গাবয়ব, উদার হাস্যবিলাস, মনোহর বামকটাক্ষ এবং মধুরবাণীদ্বারা হতচিত্ত এবং হতপ্রাণ-ব্যক্তিগণকে আমার ভক্তি, তাহারা ইচ্ছা না করিলেও আমার সূক্ষ্মগতি অর্থাৎ আমার নির্গুণ নির্বিবশেষ স্বরূপের সহিত

১। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ১১।২০।৩৭ ২। ঐ, ৩।২৯।১৪

৩। "আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্"। ঐ, ৩।২৯।২৬

একীভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করায়"।[১] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, মর্ত্য মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।[২] ভক্তিযোগের চরমধ্যেয় যে মুক্তিলাভ, তাহা অপরেও বলিয়াছেন। যথা, নারদ বলেন, "যে ইন্দ্রিয়রতিতে বিরক্ত তাহার উচিত মুক্তির জন্য আত্যন্তিক ভক্তিযোগদ্বারা ভগবানের ভজন করা"।[৩] স্বায়ম্ভুব মনু বলেন, মানুষের ভক্তিদ্বারা "সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" ॥[৪] 'ভগবান্ সম্যক্ প্রসন্ন হইলে মনুষ্য প্রাকৃত গুণসমূহ হইতে বিমুক্তি লাভ করতঃ জীবভাব হইতে নির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে'। কথিত হইয়াছে যে, নিষ্কিঞ্চন এবং আত্মারাম মুনিবর্গ অপবর্গলাভার্থ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক প্রোক্ত ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করেন।[৫] সুতরাং ভাগবতের মতে চরম লক্ষ্য জীবকে মুক্তি প্রদান করা। তথাপি কপিল ও কৃষ্ণাদি যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত রহস্য এই যে, সর্ব্বোত্তম ভক্তি, কপিলের কথায়, "অনিমিত্তা"[৬], "অহৈতুকী" এবং "অব্যবহিতা"।[৭] আর কৃষ্ণের কথায়, "নিরাশীষ" এবং "নিরপেক্ষ",[৮] "অনপেক্ষিত"[৯] হইতে হইবে। 'গীতা'তেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলে, তাহা গ্রহণ করিলে পাছে কামনা প্রকাশ পায়, ভক্তি সকারণ ও সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, তাই বলা হইয়াছে যে, তাহা গ্রহণ করে না। পরমভাগবত প্রহ্লাদ এমনও বলিয়াছেন যে, যেমন ভগবান্ হইতে কিছু পাইবার বাঞ্ছা করা ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে উচিত নহে, তেমন তাহাকে কিছু দিতে যাওয়া ভগবানের পক্ষে উচিত নহে। "যে তোমার নিকট হইতে কোন কামনার (পূর্তির) আশা রাখে সে ভৃত্য নহে, সে নিশ্চয়ই বণিক্, কারণ তোমার সেবার বিনিময়ে কিছু চায়। স্বামী হইতে আপন কামনার প্রাপ্তির আশাকরী ভৃত্য নিশ্চয় ভৃত্য নহে। আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত এবং তুমিও আমার অপাশ্রয়রহিত (অভিসন্ধিশূন্য) স্বামী। ইহা ব্যতীত আমাদের মধ্যে রাজা ও সেবকের (সম্পর্কের) ন্যায় অপর কোন প্রকার অর্থ (কামনা)

১। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।২৫।৩৪-৩৬ ২। ঐ, ১১।২৯।৩৪
৩। ঐ, ৪।৮।৬১ ৪। ঐ, ৪।১১।১৪
৫। ঐ, ৬।১৬।৪০ ৬। ঐ, ৩।২৫।৩৩
৭। ঐ, ৩।২৯।১২
৮। ঐ, ১১।২০।৩৫ ; আর দ্রষ্টব্য ১১।২০।৩৭
৯। ঐ, ১১।১৪।২

নাই"।[১] মোক্ষে আসক্তি ত্যাগের উল্লেখ অন্যত্রও আছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে উহা 'গীতা'য়ও আছে। তথায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে ব্রহ্মে অর্পণ করতঃ এবং সঙ্গ ত্যাগ করতঃ কর্ম্মসমূহ করে, সে কর্ম্মজ পাপসমূহদ্বারা লিপ্ত হয় না"।[২] শঙ্কর মনে করেন যে, এই বচনে কৃষ্ণ কর্ম্মযোগীর মোক্ষরূপ ফলেও সঙ্গত্যাগ কর্ত্তব্য বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন—"মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা"। "যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে' মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "আত্মমৌনী বিদ্বান্ বন্ধ এবং মোক্ষ উভয় কল্পনা পরিত্যাগ করতঃ যন্ত্রচালিতের ন্যায় ব্যবহার করিবেন"।[৩] যেমন বন্ধবুদ্ধি এবং এষণা, তেমন মোক্ষবুদ্ধিও তাঁহার মতে, "তুচ্ছ"।[৪] মোক্ষের আকাঙ্খা উৎপন্ন হইলেই মন সবল হয়; আর মন ও মননের প্রবলতায় শরীর উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহাতে মোক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না।[৫] প্রকৃত কথা, তাঁহার মতে, "স্ববৈরাগ্যবিবেকাভ্যাং কেবলং ক্ষপয়েন্মনঃ"।[৬] অর্থাৎ 'নিজবৈরাগ্য এবং বিবেকদ্বারা মনকে নাশ করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য'। কোন বস্তুকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে, মনন করিলে, মনোনাশ হইতে পারে না। অধিকন্তু, তাঁহার মতে, মোক্ষ নিত্যপ্রাপ্ত। সুতরাং উহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা মূর্খতা। "হে রাম! যাবৎ পর্য্যন্ত বিমল-প্রবোধ উদিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সে (মনুষ্য) মূর্খতা, দীনতা এবং ভক্তি বশতঃ মোক্ষের অভিলাষ করে"।[৭]

কেবল নিজেরই মুক্তির প্রচেষ্টাকে প্রহ্লাদ স্বার্থপরতা বলিয়াছেন। ভগবান্ নৃসিংহের স্তুতিতে তিনি বলিয়াছেন, "প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ সবিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ। নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষুরেকঃ..."।[৮] 'হে দেব! প্রায় মুনিগণ আপনারই মুক্তি কামনায় একান্তে বসিয়া মৌন আচরণ (বা মনন) করেন। পরের হিত কামনায় তাঁহাদের নিষ্ঠা নাই। পরন্তু এই দুঃখী (সংসারী) জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একেলা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না'। ইহা বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, এই বাক্যে প্রহ্লাদ মুমুক্ষুতামাত্রকে নিন্দা করেন নাই। উহা হইতে বরং বুঝা যায় যে তিনি মুমুক্ষু। ঐ বচনের পূর্ব্বে, তথা পরেও, তিনি অতীব পরিষ্কার-বাক্যে সেই কথাই বলিয়াছেন। "হে দীনবৎসল! স্বকর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া যাহাতে আমি গ্রাহকারীদিগের (মকরদিগের) মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি,

১। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৭।১০।৪-৬ ২। গীতা, ৫।১০
৩। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ; ৫।৭৩।৩৪ ৪। ঐ, ৫।৭৪।৮
৫। ঐ, ৫।৭৪।৯ ৬। ঐ, ৫।৭৪।৮
৭। ঐ, ৫।৭৩।৭৭ ৮। ভাগবতপুরাণ, ৭।৯।৪৪

সেই উগ্র এবং দুঃসহ সংসারচক্রের নিপীড়ন হইতে আমি ভীত হইয়াছি। হে শ্রেষ্ঠতম! তুমি প্রীত হইয়া কখন আমাকে তোমার মোক্ষৈকশরণ-পাদমূলে আহ্বান করিবে"।[১] "তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ"।[২] অর্থাৎ 'সাংসারিকভোগের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি দেখিয়া ভীত হইয়া নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া আমি মোক্ষকামনায় তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি'। তবে সংসারদুঃখে নিপতিত অপর জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি একা মুক্ত হইতে চাহেন নাই। তাই সমস্ত জীববর্গকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।[৩] "নান্যং ত্বদন্যশরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে"।[৪] অর্থাৎ 'সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ এই জীবগণের মুক্তির জন্য তুমি ব্যতীত অপর কোন শরণযোগ্য ব্যক্তি আমি দেখিতেছি না'। এই সকল উক্তিদৃষ্টে বলা যায় না যে, প্রহ্লাদ মুক্তি চাহেন নাই। ঐ বচনে তিনি ভগবানের নিকটে আপনার ন্যায় সকল প্রাণীরই মুক্তি কামনা করিয়াছেন। সুতরাং উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য করুণার বা সর্ব্বভূতহিতে রতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভাবপ্রবণব্যক্তির ভাবোক্তির আতিশয্য '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' তথা অন্যত্র আরও দেখা যায়। যথা-করুণামূর্ত্তি মহাত্মা রন্তিদেব একসময় বলেন, "আমি ভগবানের নিকটে অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত পরাগতি কিংবা অপুনর্ভব কামনা করি না। আমি নিখিল দেহ-ধারিগণের অন্তঃকরণে স্থিত থাকিয়া উহাদের দুঃখ সহন করিতে চাহিতেছি, যাহাতে উহারা দুঃখরহিত হয়"।[৫] মহাত্মা শিবি সেইপ্রকার বলেন, "আমি রাজ্য কামনা করি না; স্বর্গও না, মোক্ষও না। দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখনাশ আমি কামনা করি"। ভগবান্ রুদ্র বলেন, "ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গের ক্ষণার্দ্ধের সহিত আমি স্বর্গের তুলনা করি না; অপুনর্ভবেরও নহে। সুতরাং মনুষ্য-দিগের ভোগের কথা আর কি"?[৬] প্রচেতাগণও প্রায় সেইপ্রকার কথাই বলিয়াছেন।[৭]

আর একটা কথা বলা উচিত। ঐ সকল ভক্তগণ যাহাকে ভক্তির পরম উৎকর্ষতা বা পরাভক্তি বা সাধ্যভক্তি বলেন, যাহাতে বা যে অবস্থায় মুক্তিরও

১। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৭।৯।১৬ ২। ঐ, ৭।১০।২

৩। ঐ, ৭।৯।৪১-৪২ ৪। ঐ, ৭।৯।৪৪

৫। "ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরমষ্টর্দ্ধিযুক্তমপুনর্ভবং বা। আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ"। বিষ্ণু ভাগবতপুরাণ, ৯।২১।১২

৬। ঐ, ৪।২৪।৫৭ ৭। ঐ, ৪।৩০।৩৪

আকাঙ্খা থাকে না, তাহাও প্রকৃতপক্ষে মুক্তিই।[১] বিষ্ণুভাগবতপুরাণের কোন কোন স্থলে তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যথা, উহার একস্থলে ভগবান্ শুকদেব অপবর্গের স্বরূপ এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "বাসুদেব সর্ব্বভূতের পরমাত্মা। তিনি রাগাদিশূন্য। তিনি বাক্যের অগোচর। তিনি আধারশূন্য। তাদৃশ পরমাত্মরূপী ভগবান্ বাসুদেবে ফলাভিসন্ধিশূন্যা ভক্তি (অপবর্গ) তখনই লাভ হয়, যখন নানাগতির কারণ অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদন বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্গবশতঃ হয়"।[২] আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদনেই যখন ভক্তি লাভ হয়, তখন উহা (ভক্তি) মুক্তিই; কারণ শাস্ত্রাদিতে অবিদ্যানাশকেই মুক্তি বলা হইয়াছে। মহাভাগবত প্রহ্লাদ ভগবৎসাক্ষাৎকারকেই অপবর্গ মনে করিতেন দেখা যায়, কেন না দৈত্যবালকগণকে তিনি বলেন, "হে দৈত্যগণ! সেইহেতু বিষয়পরায়ণ দৈত্যগণের সঙ্গ অতি দূরে অথবা শীঘ্র পরিত্যাগ করতঃ আদিদেব নারায়ণের সমীপে উপনীত হও। কেন না, সেই অপবর্গ মুক্তসঙ্গ ব্যক্তিগণের ইষ্ট"।[৩] মহাত্মা সূতও সেই প্রকার বলিয়াছেন, "জীব যে এই প্রকারে এই বিবেকরূপ অস্ত্রদ্বারা মায়াময় অহংকরণরূপ আত্মবন্ধন ছিন্ন করতঃ অচ্যুতাত্মাকে অনুভব করতঃ অবস্থান করে, তাহাকেই, হে অঙ্গ! পণ্ডিতগণ আত্যন্তিক সংপ্লব বলেন"।[৪] আত্যন্তিক সংপ্লব' বা 'লয়' শব্দের অর্থ মুক্তিই।[৫] ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই পরাপ্রীতি বা প্রেমাভক্তি।[৬] সুতরাং প্রেমাভক্তি মুক্তিই। গজেন্দ্র ভগবান্‌কে 'অপবর্গ' বলিয়াছেন।[৭] কেহ কেহ ভগবচ্চরণকে "অপবর্গশরণ" অপবর্গভূত শরণ"[৮] (মুক্তদিগের শরণ[৯]) বলিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে ভবেরই অপবর্গ হয়। ভবাপবর্গার্থ লোকে ভগবান্‌কে ভজন করে বা

১। S. K. De : Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal, p. 296 ২। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৫।১৯।১৯

৩। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৭।৬।১৮; তাঁহার মতে ঐ আদিদেব কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বর, ঐ, ৭।৬।২৭ ৪। ঐ, ১২।৪।৩৪

৫। "আত্যন্তিকশ্চ মোক্ষাখ্যঃ"—ঐ, ৬।৩।২
"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।
ভৈষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকা আত্যন্তিকী মতা" ॥ ঐ, ৬।৫।৫৯
এই সকল প্রমাণ মূলে জীবগোস্বামীও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'আত্যন্তিক-সংপ্লব' মুক্তিই। 'প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', পৃঃ ৬৭৪); আর দ্রষ্টব্য 'তত্ত্বসন্দর্ভ' (ঐ, পৃঃ ৪৭)।

৬। দ্রষ্টব্য 'প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', পৃঃ ৬৭৫-৬)

৭। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৮।৩।১৫

৮। ঐ, ৭।৯।১৬ (প্রহ্লাদ বলিয়াছেন) ৯। ঐ, ৪।৯।৮ (ধ্রুব বলিয়াছেন)

তাঁহার শরণ গ্রহণ করে।[১] যেহেতু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব ভবের অপবর্গ করে বা অপবর্গ লাভ করে, সেইহেতু তিনি অপবর্গ। রুক্মিণী তাঁহাকে "অন্বতাপবর্গ" (অন্বতের বা সংসারের অপবর্গ বা নাশ) বলিয়াছেন।[২] কৃষ্ণের নিজের উক্তিমতে তিনি "অপবর্গেশ" ও "অপবর্গসম্পদ্"।[৩]

ঐ সকল বচন আচার্য্য জীবগোস্বামীও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪] তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম বচনের (শুকদেবের উক্তির) তাৎপর্য্য এই যে, "অপবর্গো ভক্তিঃ" ('ভক্তি অপবর্গ ই')। উহার সমর্থনে তিনি দুইটি পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৫] উহাদের একটি 'স্কন্দপুরাণে'র রেবাখণ্ডের, "নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জ্জনার্দ্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো-যতো হরে" ॥ 'হে জনার্দ্দন! যাহা তোমাতে নিশ্চলা ভক্তি, তাহা নিশ্চয় মুক্তি। কেন না, হে বিষ্ণু! হে হরি! মুক্তগণই তোমার প্রকৃত ভক্ত'। অপরটি 'পদ্মপুরাণে'র উত্তরখণ্ডের, "বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।" 'বিষ্ণুর অনুচরত্বকেই মনীষিগণ মোক্ষ বলেন'। জীবগোস্বামী বলেন, উক্ত দ্বিতীয়-বচনে প্রহ্লাদ 'শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের মুক্তিত্ব' খ্যাপন করিয়াছেন। ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্ত্তব্য যে, ঐ প্রথমোদ্ধৃত-বচনে শুকদেব বলিয়াছেন যে, সংসৃতির হেতুভূত অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদনপূর্ব্বক ঐ পরাভক্তি লাভ হয়।[৬] অবিদ্যা এবং তজ্জনিত সংসৃতির বিনাশকেই মুক্তি বলা হয়। তাই ঐ পরা-ভক্তিকে মুক্তি বা অপবর্গ বলা হইয়াছে।[৭] অপরেও সেইপ্রকার বলিয়াছেন। যথা, মহাভাগবত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, মহদ্-ভক্তিযোগদ্বারা মনুষ্যের "বীজানুশয়" সমূলে বিনষ্ট হয় এবং অধোক্ষজের সম্যক্ প্রাপ্তি হয়; "অধোক্ষজালম্ভ, ইহসংসারে অশুভাত্মা শরীরীদিগের সংসৃতিচক্র, বিদ্বদ্গণ জানেন, তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ আনন্দ ("তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ")।[৮]

১। ভাগবতপুরাণ ১০।৬৩।৪৪ ; ১০।৬৪।২৬ ২। ঐ, ১০।৬০।৪৩

৩। ঐ, ১০।৬০।৫২, ৫৩

৪। ভক্তিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৫৩); ভগবৎসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ১৭৬) ; প্রীতিসন্দর্ভ (ঐ, পৃঃ ৬৭৪, ৬৮৪, ৬৯৭)

৫। ভক্তিসন্দর্ভ (ঐ, পৃঃ ৪৫৩) ; প্রীতিসন্দর্ভ (ঐ, পৃঃ ৬৯৭)

৬। ভক্তি যে (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণের মতে অবিদ্যাবিনাশের স্বতন্ত্র মার্গ, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

৭। জীবগোস্বামী বলিয়াছেন, "এষ এব চ মুক্তিশব্দার্থঃ, সংসারবন্ধচ্ছেদপূর্ব্বকত্বাৎ"। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, ৬৭৪ পৃষ্ঠা)

৮। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৭।৭।৩৬-৩৭

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' কিঞ্চিৎ প্রকারান্তরেও বলা হইয়াছে যে, পরাভক্তি মুক্তিই। যথা, ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, "স্বাভাবিকী ও অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি" তাহাই "জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা"—'যাহা দেহকোশকে সত্বর জীর্ণ করে, যেমন জঠরের অনল ভুক্তদ্রব্যকে জীর্ণ করে'।[১] "যেনাতিব্রজ্য-ত্রিগুণং মদ্ভাবমুপপদ্যতে"।[২] 'যাহার দ্বারা (জীব) ত্রিগুণ অতিক্রম করতঃ মদ্‌ভাব অর্থাৎ ভগবদ্‌ভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়'। মহারাজ পৃথু বলিয়াছেন, যে ভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়াছে, তাহার সমস্ত মনোমল নিঃশেষে ধৌত হইয়া যায়; সে (বিষয়ে) অসঙ্গ এবং ভগবানের বিজ্ঞান ও সাক্ষাৎকার যুক্ত হয়; এবং "ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যন্তে"।[৩] 'ক্লেশপ্রদ সংসৃতি প্রাপ্ত হয় না'। ঋষভদেব পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"।[৪] অর্থাৎ 'যাবৎ পর্য্যন্ত বাসুদেবে প্রীতি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত হয় না'। সুতরাং তাঁহার মতে বাসুদেবে প্রীতি হইলে, দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয়। যেহেতু পরাভক্তি হইলে দেহবন্ধন বিনষ্ট হয়, আর সংসৃতি প্রাপ্ত হয় না এবং ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, সেই হেতু উহা মুক্তিই। তাই পরাভক্তিকে "নিঃশ্রেয়স", "নিবৃত্তিঃ," "পরমা-নিবৃত্তি" প্রভৃতিও বলা হয়। ঐ সকল সংজ্ঞা সাধারণতঃ মুক্তিকে বুঝায়। দেবহুতি বলিয়াছেন যে, ভক্তিদ্বারা নির্ব্বাণরূপ ভগবৎপদ শীঘ্র লাভ হয়।[৫]

আরও একটি কথা এখানে বিবেচ্য। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে, "নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য", 'লোকের নিঃশ্রেয়সার্থই' পরমর্ষি ব্যাস উহাকে রচনা করিয়াছিলেন।[৬] উহার উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, উহা 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং"—অর্থাৎ 'উহার প্রয়োজন একমাত্র কৈবল্য';[৭] ভক্তিসহকারে উহার শ্রবণ, পঠন ও বিচার-পরায়ণ মনুষ্য বিমুক্ত হয়।[৮] উহা শ্রবণের পর মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলেন যে, তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন; হে ভগবন্! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুসমূহ হইতে আর ভয় করি না, কেন না, আমি আপনার দ্বারা প্রদর্শিত অভয় এবং নির্ব্বাণ-ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি।[৯] টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে, ঐ নির্ব্বাণ কৈবল্যরূপ; সেই হেতু তাহা অভয়। সুতরাং তাঁহার নিজের উক্তিমতে পরীক্ষিৎ সিদ্ধিলাভ

১। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।২৫।৩৩ ২। ঐ, ৩।২৯।১৪
৩। ঐ, ৪।২১।৩২ ৪। ঐ, ৫।৫।৬
৫। ঐ, ৩।২৫।২৮ ৬। ঐ, ১।৩।৪০ ৭। ঐ, ১২।১৩।১২
৮। ঐ, ১২।১৩।১৮ ৯। ঐ, ১২।৬।৫

করেন, নির্ব্বাণ বা কৈবল্য লাভ করেন, ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। সূত বলিয়াছেন যে, তিনি (পরীক্ষিৎ) ব্রহ্মভূত হন।[১] তারপর ইহা কথিত হইয়াছে যে, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র দশলক্ষণের একটি লক্ষণ মুক্তি।[২] এইরূপে উপক্রম ও উপসংহার, তথা লক্ষণনির্দ্দেশ ও দৃষ্টান্ত হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে নিঃশ্রেয়স, কৈবল্য, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত করান, তাহাকে ব্রহ্মে প্রবেশ করান বা ব্রহ্মভূত করান। উহার উদ্দেশ্য মানুষকে পরাভক্তি লাভ করান বলিয়া, কিংবা উহার লক্ষণ পরাভক্তি বলিয়া কোথাও পরিষ্কার বলা হয় নাই। মুক্তির স্বরূপ উহাতে এই প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে, "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"।[৩] '(অবিদ্যাকর্ত্তৃক অধ্যস্ত) অন্যথারূপ পরিত্যাগ করতঃ স্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি'। উহাই কৈবল্য। কেন না, ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন, "আমার ভক্ত ধীরব্যক্তি, আমার মহৎপ্রসাদে, আত্মসাক্ষাৎকারদ্বারা ছিন্নসংশয় ও প্রজ্ঞাবান্ হইয়া, অনায়াসে কৈবল্যাখ্য স্বসংস্থান (অর্থাৎ স্বস্বরূপে সম্যক্ অবস্থান) এবং মদাশ্রয়-নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গশরীর নাশ হয় বলিয়া তাহাতে গমন করিয়া (অর্থাৎ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) যোগী ইহসংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না।[৪] ভগবান্ বলিয়াছেন, "যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ। স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি"॥[৫] 'মানুষ যখন নিজেকে ভূতেন্দ্রিয় গুণাশয়রহিত এবং (সেই) স্বরূপে আমার সহিত একীভূত বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন স্বারাজ্য লাভ করে (অর্থাৎ স্বীয় চিৎস্বরূপে স্থিত হয়)'।[৬] উহাই মুক্তি।

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রকৃতি হইতে পর," "পরাবরসমূহের পরম" তত্ত্ব আত্মাই কৈবল্য। তাহা নিরুপাধিক বলিয়া কেবলানুভবানন্দস্বরূপ। সেইহেতু তাহাকে 'কৈবল্য' বলা হয়। মানুষ মায়াকে অতিক্রম করিয়া ঐ কৈবল্যস্বরূপ আত্মায় স্থিত হয়।[৭] যেহেতু তাহা পরমতত্ত্ব, সেইহেতু তাহা হইতে শ্রেষ্ঠগতি মানুষের আর হইতে পারে

১। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ১২।৬।১০, ১৩
২। ঐ, ২।৯।৪৩ ; ২।১০।১-২
৩। ঐ, ২।১০।৬
৪। ঐ, ৩।২৭।২৮-২৯
৫। ঐ, ৩।১০।৩৩
৬। "তদা চ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ মুচ্যতে ইত্যাহ যদেতি। ভূতাদিভির্বিরহিতমাত্মানং জীবং শুদ্ধত্বং পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্যাত্মভূতেন ময়া তৎপদার্থেন উপেতমেকীভূতং পশ্যন্ ভবতি তদা স্বারাজ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি"। শ্রীধরস্বামী
৭। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ১।৭।২৩ ; ১১।৯।১৮

না। তাই ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন, উহা মানুষের "আত্যন্তিকী গতি"।[১] আচার্য্য জীবগোস্বামী 'কৈবল্য' সংজ্ঞার একাধিক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'কেবল' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ'; উহার ভাব, অর্থাৎ শুদ্ধত্বই কৈবল্য। পরমতত্ত্বের জ্ঞানই শুদ্ধত্ব। সুতরাং 'কৈবল্য'শব্দের তাৎপর্য্য "পরমতত্ত্বজ্ঞানানুভব"। অথবা পরমের স্বভাবই 'কৈবল্য' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হয়। যেমন 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্মেশানাদিভির্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে। স যৎস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরে"॥ 'ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতিও যাঁহাকে পাইতে সমর্থ হয় না, তিনি যৎস্বভাব তাহা কৈবল্য। হে হরি! সেই তুমিই কেবল'। কখন কখন স্বার্থিকতদ্ধিতান্ত-দ্বারা পরমকে কৈবল্য বলা হইয়াছে। যথা 'শ্রীদত্তাত্রেয়শিক্ষায়' আছে, "কেবলানুভবানন্দসন্দোহ নিরুপাধিকঃ" ইত্যাদি।[৩] "তথাপি উভয়-প্রকারেই তাৎপর্য্য নিশ্চয় তদনুভবই, অথবা তৎস্বভাবই। উহাকে অনুভব করাইতেই এই শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে"।[৪] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,[৫] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র "কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" বাক্যের 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ যদি 'শুদ্ধত্ব' করা হয়, তবে উহার তাৎপর্য্য 'ভগবৎপ্রীতি'ই হইবে; কেন না, "তৎপ্রীতিরেকতাৎপর্য্যা এব পরমশুদ্ধা"। পূর্ব্বে 'ভক্তিসন্দর্ভে'ও 'শুদ্ধ' শব্দদ্বারা ঐকান্তিক 'ভক্তি'ই (অভিহিত হইয়াছে বলিয়া) প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৬] অথবা ঐখানে 'কৈবল্য' শব্দদ্বারা যদি ভগবান্ই কিংবা তৎস্বভাবই উক্ত হইয়া থাকে, তথাপি "প্রীতিমতামেব", 'প্রীতিমান্‌দিগেরই'। কেন না, ভক্তের "প্রীতিতেই বিশ্রান্তি" হয়। "বস্তুতস্তু উক্তন্যায়েন কৈবল্যাদিশব্দাঃ শুদ্ধভক্তি-বাচকতাপ্রধানা এব", 'পরন্তু উক্ত যুক্তিতে কৈবল্যাদি-শব্দসমূহ বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তি-বাচকতাপ্রধানই'। "যথাবর্ণাবধানমপবর্গশ্চ" ইত্যাদি বচনে তাহাই বলা হইয়াছে।[৭] একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, কৈবল্য = "মোক্ষাখ্য শ্রীবৈকুণ্ঠলক্ষণ আত্মা"।[৮] ইহাও বলা উচিত যে, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' মুক্তিকে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে ভিন্নও বলা হইয়াছে। কেন না, কথিত হইয়াছে যে, উহার

১। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।২৭।২৯ ২। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

৩। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ১১।৯।১৮ ৪। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৭৭)

৫। ঐ, („ পৃঃ ৬৯৬-৭)

৬। 'কৈবল্য' শব্দে অভিহিত 'শুদ্ধত্ব' তাৎপর্য্যতঃ "শুদ্ধভক্তত্বে" পর্য্যবসিত হয়। 'প্রীতিসন্দর্ভে' তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৩৮)

৭। উদ্ধৃত প্রতীক '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র বচনেরই, ৫।১৯।১৮-১৯

৮। ভগবৎসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৪)

দশ-লক্ষণের, দশমলক্ষণটি 'আশ্রয়,' নবম লক্ষণ 'মুক্তি'[১], পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই 'আশ্রয়' বলিয়া অভিহিত হয়,[২] স্বর্গাদি মুক্তি পর্য্যন্ত নব লক্ষণ, দশমলক্ষণ পরমাত্মার "বিশুদ্ধ্যর্থ"ই ; মহাত্মগণ শ্রুত্যাদিতে তাহা পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, অবিদ্যা এবং তজ্জনিত দেহাদি, তথা কর্ম্মাদিদ্বারা আত্মা বন্ধনগ্রস্ত হয় ; আর ঐসমস্ত অপগত হইলে মুক্ত হয়। সুতরাং অবিদ্যাদি বন্ধন হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। অবিদ্যাদি আত্মার স্বরূপগত নহে। উহারা আগন্তুক এবং জীবের প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে। সুতরাং উহাদের দ্বারা জীব বন্ধনগ্রস্ত হয়। তাই উহাদের হইতে মুক্ত হইলে জীব আপন স্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মুক্তির ফলে স্বরূপপ্রাপ্তি হয়। স্বরূপপ্রাপ্তির সাধন মুক্তিকেই আবার স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। অবিদ্যাদি হইতে মুক্ত হইলে আত্মা কেবল হয়। সুতরাং মুক্তি বা স্বরূপপ্রাপ্তি, কৈবল্যপ্রাপ্তি বা কৈবল্য। মুক্তজীব পরমাত্মা হয়। সুতরাং পরমাত্মা-ভবনই স্বরূপপ্রাপ্তি বা মুক্তি। অতএব কখন কখন বলা হয় যে, পরমাত্মাই কৈবল্য।

এইরূপে পুনরায় প্রদর্শিত হইল যে, ('বিষ্ণু') ভাগবতপুরাণে পরাভক্তিকে কখন কখন মুক্তির সাধন, আর কখন কখন বা মুক্তি স্বয়ংই বলা হইয়াছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[৪] আচার্য্য জীবগোস্বামীও তাহা মানেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার কতিপয় উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইখানে আবার অপর কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। যথা, ভগবান্ কপিল-কর্তৃক ব্যাখ্যাত নির্গুণভক্তির সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "তস্মাৎ স এব চাত্যন্তিকফলতয়া ভবতীত্যপবর্গঃ ইত্যর্থঃ। ...ননু গুণত্রয়াত্যয়পূর্ব্বকভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেৎ তস্যাপি তাদৃশধর্ম্মত্বং সিদ্ধমেব" ইত্যাদি।[৫] অন্যত্রও তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলিয়াছেন। "তস্মাৎ স্বচ্ছচিত্তানামেব (ভগবৎ) সাক্ষাৎকারঃ, স এব চ মুক্তিসংজ্ঞ ইতি স্থিতম্"।[৬] "অথৈতস্যাং ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণায়াং মুক্তৌ জীবদবস্থামাহ" ইত্যাদি।[৭] 'পরমতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারলক্ষণ তজ্‌জ্ঞানই পরমানন্দপ্রাপ্তি। উহা নিশ্চয় "পরমপুরুষার্থ। তাহার

১। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ', ২।৯।৪   ২। ঐ, ২।১০।৭ ; ২।১০।৯

৩। ঐ, ২।১০।২

৪। যথা, তিনি লিখিয়াছেন, "ভক্তের্মুক্তিফলত্বং প্রপঞ্চয়তি" (বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণের ১।২।১৫র টীকা। আর দ্রষ্টব্য ঐ, ৩।২৫।৩৩ ; ৩।২৯।১৪ ; প্রভৃতির টীকা

৫। ভক্তিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৯১-২)

৬। প্রীতিসন্দর্ভ (ঐ, পৃঃ ৬৯০)   ৭। ঐ (ঐ, পৃঃ ৬৯১)

অর্থাৎ পরমতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান নির্বীজরূপে গেলে স্বাত্মজ্ঞাননিবৃত্তি এবং আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি স্বতঃই সম্পন্ন হয়"।[১] ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন, "তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে"[২], অর্থাৎ মোক্ষই পুরুষের আত্যন্তিক অর্থ বা প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়। তদনুসারে, তথা মৈত্রেয়ীর বচন[৩] মূলে জীবগোস্বামী বলেন, "সেই এই মুক্তিই আত্যন্তিকপুরুষার্থ বলিয়া উপদিষ্ট হয়। ··এই প্রকারে পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মক সেই মোক্ষের পরমপুরুষার্থসিদ্ধ হওয়াতে" ইত্যাদি।[৪] ঐ ভগবৎসাক্ষাৎকার বা পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই তাঁহার মতে ভগবৎপ্রীতি বা উহার ফল। তিনি বলেন, "পুরুষপ্রয়োজন সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখনিবৃত্তি পর্য্যন্ত। পরন্তু শ্রীভগবৎপ্রীতিতে সুখত্ব এবং দুঃখনিবর্তকত্ব আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়"।[৫] "সেই প্রীতির দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই প্রীতিব্যতীত তৎস্বরূপের এবং তদ্ধর্ম্মান্তরবৃন্দের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় না। যথায় তাহা আছে, তথায় উহা অবশ্যই সম্পন্ন হয়। যতটা প্রীতি-সম্পত্তি, ততটাই তৎসম্পত্তি। ···ভগবানের এবং তাঁহার গুণবৃন্দের স্বরূপ নিশ্চয় পরমসুখ। আবার সুখ নিরুপাধিক প্রীত্যাস্পদ। সুতরাং তদনুভবে প্রীতিরই মুখ্যত্ব। সেই কারণে পুরুষের উচিত সর্ব্বদা উহারই অন্বেষণ করা। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, উহাতেই পুরুষার্থ পরমতম"।[৬] ঐ ভগবৎপ্রীতিই জীবগোস্বামীর মতে পরা ভক্তি। "ভক্তি প্রীতিলক্ষণা"।[৭] সুতরাং পরাভক্তি মুক্তিই। আনন্দমাত্র ভগবান্ প্রত্যগাত্মায় পরমাভক্তি হইলে অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয়।[৮] অতএব পরাভক্তির ফল মুক্তি।

এইরূপে ভগবৎপ্রীতিকে ও ভগবৎসাক্ষাৎকারকে বারংবার মুক্তি এবং পরমপুরুষার্থ বলা সত্ত্বেও জীবগোস্বামী কখন কখন মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। "অথ মুক্তিভ্যো ভগবৎপ্রীতেরাধিক্যং বিব্রিয়তে"।[৯]

১। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ পৃঃ ৬৭৪) ২। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৪।২২।৩৫

৩। "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—(বৃহ, উ, ২।৪।৩; ৪।৫।৪)

৪। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৭৫)

৫। ঐ, (ঐ, পৃঃ ৬৭৩)

৬। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৭৫-৬)

৭। ঐ, (ঐ, পৃঃ ৬৯৮); আর দ্রষ্টব্য ভক্তিসন্দর্ভ (ভাগবত-সন্দর্ভ, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

৮। (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৪।১১।৩০; ভক্তিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৫১৭)

৯। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৯৬)

ঐ বিষয়ে তিনি একটি প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন, "অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী",[১] 'অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধি বা মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা'। ঐ সকল স্থলে তিনি মুক্তিশব্দকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "অংশের (জীবের) অংশীকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্তি দুই প্রকারে (হয় বলিয়া) যোজনা করিতে হইবে। প্রথম মায়ার বৃত্তি অবিদ্যার নাশের অনন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তি। উহা কেবলতৎস্বরূপ-শক্তিলক্ষণ তদ্বিজ্ঞানের আবির্ভাবমাত্র। উহা, উপাসনার ভেদ অনুসারে, স্বস্থানেই হইতে পারে, অথবা ক্রমে সর্ব্বলোক, সর্ব্ব আবরণ, অতিক্রমণের অনন্তরও হইতে পারে। দ্বিতীয় ভগবৎপ্রাপ্তি। সেই বিভুর অসর্ব্বপ্রকটের তাহাতে আবির্ভাব হইলে পর বৈকুণ্ঠে সর্ব্বপ্রকট সেই বিভুর দ্বারা অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে স্বচরণারবিন্দসান্নিধ্য-প্রাপণ-দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়। তাহা এই প্রকারে স্থিত হওয়াতে ঐ মুক্তি উৎক্রান্তদশায়, তথা জীবদ্দশায়ও হয়"। (দ্রষ্টব্য প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৭৫)।·· এইপ্রকারে পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মক সেই মোক্ষের পরমপুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হওয়াতে পুনরায় বিবেচনা করা যাইতেছে। ঐ পরম-তত্ত্ব দ্বিধা আবির্ভূত হয়,—অস্পষ্টবিশেষত্বরূপে এবং স্পষ্টস্বরূপভূতবিশেষত্বরূপে। তত্র ব্রহ্মাখ্য অস্পষ্টবিশেষ-পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতেও ভগবান্, পরমাত্মা, প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত স্পষ্টবিশেষ তাহার সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ 'ভগবৎ-সন্দর্ভে' প্রদর্শন করা হইয়াছে।[২] এইখানে ও 'প্রীতিসন্দর্ভে' অপর কথায় তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং, তত্রাপি, পরমাত্মাদিলক্ষণনানাবস্থভগবৎ-সাক্ষাৎকারই নিশ্চয় পরম। "তত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চেতি। চিচ্ছক্তিরপি দ্বিধা তদীয়স্বয়ংপ্রকাশবিদ্‌ময়ভক্তিরূপেণ তন্ময়জ্ঞানরূপেণ চ। ততো ভক্তিময়শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি জ্ঞানময়শ্রুতয়ো ব্রহ্মনীতিসামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতম্"।[৩] 'সেই পরমতত্ত্ব ভগবদ্রূপে এবং জ্ঞানরূপে—এই দুইরূপে স্ফুরিত হয়। তদীয় স্বয়ংপ্রকাশাদির ভক্তিরূপে এবং তন্ময়, জ্ঞানরূপে। সেইহেতু ভক্তিময় শ্রুতিসমূহ ভগবানে বিচরণ করে (অর্থাৎ তদ্বিষয়ক), আর জ্ঞানময়

১। ভগবৎসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ১৫৫); অনূদিত বচন কপিলদেবের, (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।২৫।৩১

২। পরেও তিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ 'ভগবৎসন্দর্ভে' প্রদর্শিত হইয়াছে"। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৯০)। আর দ্রষ্টব্য ভগবৎসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ১৪৭)

৩। ভগবৎসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ১৭৮)

শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মে (বিচরণ করে)। সামান্যতঃ ইহা সিদ্ধান্তিত হইল'। "এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌ই অখণ্ড তত্ত্ব। তাদৃশ (অর্থাৎ তাঁহাকে সেই প্রকৃত-স্বরূপে উপলব্ধি করার) যোগ্যতার অভাবহেতু কোন কোন সাধকগণের নিকট তিনি সামান্যাকারে উদয় হন। সেই অসম্যগ্‌স্ফূর্তিই ব্রহ্ম"।[১] এই প্রকারের বচন আরও আছে।[২] জীবগোস্বামী কখন কখন মুক্তি, কৈবল্য, প্রভৃতি সংজ্ঞাকে ঐ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মানুভবমাত্রে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষম্", "নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যম্",[৩] 'নির্ব্বিশেষব্রহ্মের শুদ্ধজীবের সহিত অভেদজ্ঞান কৈবল্য'। ঐ অর্থেই মুক্তিকে তিনি ভগবৎ প্রীতি হইতে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। "অতএব কৈবল্যাৎ মোক্ষাদপ্যেকঃ শ্রেষ্ঠো যো ভগবৎ-প্রীতিলক্ষণোঽর্থঃ"।[৪] অর্থাৎ 'ভগবৎপ্রীতি কৈবল্য বা মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং উহাই পরমপুরুষার্থ। শাস্ত্রে সালোক্য, সামীপ্যাদিকেও মুক্তি বলা হয়। জীবগোস্বামী উহাদিগকেও অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লিঙ্গদেহ হইতে উৎক্রমণের পর অপবর্গশরণ ভগবচ্চরণে গমন জীবের অন্তিম অবস্থা এবং উহাই মুক্তি। ঐ মুক্তি পঞ্চবিধ—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। উহারা সকলেই গুণাতীত এবং অনাবৃত্তিরহিত অর্থাৎ ঐ সকল প্রাপ্ত হইলে ইহ সংসারে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। উহারাও ব্রহ্মকৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ, "অত্রৈষাং সালোক্যাদীনামনবচ্ছিন্নভগবৎপ্রাপ্তিরূপতয়া তৎসাক্ষাৎকারবিশেষত্বেন ব্রহ্মকৈবল্যাদাধিক্যং প্রাচীনবচনৈঃ সুতরামেব সিদ্ধম্। অতএব ক্রমমুক্তিবৎ ক্রমভগবৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যনন্তরভাবিত্বমপি ক্বচিৎ শ্রূয়তে"।[৫] অর্থাৎ 'অনবচ্ছিন্নভাবে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপতা-হেতু তৎসাক্ষাৎকার-বিশেষ বলিয়া সালোক্যাদি পঞ্চবিধ-মুক্তির ব্রহ্মকৈবল্য হইতে আধিক্য প্রাচীন বচনসমূহদ্বারা নিশ্চয় সিদ্ধ হয়। কখন কখন ইহাও শুনা যায় যে, ক্রমমুক্তির ন্যায় ক্রমভগবৎপ্রাপ্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনন্তরই উহাদের প্রাপ্তি হয়'। অনন্তর তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবৎপ্রীতি ঐ সকল মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, "অথ মুক্তিভ্যোভগবৎপ্রীতেরাধিক্যং বিব্রিয়তে"। যদিও ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত

১। ভগবৎসন্দর্ভ, (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ১৫৫)
২। দ্রষ্টব্য S. K. De, Early History of Vaisnava Faith etc, পৃঃ ২০৭-৮, ২২২-৪
৩। ভক্তিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৫১৮) ; দ্রষ্টব্য ঐ, (ঐ, ৫১৯-২০ পৃষ্ঠা)
৪। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৯৭)
৫ প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৯৫)

উহাদিগের লাভ হয় না, তথাপি কেহ কেহ মনে করেন যে, সালোক্যাদি-প্রাপ্তির তাৎপর্য্য নিজের দুঃখের নাশের জন্যই সামীপ্যাদিলক্ষণসম্পত্তিতে নিতে মাত্র, ভগবৎপ্রীত্যর্থ নহে। তাই ভগবৎপ্রীতি হইতে উহারা ন্যূন।[১]

মুক্তি, কৈবল্যাদি-সংজ্ঞাসমূহকে যে জীবগোস্বামী সর্ব্বদা ঐ প্রকারে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ভগবৎপ্রীতি অর্থেও যে তিনি উহাদের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এক প্রকারেও সিদ্ধ করা যায় যে, ভগবৎপ্রীতি তাঁহার মতে মুক্তি। তাহা উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। জীবগোস্বামীর মতে, হরিভক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধা, আগন্তুক নহে; সুতরাং নিত্যা। যথা তিনি বলিয়াছেন, "তস্মাৎ সুতরামেব সর্ব্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যেত্যায়াতম্। তস্মাৎ ভক্তের্মহানিত্যত্বেঽপ্যভিধেয়ত্বমায়াতম্। ......জীবানাং স্বভাবসিদ্ধা সৈবেতি ব্যাখ্যেয়ম্"।[২] "ইয়মকিঞ্চনখ্যা ভক্তিরেব জীবানাং স্বভাবতঃ উচিতা। স্বাভাবিক-তদাশ্রয়া হি জীবাঃ"।[৩] 'এই ভক্তি, যাহা অকিঞ্চন-ভক্তি-নামে কথিত হয়, তাহা (করা) জীবগণের স্বভাবতই উচিত। কেন না জীবগণের তদাশ্রয় স্বাভাবিক'। পরন্তু অবিদ্যাবশতঃ জীব আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে এবং তদ্ধেতু ভগবদ্‌ভক্তি-বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং ঐ জীব যখন আবার ভগবানে পরাভক্তি লাভ করে, তখন সে স্বরূপপ্রাপ্ত হয় মাত্র। সংসার-দশার অন্যথারূপ পরিত্যাগকরতঃ স্বরূপে স্থিতিকে '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' মুক্তি বলা হইয়াছে—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। জীব-গোস্বামীও তাহা মানিয়াছেন।[৪] তাহাতে প্রকারান্তরে ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভগবদ্‌ভক্তি মুক্তিই।

১। প্রীতিসন্দর্ভ, (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৯৬)
২। ভক্তিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৫০৬)
৩। ঐ (ঐ, পৃঃ ৫৫২)
৪। প্রীতিসন্দর্ভ (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৭৪)

সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা
পরংজ্যোতিরূগসম্পন্ন	পরংজ্যোতিরূপসম্পন্ন	১৯	১১
শৈবসমত	শৈবমত	১৪	১৫
যা	বা	৬	১৯
শঙ্করভাস্ত	শঙ্করভাষ্য (সর্ব্বত্রই এই বানান গ্রহণীয়)		
উপাসনালদ্ধামুক্তি	উপাসনালব্ধামুক্তি	৬	১৭
দ্বৈতৈকত্বত্মাদর্শন	দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শন	১০	২৩
উৰ্দ্ধ	উর্দ্ধ (সর্ব্বত্রই এই বানান গ্রহণীয়)		
Nivana	Nirvana	৩০	৭৬
মহাভরত	মহাভারত	২৯	৮১
বদ্ধনরূপ	বন্ধনরূপ	২৩	১০৩
স্বর্গ	সর্গ	১৮	১১৬
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২৫	১২০
ও	(অতিরিক্ত অক্ষর, সুতরাং বাদ দিন)	২৯	১২৮
সৌত্রান্ত্রিক	সৌত্রান্তিক	২৯	১৪৪
বৃহদারণ্যক্	বৃহদারণ্যক (সর্ব্বত্রই এই বানান গ্রহণীয়)		
ভাগরৎপুরাণ	ভাগবতপুরাণ (”)		
ভগবান	ভগবান্ (”)		
উচিৎ	উচিত (”)		

গ্রন্থপরিচয়

এই গ্রন্থ প্রণয়নে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন যে সমস্ত মূল-শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। গ্রন্থবৃদ্ধির জন্য পুনরায় ঐসকল গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম না। নিম্নে যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এই গ্রন্থ প্রণয়নে চর্চ্চা করা হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ দিতেছি।

হিন্দি ও বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহঃ—

সাধু শান্তিনাথ, প্রাচ্যদর্শনসমীক্ষা (হিন্দি) ইং ১৯৪০

ডক্টর্ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয়দর্শনের ভূমিকা (বাংলা)

পণ্ডিত দামোদর সাতবোলেকর সম্পাদিত মহাভারত (ওঁন্ধধ্, সাতারা)

পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত মাণ্ডুক্যকারিকা

ডক্টর্ আশুতোষ শাস্ত্রী, বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইং ১৯৪২)

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ (বঙ্গাব্দ ১২৮০ কলিকাতা)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীভাগবতসন্দর্ভ (শকাব্দ ১৮২২ কলিকাতা)

শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সাংখ্যাশ্রমী, কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদ (প্রবন্ধ, শ্রীভারতী, কার্ত্তিক ১৩৪৯.)

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, কৌলমার্গরহস্য

ভিক্ষুজগদীশ কাশ্যপ, মিলিন্দপ্রশ্ন (হিন্দি অনুবাদ)

বলদেব উপাধ্যায়, ভারতীয়দর্শন (হিন্দি) কাশী ইং ১৯৪২

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, সাংখ্যদর্শন

স্বামীদয়ানন্দ, সত্যার্থপ্রকাশ (হিন্দি)

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য, সাংখ্যদর্শন (১৩২৬ কলিকাতা)

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যক, পাতঞ্জলযোগদর্শন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মন্ সম্পাদিত পাতঞ্জলদর্শন (ইং ১৮৯৮, কলিকাতা)

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব, পাতঞ্জলযোগদর্শনম্ (কলিকাতা ১৩৩৭)

পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা (উত্তরা, ভাদ্র ১৩৪৯, তৃতীয় সংখ্যা)

" শক্তিপাত রহস্য (উত্তরা, পৌষ ১৩৪৯, সপ্তম সংখ্যা)

" গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু রহস্য (উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, একাদশ সংখ্যা)

" গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন (উত্তরা, প্রবন্ধ নং ১,২,৩)

পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন (প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ)

" ন্যায়পরিচয় (প্রথম সংস্করণ)

প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (বরিশাল শঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ)

আচার্য্য নরেন্দ্রদেব, নির্ব্বানকা স্বরূপ (হিন্দি) (জ্ঞানশিখা, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, জনবরী ১৯৫০, ভাগ ১, অঙ্ক ১)

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬)

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রামানন্দযতি বিরচিত যোগমণিপ্রভা (প্রথম সংস্করণ)

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত শ্রীভাষ্য (প্রথম সংস্করণ)

কালীবরবেদান্তবাগীশ সম্পাদিত শঙ্করভাষ্য, বেদান্তসূত্র (প্রথম সংস্করণ)

পণ্ডিত প্রমথনাথতর্কভূষণ সম্পাদিত গীতার শঙ্করভাষ্য (প্রথম সংস্করণ)

বালগঙ্গাধর তিলক, ভগবদ্‌গীতা (শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদ, ইং ১৯২৪)

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, বসুমল্লিক ফেলোশিপ লেকচার (১-৫ ভাগ, বাংলা)

করালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তত্ত্বজ্ঞানামৃত (১-৪ ভাগ)

List of English Philosophical Publications consulted for preparing the thesis :—

A. G. Widgery—Salvation and Redemption from sin and suffering as taught by some oriental Religions (Published in the Quarterly Journal of the Mythic Society, October, 1918, Vol IX, No. 1)

A. B. Keith—The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads, (Oxford University Press, 1925).

" —Samkhya System.

" —Buddhist Philosophy.

" —The Karma Mimāmsā (Published-1921).

Belvelkar—Vedānta Philosophy.

Bhakti Pradipa Tirtha—Sri Caitanya Mahāprabhu (Published in 1939).

B. L. Atreya—The Vasistha Darsanam (Adyar, Madras, 1936).

B. M. Barua—Pre-Buddhist Philosophy.

B. C. Law—The Life and Work of Buddaghosa.

C. E. M. Joad—Counter Attack from the East (The Philosophy of Radhakrishnan, 1933, London).

C. Pillai—Studies in Saiva Siddhānta.

Colebrooke and Wilson—Samkhyakārika with Gauḍapāda Bhāsya (1887).

D. Suzuki—Outlines of Mahāyāna Buddhism.

" —Studies in Lankāvatāra Sūtras.

D. M. Datta and S. C. Chatterjee—Introduction to Indian Philosophy, Cal. University, 1948).

Deussen—The Philosophy of the Upanishads (Published in 1908).

(Rev.) Father Siqueitra—Sin and Salvation in the Early Ṛg Veda.

F. Otto. Scharder—Introduction to the Pāncarātra and the Ahirbudhnya Samhitā (Published in 1916).

Ghate—The Vedānta.

Ganganath Jha—Prabhākara School of Mimāmsā.

George Grimm—The Doctrine of Buddha (Germany, 1926).

Glasenapp—Doctrine of Karma in Jaina Philosophy.

Gopinath Kaviraj—Introduction to Tantravārtika.

G. A. Govindacharya—The Astādasa Bhedas or the eighteen points of Doctrinal differences between the Tengalais and the Vaḍagalais of Visistādvaita Schools, South India (J. R. A. S. 1910. pp. 1103-1112)

Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy.

H. Stcherbatsky—The Conception of Buddhistic Nirvāna.

Henry Clarke Warren—Buddhism in Translation (HarvardU niversity, 1896).

Haraprasad Sastri—A Short notes of the Mahāyāna and Hinayāna Schools (Published in 1894 in the Journal and Text, Part II, Buddhist Text Society).

J. C. Chatterjee—Kashmir Saivaism (Published in 1914).

J. L. Jaini—Outlines of Jainism.

„ Tattvārthadhigamasūtra with English Tr. and notes (Arrah, 1920).

K. C. Pande—Abhinava Gupta—A Study (Banaras, 1935).

K. C. Bhattacharjee—Studies in Vedāntism.

K. Sastri—Introduction to Advaita Philosophy.

M. N. Sarkar—Comparative Studies in Vedāntism.

N. K. Brahma—Philosophy of Hindu Sādhanā (Calcutta. 1932).

Nahar and Ghosal—An Epitome of Jainism.

(Rev.) Narada—Nibbāna (An article in Buddhistic Studies edited by B. C. Law, Ch. xx, p. 568)

Narayana Bhatta—Mānameyodaya (Eng. Tr. by Prof. C. Kunhan Raja and Prof. S. S. Sastri).

Poussin—Way to Nirvāna.

Pasupatinath Sastri—Introduction to Purvamimāmsā.

P. C. Bagchi—Discourses on Buddhism (an article published in the Viswa Bhāratī Quarterly, Vol xiv, part iv, Feb-April, 1949. pp. 251-254).

P. N. Srinivasachari—The Philosophy of Visistādvaita.

P. B. Kane—History of Dharmasāstra.
R. Bose (Mrs. Chowdhury)—Doctrine of Nimbārka and His Followers.
S. Radhakrishnan—Indian Philosophy (2 Vols).
„ Gautama Buddha (Pub. 1938).
„ An Idealist View of Life.
„ Eastern Religions and Western Thought (Pub. 1940).
S. S. Sastri—Sāmkhya Kārikā (Madras, 1935).
„ The Sivādvaita of Srikantha.
S. N. Dasgupta—History of Indian Philosophy (3 Vols).
„ —Study of Patanjali.
„ —Yog Philosophy
S. K. De—Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal (Cal. 1942)
S. Mookerjee—Buddhist Philosophy of Universal Flux.
Srinivasachari—Philosophy of Bhedābheda.
Stevenson (Mrs)—The Heart of Jainism. (Pub. 1915).
Suzuki—Awakening of Faith in the Mahāyāna (Chicago, 1900).
S. Shivapadasundaram—The Saiva School of Hinduism (London, 1934).
Satis Chandra Vidyābhusan—A Brief Survey of the Doctrines of Salvation (Pub, in 1896 in the Journal of the Buddhist Text Society of India, Vol. iv, part, I).
„ —Nirvāna (Pub. in 1898 in the Journal of the Buddhist Text Society of India, part, I).
S. N. Dasgupta in the Legacy of India edited by G. T. Garratt (Oxford—1937)
T. W. Rhys Davids—Buddhism (New York—1882).
V. Bhattacharjee—Āgamasāstra or Māndukyakārikā.
Woodroffe—Shakti and Shākta.
„ —Garland of Letters.
Yamakami Sogen—System of Buddhism (Cal. University—1921).